চরণ

শরদিন্দু সাহা

শশধর প্রকাশনী
৩২, পণ্ডিতিয়া টেরেস
বালিগঞ্জ, কলিকাতা—৭০০০১৯

প্রকাশক :
শশধর প্রকাশনী
৩২, পণ্ডিতিয়া টেরেস
বালিগঞ্জ, কলিকাতা —৭০০০২৯

প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা, ১৩৭০

প্রিন্টার : অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
মৌ প্রেস
১৯এ, কেদার বসু লেন
কলিকাতা-২৫

এক

মনের দুয়ার খুলে দে রে

এভাবেই পৃথিবীর রংটা পাল্টে যায়। পুঁথিরা হাত-পা নেড়ে কথা বলে। চরণদাদু পুঁথিটা হাতে নিয়েই আবার উল্টে দেখে। পুঁথিটার গায়ে যেন কত হাবিজাবি লেখা। এত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার মধ্যে কতখানি শৌখিনতা ছিল, সে-কথা লোকে ভেবেই নিত অবান্তর; ঘটনাটা হল এই, অমুক বাবুর তমুক পুঁথিটা অতি সহজেই অনেক মানুষের মনের কাছাকাছি চলে এসেছিল। এমনটা হয়তো হয়, কিংবা হতে থাকে। মানুষের জীবনেও হয়, পুঁথি কয়েকটা পাতা বই তো নয়! অক্ষরগুলো ঝোপ বুঝে কোপ মারে।

লাঠিটা চটপট আকাশের দিকে ছুঁড়ে মেরে দু'পাক ঘোরাতেই দলবল থেকে ছুটে আসা দু'চারটে কচিকাঁচা এসে চারপাশে ঘুরঘুর করে, মুখস্থ করার মতো ছড়া আওড়ায়—ওগো ছোকরাদাদু, মাখনদাদু, লাঠির ফাঁকে পিটপিটিয়ে, ফোকলা দাঁতে হিসহিসিয়ে, বুলি ফোটে ফরফরিয়ে......., লজ্জা পেলে চলবে বুঝি......., হিঃ হিঃ হিঃ..... চলো এবার গপ্প করি।

চরণদাদু হেসে কুটিকুটি হয়ে লাঠিটা একপলক উপরে তুলে দেখে নেয়, একটু কোথায় কোন দাগ লেগেছে কি না। যদি দাগ লাগতো, তাহলে কি আর রক্ষা ছিল! লাঠিটা তখনও বনবন করে ঘোরে, এমন করে ঘোরে, ছোকরারা খেই হারিয়ে চম্পট দেয়।

চরণদাদুকে চেনে না এমন মানুষ বোধ হয় এ চত্বরে নেই। কি বলেন মশাই, কি এমন করেছেন উনি যে সব্বাই ধেই ধেই করে নাচছে!

আপনাদেরও বলিহারি, দেশে রবিঠাকুর আর বিবেকানন্দরা নতুন করে জন্মাচ্ছেন না তো, তাই ঐ দু'কড়ির বেটাকে নিয়ে এত ক্ষ্যাপামি।

অ্যা-মাঃ এও জানেন না, উল্টোদিক করে বলি, চরণদাদুর মতো মানুষকে কদর করতে জানেন না আপনারা, রবিবাবুকে ধরা এতই সোজা। এখন জন্মালে ঐ লোকটাকে এত কঠিন কথা বলার অপরাধে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া হতো, মরে গিয়ে বরঞ্চ শেষ রক্ষা হল। এখনও তো আপনাদের বায়নাক্কা কম নয়,—আমাদের জন্য নয়, ঐ দাড়িওয়ালা, বড়লোকের পোলা যা কিছু কলম চালিয়েছে ঐ ঘিলুওয়ালাদের কথা ভেবেই তো!

ঐ দেখুন, ঐ দেখতে পাচ্ছেন বাঁশবাগান। কটা বাঁশঝাড় বলুন তো?....... আপনি বলবেন, 'মশাই গুনে দেখিছি নাকি!' ......চরণদাদু বলবে, 'এই যাঃ দেখেননি! সব্বনাশ, আপনি এত আত্মভোলা! ক-টা পাতা, কেমন তার রং, কেমন তার ঘ্রাণ.... ছানি পড়েছে, না চোখ বুজে ছিলেন!...... বুজে থাকব না তো কি করব, বুজে থাকাটাই তো জীবন,

খোলা রাখলেই তো যত বিপদবিসংবাদ, না শুনেই-বা উপায় কি বলুন, গেলাচ্ছেন যে এই যা।

বাঃ বেড়ে বলেছেন তো, আসুন, একটু কোলাকুলি করি, একটা চুমু খাই।

কি আনন্দে!

পেয়েছি তো মণিমুক্তা, হীরে জহরত, ঐসব কেউ লুকিয়ে রেখেছিল, হাঁড়িগুলো ভর্তি করে। কিন্তু ভারি আশ্চর্য, তবু কেমন যেন নড়েচড়ে, আবারও নড়ে, একসময় মিলিয়ে যায়। পুঁথিটাকে বললাম, ওরে বেটা, এতদিন তোর সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম, দিতে পারবি না কোন সন্ধান! যেই না শুনল, রাক্ষস-ক্ষোক্কসরা তেড়ে এসে বলল, তোমার আক্কেল তো কম নয়, খোদার উপর খিদমদগারী করছ।

বাতাসের গন্ধটা তখন বাঁশবাগানের ডগাটি ছুঁয়ে এপার ওপার করে। লাঠিটা তখন সটান দেয়ালের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে বলে—যেও না বাপু, একটু আধটু আমাদের সময় দাও, বড় একা হয়ে গেছি যে।

আনন্দ তখন এক পাক ঘুরে এসে বলল, আপনার যাবার সময় হ'ল যে। খড়মের শব্দ শুনবো বলে ওৎ পেতে থাকে ওরা।

শব্দ শুনেই-বা কি লাভ!

এ-আবার কেমন কথা চরণদাদু!

কেউই-তো এখন ঘরে ফিরছে না, আমি একা ঘরে ফিরে কি এমন আলো জ্বালাব। সামনের পথটায় আঁধার এসে গলাগলি করলে বড্ড ভয় হয়, মনে হয় ঐ পথের ল্যাম্পপোস্টের সুইসটা অন করে দিয়ে আসি, কাল এই পথ ডিঙিয়ে আমাকেও যে যেতে হবে, সেই ভাবনাতেই তো যাওয়া-আসার সময়টা তাল বেতাল হয়। যদি বিদ্যুতের ঝটকা লাগে, এই বয়সে শূন্যে যাওয়ার শখ হয়েছে বুঝি।

শুধু কি শূন্যে, মহাশূন্যে।

উফ্! এই বয়সে, এই শরীরে!

ভার আর সয় না, রক্ত-পুঁজ-কাটাছেঁড়ার দগদগে ঘা একেবারে আমাকে অচেনা করে দিয়েছে, মাঝে মাঝে হয় এইরকম। সেদিনের সকালটায় ভেবেছিলুম আরামে আয়াসে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকব। কিন্তু কি করে শোব বলুন তো?

শরীরটাকে ভাঁজ করে গুটিয়ে রাখলেই তো হ'ল না। সকাল না হতেই তো লেপ তোষক রোদে দেওয়ার ধুম। সুজাতার ওই এক বাতিক, গরম ঠাণ্ডা সবেতেই এক কেচ্ছা, বুড়ো বয়সে হিসি করে ফেলিছি কিনা, কেউ যদি দেখে ফেলে, এ্যাঃ রামঃ নাতি-নাতনীদের সব চোখ লাগিয়ে বসে থাকে, সুজাতা যেন মরমে মরে যায়। আমি হাসতে হাসতে নাকি আবার পেচ্ছাপ করব, ও আবার দাসীবৃত্তি করবে, এমনটাই কি রোজ নামচা। সুজাতাকে এক কাঁড়ি উপদেশ দিয়ে বলবে, 'দিদু বাড়ি পাল্টাও'।

চরণদাদুকে সঙ্গে নিতে মানা।

না, না, এতটা নচ্ছার ভাবছি না। ভাবছি না তো একেবারে। শুধু ঐ হারামজাদা রোদটা এসে পকপকিয়ে উঁকি মারে। বিশ্বাস কর, সেদিন দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল আর কি। ভাগ্যিস ঘুমটা কথা বলে উঠল। কেন এমন হল! পাশের বাড়ির নাতিটা বেআদব কম নয়, দিল তো ছরছর করে ছেড়ে। ইস্ ওজনের শ্রাদ্ধ করে দিব্যি তো হালকা পুলকা ছিলাম, ভালোবাসার উৎপাতে এমন যন্ত্রণা। দুত্তরি, আমার সঙ্গে সঙ্গেই যদি জগৎটা শেষ হয়ে যেত।

আপনি তো মশাই বড্ড স্বার্থপর লোক।

কেন স্বার্থপরের কি দেখলেন? আমি তো আর অমর হতে চাইছি না। এটাই তো মানুষের স্বাভাবিক চাওয়া পাওয়া।

চরণদাদু একটু আধটু লাঠিটা আগুপিছু চালিয়ে নিয়ে বলে, 'তোমার কথাটাও একেবারে ফেলনার নয়। এত সহজ সমাধান হবে না। এমনও তো হতে পারে, স্বার্থপর বলেই তো মানুষ এত বেশি সার্থক অসার্থক নিয়ে তফাৎ করে, ঐ দূরত্বের জন্যই গতিটা বেড়ে চলে।'

সে তো হতেই পারে, বেঁচে থাকার মধ্যেই তো বাজনা বাজে কেমন করে বেঁচে থাকা, সবটাই একে অন্যের ঘাড় মটকে খায়।

আনন্দ এক একটা পা এগোয়। চরণদাদুর পুঁথিটা হাওয়ায় দুলতে থাকে। পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়। চরণদাদু পাগলের মতো জড়ো করতে থাকে পাতাগুলো।

পাতাগুলো মনের খুশিতেই এক সঙ্গে আর ঘর করতে চাইছে না বলেই কি চরণদাদুর উৎকণ্ঠায় গলা অবধি উঠে আসে ফ্যাসফেসে শব্দ।

চরণদাদু আক্ষেপের সুরে অনেক কথাই বলে—ওরে ও পুঁথি, এমন কথা বল, যে-কথা আগে কেউ বলেনি, এমন করে বল, যেমন করে আগে কেউ বলতে চায়নি।

চরণদাদু কি বদ্ধ উন্মাদ! পুঁথিটাকে বগলে চেপে লাল শালু দিয়ে মুড়িয়ে রাখে।

চরণদাদু এক হাতে লাঠি আর অন্য হাতে পুঁথি রক্ষা করার খেলা খেলে।

দলে দলে ছেলেমেয়ে সাদা-কালো ইউনিফর্ম পরে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে চিঁ চিঁ, ম্যাঁ ম্যাঁ, হ্যাঁচ্যো করে স্কুলের ঘণ্টার রেশ কাটিয়ে দেয়ালটাকে ছাড়িয়ে নাচতে নাচতে অনেকদূর চলে আসে।

চরণদাদুর কি জানি কেন মনটা বড় বেশি উচাটন হয়। তাকিয়ে থাকে অনেকদূর, যতদূর ওদের পোশাকের রং চোখে পড়ে। চরণদাদুর ছেলেগুলোর জন্য এত আদিখ্যেতা কীসের কারণে কেউ জানে না। তবে এই বয়সেও লোকটার জীবনের প্রতি এত মায়া, আবেগ, এত উদাসীন হয়ে চেয়ে থাকা এতটা যে সহজ নয়, আনন্দ গায়ক হয়ে সেটা ভালোই বোঝে। নিজেকে ঝাঁকিয়ে কম তো দেখেনি, অচেনা উত্তাপ এসে ছুঁয়ে গেছে

তাই!

এতগুলো কীসের পুঁথি। কেমন করে জোগাড় করলেন এসব!

চরণদাদু হাসে আর বুড়ো আঙুল দেখায়। হজমের গোলমাল হবে বাপ, একটু রয়ে সয়ে খাও।

তবু একটুখানি দেখাও।

দেখার শর্ত আছে। যেটা খুলবে, গড়গড় করে পড়ে যেতে হবে পাতার পর পাতা, থামলে চলবে না।

তবে আর দেখে কাজ নেই, ঘরে যাই। চোখ দিয়ে গিলতে গিলতে যাই।

চরণদাদু থেমে থাকে না, আরও জোরে পুঁথিটা চেপে ধরে রাস্তার পর রাস্তা হাঁটতে শুরু করে।

দুই

মা তুই ঘোরাবি কত

চরণদাদু কাঁদে কেন! কথায় কথায় এমন কান্না সমীচীন নয়। খবরের কাগজের শব্দগুলো, না ঘটনা, এমন টক ঝাল মিশিয়ে পরিবেশন করে, চোখের পাতাকে তো লঙ্কা টেপা ঝাঁঝ-এর মতো ভিজিয়ে ছাড়ে।

খবরটা প্রায় আগলে মুড়িয়েই রেখেছিল, হয়ত সময় সুযোগ পেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে, এই আশায়। খবরটা পড়েই যেন শরীরটা টিকটিক করে উঠবে এটা জানত। তাই নিজেকে কখনও যেন অস্থিরতা এসে গ্রাস না করতে পারে, সেজন্য যত রকমের বেড় দেওয়া যায়, দিতে একটুও কসুর করে না। কারণ এই উত্তেজনা থেকেই হয়ত শরীরের কোনায় কোনায় নানাভাবে ফুটে বের হতে থাকবে যত রকমের খোঁচা-মারা কথা; সেই খোঁচায় যদি অন্য কাউকে বিদ্ধ করা যায়, হাতাহাতি মারামারি কোন কিছু থেকেই রেহাই পাবে না। শেষে চরণদাদুর গায়ে কালির ছিঁটে দিয়ে ওরা আনন্দ ফুর্তি মারাতে চলে যাবে।

অক্ষরের এত জোর—এই কথাটাই জোর দিয়ে বলেছিল আনন্দকে। আনন্দ আবার এত শব্দের কচকচানি দিয়ে জীবনটাকে বুঝতে চায় না। বরঞ্চ শব্দের মালায় জড়ানো ঘটনার রস টেনে নিতেই বড় বেশি পছন্দ করে।

কি ঘটেছে চরণদাদু! এত দম আটকে পড়ে আছেন যে! কে বলে আপনাকে কাগজের পাতা ওলটাতে! যত দেখবেন তত মনে হবে পৃথিবীটা আপনার মতের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। আপনার ভুবনটা আছাড়ি পিছাড়ি কান্নাকাটি করবে। আর ঘটনাটি যদি আপনার ঘরের কাছে ঘটে তখন কী করবেন?

তখন লোক ডেকে নাকে খত দেওয়াব।

কোন যুগে বাস করছেন!....... এত সহজ ব্যাপারটা!

এক শিক্ষক এক কিশোরীকে যৌন নিগ্রহ করেছে। শিক্ষক ভাবলেই চরণদাদুর চোখের সামনে এক আদর্শবান যুবকের চেহারা এসে ধাক্কা মারতে শুরু করে, কিন্তু এই দৃশ্যটা কোন নাটকের শেষ দৃশ্যের মতো বিয়োগান্ত হতে যাবে কেন, এই ভেবেই উনি শিওরে উঠলেন।

লাল শালুতে মোড়ান পুঁথিটা পড়ে যেতে চাইলে চরণদাদু নিচু হয়ে ধরে ফেলে। মুখটা আচমকা তুলতেই দেখে ফেলে এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে একজন ধরার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

আপনার পরিচয়?

পরিচয়টা নাই জানলেন।

বাঁচালেন যে অসময়ে এসে।

মনে হ'ল নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

কথাকটি বলেই লোকটা তড়িঘড়ি হেঁটে চলে গেল।

চরণদাদু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। ঠিক দেখেছে তো! এই লোকটাকে না! লোকটার হাতের ছোঁয়া চরণদাদু মুছে ফেলতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে যায়। এই লোকটার একটা পূর্ব পরিচয় ছিল। বছর পাঁচ হয়ে গেছে। এই স্কুল বাড়ির জমি নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে যখন পুরো এলাকা থমথমে, দু'চারটে মার্ডার হলেও লোকজন এমন ভাব করে ঘুরে বেড়াছিল যেন কিচ্ছু হয়নি, শেষ পর্যন্ত সালিশি হয়েও যখন মিটল না, সব মেম্বারদের পরামর্শে ঘটনাটা কোর্ট পর্যন্ত গড়াল।

ঘটনাটা থিতিয়ে যেতেও সময় লাগেনি। লোকজন ভাবল যেমনটা হওয়া উচিত, তেমনটাই হয়েছে। লোকজন যদি মুখ না খোলে তাহলে সেই কেসের যা পরিণতি হয়! এজলাসে মামলা উঠলে ডিসমিস হয়ে চিহ্নিত ভাড়াটে খুনেরা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মনের সুখে, প্রায় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই নোটিশটা শেষপর্যন্ত লটকে দিয়েছিল দু'একজন মেম্বার-এর বাড়ির দেয়ালে।

বাপ্‌রে এ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল।

এর বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এমন হম্বিতম্বি শুরু করে দিয়েছিল, যেন কোন কারও মা-বাবা নেই, মুখোশ পরে দিন দুপুরে কারও কারও ঘাড় মটকে, বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে, ক্যাশবাক্সের টাকা সোনাগয়না হাতিয়ে নিয়েছিল, কেউ কোন উচ্চবাচ্য করেনি।

ঘটনাটা চাউর হওয়াতে লোকে বলেছিল, 'এরা এক-একটা ভেড়া, মাথায় ঘোমটা দিয়ে নতুন বউ সেজে বসে থাকতে বল, সকলে এসে গাঁড় মেরে দিয়ে যাক।'

এদের এমনই হওয়া উচিত।

আজিজুল চুপটি করে বসেছিল। না, কোনও সুখ অসুখের কথা ও তিলমাত্র ভাবছিল না। শুধু মাঝে মাঝেই জোহরের নামাজ শুনতে শুনতেই মনটা উদাস হয়ে যাচ্ছিল, যেন

কিছু একটা বলবে, বলার কথা জমা হয়ে পিরামিডের আকার নিচ্ছিল, কোন লোকই পাচ্ছিল না যাকে বলে একটু প্রাণটা জুড়োবে। রাস্তা বরাবর হাঁটতে হাঁটতেই মনে হয় এই যে এত মানুষ অজু করে নামাজ পড়তে যাবে বলে তড়িঘড়ি দোকান-পাট বন্ধ করে যাচ্ছে, এর কি কোন মানে নেই! 'স্টুডিও চায়না'র মালিক রেজ্জাক টুপিটা পরে লুঙ্গিটা পাল্টে উল্টো দিক থেকে গলি থেকে মুখ বাড়ায়—আরে আজিজুল মাষ্টার, আসসালামু আলাইকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম।

কেমন আছেন মিঞা?

আমি লজ্জিত মাস্টার, ভীষণ লজ্জিত, পয়সাটা জোগাড় করতে পারিনি বলে এমুখো হয়নি। গজব হয়ে গেছে ভাই, মেয়ের শাদির জন্য ধার-দেনা করেছিলাম, সব মাঠে-মারা গেছে। শাদির দিনই খবর পেলাম, বরের চরিত্র খারাপ, খোদা মুখ তুলে চেয়েছে. না হয় মেয়ের আমার সর্বনাশ হয়ে যেতো। মনে কিছু করোনি মাষ্টার, দেনায় ডুবে আছি, খোদাতাল্লা'র যদি নেক বান্দা হই, দিন আমার একসময় ফিরবেই, সেদিন তোমার সুদে-আসলে পুরো টাকাটাই ফেরত দিয়ে দেব।

এ তুমি কি বললে রেজ্জাক, ধার শুধতে পারনি, ভাল কথা, তাই বলে সুদের কথা আসছে কোত্থেকে। ধরে নাও, এ তোমার মেয়ের শাদিতে আজিজুল মাষ্টারের যৌতুক।

তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব, আল্লাহ তোমার রহম করবে।

আজিজুল আর কথা বাড়ায় না। সবাই এক এক করে দোকানের সাটার টেনে দিয়ে পুকুর ঘাটের দিকে ছোটে। জায়নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাকে স্মরণ করে-আলহামদু লিল্লাহে রববিল আলামিন আররাহমানের রহিম। বেনামাজি আজিজুল মাষ্টার দুপুরের রোদ গায়ে মেখে অন্নপূর্ণা মেডিক্যাল হল-এর টেবিলটার উপর বসে।

প্রদীপ ভাই, এক গ্লাস পানি দাও তো, বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

এত লোক থাকতে তোমার আমার কাছে পানি চাওয়া কেন?

তুমি মানুষের দরদ বোঝ, তাই লোকে হাত বাড়ায়।

থাক, থাক, আর গাছে তুলে মই কেড়ে নিয়ো না। বলো দেখি এবার ভরদুপুরে এই অধমের কাছে আসার উদ্দেশ্যটা কি?

তুমিও পার প্রদীপ ভাই, খালি সব কিছুর মধ্যে গন্ধ খুঁজে বেড়াও। এটা কী রোগী পেয়েছ আমাকে, যে লক্ষণ বুঝে বুঝে ঔষধ দিয়ে দেবে, রোগী বাঁচুক কি মরুক, সেই নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করে লাভ কী, বল।

আরে আজিজুল ভাই, তুমি এ-ভাবে নিচ্ছ কেন? এ-এলাকার লোকজনকে তুমি তো জান, কয়টা লোক পয়সা দিয়ে পাশ করা ডাক্তার দেখাতে পারে, সব তো যায় ঐ কোয়াক ডাক্তারের কাছে, দশ টাকা করে ফি. এর চেয়ে ভালো হল না, বিনা ফিতে সর্দি কাশি-

জ্বর, পেট খারাপ মাথা ব্যথা, কোমরে ব্যথা, গাঁটে গাঁটে ব্যথার ঔষধ পেল। লোকজন নিশ্চয়ই উপকার পাচ্ছে, না হয় ফিরে ফিরে আমার কাছে আসবে কেন?

বাঃ বেশ বলেছ তো, সে তো কাবুলিওয়ালারাও বলে, 'লোকে উপকার পাচ্ছে বলেই আমার কাছে আসছে।' কিন্তু ওরা কখনো এটা ভাববে না, চড়া সুদে যাতে টাকা ধার না দিতে হয়, সে কী করে সম্ভব। তাহলে সব ধান্দা চৌপাট।

তার জন্যই তো তোমরা আছ, আজিজুল ভাই। চরণদাদু আছে। মিউনিসিপ্যালিটির কাছে হাইড্রেইন নিয়ে দরবার করছ, সর্বশিক্ষা অভিযান-এ তোমার ভূমিকা সবাই জানে। গরীব ছেলেমেয়েদের অঙ্গনওয়ারিতে নিয়ে যাচ্ছ, পরিবেশ দূষণ নিয়ে স্কুল বাড়ির দোতলায় সভা ডেকেছ, বিজ্ঞান মেলা করছ শ্যামপুরে।

তাতে তোমার অসুবিধা কোথায়?

এত কিছু বোঝ, এটা বোঝ না, আমাদের যে পেছনটা মেরে দিচ্ছ, লোক এত কিছু হাতের কাছে পেলে, শরীর নিয়ে সচেতন হয়ে যাবে, তখন থোড়াই আসবে আমাদের কাছে সস্তার ঔষধ নিতে।

ওঃ এই কথা, কম পুঁজিতে লাভের অঙ্ক বাড়ানোর ব্যাবসাটা তোমার বন্ধ হয়ে যাবে, তাই এত মাথা ব্যথা।

ঠিকই ধরেছ, আজিজুল ভাই, তোমাদের মতো সমাজসেবকরা তাই তো আমাদের চিন্তার কারণ, তোমাদের না সরালে আমাদের চলবে কেন? তুমি তো চোখে আঙুল দাদার মতো ভয়ঙ্কর কথাবার্তা বলছ। জানো এর শাস্তি কী?

শাস্তি! কার, তোমার না আমার।

সে তো সময়ই বলবে।

তবে তুমি কিন্তু সাবধান হয়ে যাও, আজিজুল ভাই, দিনকাল ভালো না, যে কোন মুহূর্তে যা কিছু হয়ে যেতে পারে।

প্রদীপের কথাটাই হয়ত ঠিক, দিনকাল যে পাল্টাচ্ছে, আজিজুল কিন্তু হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে, দুটো বিপরীত চিত্র নিয়ে পাল্টে যাওয়া পৃথিবীটার হাল হকিকত। সবকিছুতেই যেন সুবর্ণগোলকের মতো ভোজবাজি আর কি—এই রোদ, এই মেঘ, এই বৃষ্টি। খটখটে রোদের পর মুহূর্তেই চারদিক ভাসিয়ে নিয়ে উপছানো জলে কিলবিল করছে সব জ্যান্ত বড় বড় পোকা। কেবলই গা ঘিনঘিন করে।

আজিজুল এই পোকা বাড়তে দেওয়ার খেলা বরদাস্ত করতে পারেনি। স্কুল বাড়ির জমি নিয়ে ছেলেমানুষি খেলাটা কতদূর গড়ায় সেইদিকে ছিল শ্যেনদৃষ্টি। ওদের চোখ-রাঙানিতে দমে যাবার পাত্র ও নয়। গুটিটা সেইভাবে সাজিয়েছিল ওরা। ওস্তাদের মার শেষ রাতে—এই ফর্মুলায় ও আস্তে আস্তে উদ্ভূত পরিস্থিতির উপর নজর রাখছিল। প্রথমে উপঢৌকন, পরে হুঁশিয়ারি, প্রাণে মারার হুমকি সবটাই যখন হজম হয়ে ফানুসের

মতো উড়ে বেরিয়ে গেল, ওরা সরাসরি অ্যাকশান ঘটাবার জন্য প্রস্তুত হয়, এরই মাঝে আজিজুল-এর গোপন সাক্ষ্যতে ফেঁসে যায় ভাড়াটে খুনিরা।

প্রিজন ভ্যান-এর ভেতর থেকে ওরা আজিজুলকে থানা থেকে বের হতে দেখে ফেলেছিল, ওকে দেখে নেবে, ওর হাড়গুলো ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেবে, ওকে এক ঘরে করে রাখবে, ধর্মের দোহাই দিয়ে পাড়া ছাড়া করবে। ভাবছিল, আজিজুল ভয়ে জুজু হয়ে যাবে। ওরা আজিজুলকে বুঝতে ভুল করেছে, বরঞ্চ আজিজুলই খাঁচার ভেতরের চার জোড়া চোখে চোখ রেখে আঙুল তুলে বুঝিয়ে দিয়েছিল, ফলটা ভালো হবে না। এই আজিজুলই সাক্ষ্য'র কাঠগড়ায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, সেই-তো বছর চল্লিশের টানটান ঋজু যুবক; সেই আজিজুলই তো সত্যের অপলাপ করেনি, বরঞ্চ কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে খুনিদের সরাসরি চিহ্নিত করে ওর অবস্থানটাই বুঝিয়ে দিয়েছে। সেই-তো দেখা, চেনাটা হয়ে ওঠেনি চরণদাদুর।

এতদিন বাদে ওদেরই স্কুল থেকে মাথা নিচু করে বেরিয়ে যেতে দেখে প্রথমে অস্বস্তিতে ছিল চরণদাদু। এমন পরাজয়, জানে না আজিজুল মেনে নিয়েছে কি না, চরণদাদুর এতটা অবিশ্বাস করতে মজ্জায় মজ্জায় বাঁধে।

আজিজুল এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না, সোজা মজা ঘাসের কিনারে পুল পেরিয়ে এক দেড় মাইল দূরের গ্রামের দিকে যাত্রা শুরু করে। চরণদাদুর এই বয়সে আজিজুল-এর সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলার কথা নয়, কিন্তু বিষয়টা ওকে ভাবিয়ে তুলেছে যখন, একটা সমাধান যতই তিক্ত হোক, টেনে আনবেই।

চরণদাদু লাঠিটা ঘুরিয়ে, ডানে বাঁয়ে দুলিয়ে, খড়মের ঠক ঠক আওয়াজ করে, সবার নজর হরণ করে পকেট থেকে টুকরো টাকরা কাগজ বের করে, খচখচ করে কি একটা লিখে রেখে সোজা গিয়ে কম্পিউটারের ধারে বসে পড়ে। একটা মেয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে একটা চিঠি তৈরি করছিল এম.এস. ওয়ার্ড-এ। চরণদাদু আসতেই একটা চেয়ার টেনে বসতে দিয়ে ভেতরে চলে যায়। একটা বছর পঁয়ত্রিশ-এর ছেলে মুখে সিগারেটের ধোঁয়া টেনে মুখটা সামান্য বেঁকিয়ে, কোমরটা দুলিয়ে অবাঙ্গল উচ্চারণে জানতে চায়—কী হচ্ছে এখানে চরণদাদু! নতুন কোন ফন্দি আঁটছেন বুঝি!

আর একটি যুবক এসে উঁচু গলায় বলে—তোমার তাতে কি!

কি কেলো মাইরি, জানতে চাইলাম ওর কোন সমস্যা হচ্ছে কি না। বড্ড পিরিত মারাচ্ছ যে, চরণদাদু কে হয় তোমার।

যুবক ছেলেটি হাসল, ওর কথার কোন উত্তর করল না। ছেলেটি জানে, চরণদাদুর সমস্যা কি একটা, হাজারো।

আপনি তো চিরকাল অন্যের বোঝাই বয়ে গেলেন, এ-তো আমার চোখে দেখা, আপনাকে কটা লোক বোঝে, না বুঝতে চায়।

থাক না রুদ্র, এ-কোচিং সেন্টার-এ তোমাকে দেখিনি তো কখনো।

এই সবে কদ্দিন হ'ল। বলছি, আর কতকাল অন্যের তৈরি আগুনে হাত পোড়াবেন।

কি যে বল রুদ্র, অন্যের বলে কি কিছু আছে, তুমি তো আবার কবিতা লেখ, এই সামান্য সত্যটুকু বোঝ না, তাহলে মানুষের অনুভবের কথা বলবে কি করে!

আচ্ছা এখন বলুন, আমাকে কি করতে হবে? আপনাকে জ্ঞান দেওয়া আমার অনুচিত কাজ হয়েছে।

না, না তা কেন হবে! তোমার নিজের পছন্দের কথাটা তুমিই তো বলবে, সেটা অন্যের পছন্দের তালিকায় উঠবে কি উঠবে না, ভেবে তো লাভ নেই।

বলুন, বলুন।

টু দ্য প্রেসিডেন্ট, গভর্নমেন্ট অব্ ইন্ডিয়া. নিউ দিল্লী.....ইওর এ্যাক্সিলেন্সী,

আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন চরণদাদু, শেষে এই সামান্য ঘটনা যাবে রাষ্ট্রপতির দরবারে।

তুমি আবার ভুল করছ রুদ্র, এমন অনেক ঘটনা আছে, আপাত তুচ্ছ মনে হলেও এর ফল কিন্তু সুদূরপ্রসারী, আমাদের সকলকে শুধু একটুখানি চোখ কান খোলা রেখে চলতে হবে, এই-যা।

না, আপনি তো চিরকাল সমষ্টির সমস্যাই তুলে ধরেছেন, ব্যক্তির সমস্যা আপনার কাছে প্রাধান্য পায়নি, তাই বলছিলাম।

ব্যক্তি আমার কাছে সমষ্টির মধ্যে লুকিয়েছিল, তাছাড়া ব্যক্তির ক্ষমতা প্রকাশের এমন সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবে না কারণ ঐ ব্যক্তির সঙ্গে হাজারো মানুষের বিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে।

আপনি কি মনে করেন, রাষ্ট্রপতি আপনার চিঠি পড়ে দেখবে।

শুরুতেই অতটা হতাশ না হয়ে কাজটা করে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ, বলতে পার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য এই শব্দগুলো টাইপ করে কাগজে বন্দী করাটাই প্রথম ধাপ।

আপনাকে বোঝা শিবেরও অসাধ্য।

এখানে আবার ব্রহ্মা বিষ্ণু আর শিবকে টেনে আনা কেন। আর কি মানুষের উদাহরণ তোমার জানা ছিল না যারা এ কল্পিত ব্যক্তিত্বের উপরে গিয়ে চলাফেরা করেছে।

কিন্তু এর বিপদটা বুঝতে পারছেন। আপনাকে কিন্তু ছেড়ে কথা বলবে না।

চরণদাদু হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। এপাশ ওপাশ থেকে অনেকগুলো চোখ ইতিউতি উঁকি মারতে লাগল। যারা রোজকার কাজে বগলে কিংবা হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে অফিসের তাড়ায় দৌড়চ্ছে, তারাও এই আপাত বেকার লোকটার দিকে একটু অনুকম্পার দৃষ্টি ফেলল। ভাবখানা এমন, বেকার লোকদের জ্ঞানগম্মি কম, তাদেরই এমন আবোল

তাবোল কাজে মানায়।

হাসুন, যত বেশি করে হাসবেন, তত বেশি শরীর মন সুস্থ থাকবে, শরীর সুস্থ থাকলে হজম ভালো হবে, হজম ভালো হলে পারদের মতো ক্ষিদের মাত্রা বাড়বে, আর ক্ষিদে বাড়লেই তো বেকার লোকদের বিপত্তি, অন্যের পকেটে ডান হাত গলিয়ে দিয়ে তুলে নেওয়া দু'এক পাত্তি।

যদিও চরণদাদু সম্বন্ধে এতটা গরম আর তেতোভাব নিয়ে ভাবতে অফিসযাত্রীরা নারাজ। আর যাই হোক চরণদাদু সম্বন্ধে তেমন কোন রেকর্ড কস্মিনকালেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কি হে অফিসবাবু, আপনমনে এমন করে হাসির হেতু কি আমি! আচ্ছা, আমি আপনাদের হাসির খোরাক এটা তো জানতুম না।

রাগ করবেন না, হাসিটা চেপে রাখতে পারলুম না। তাই আপনার চোখে পড়ে গেল।

চরণদাদু কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই নিজের কাজে মন দেয়, হাতের লাঠিটা একপাশে রেখে গুলগুল করে তাকায় ঐ পাদুকার দিকে। পায়ের এই খড়মই যেন ওর বেঁচে থাকার ভরসা, যত ক্ষমতা, যত উদ্যোগ যেন ঐ খড়ম থেকেই বেরিয়ে আসে। টাইপ মেশিনের ছন্দোবদ্ধ ওঠানামা ওর ভেতরে অন্য ভাব এনে দিত। এখনও কম্পিউটারের কী বোর্ড দিয়েই ফুড কর্পোরেশন থেকে বেরিয়ে আসার পরেও সমস্যাকে অক্ষরে মিশিয়ে দিতে চায়। দশ-পনেরজন শিক্ষার্থীর বাঁকে বাঁকে মেশিনের শব্দের ঝড় একসঙ্গেই যেন শব্দক্ষেপণ ঘটায়, এ-ও যেন এক অদ্ভুত ভাব। হারাতে বসা মিউজিক, কত সুর গর্ভে ধারণ করে আছে, কেউ যেন টেরই পায় না, রসে বসে থাকা মানুষই বুঝতে পারে কত রসের যাদুতে ভাসে এই রক্তে মাংসে গড়া আঙুলগুলো, বড় নখ, নখের ভেতরে যাদু, ভেতরে জমে থাকা বহুদিনের পুঞ্জিত রাগ সব যেন একসঙ্গে তালে তালে উজাড় করে দিচ্ছে, এ যেন শব্দক্ষেপণের এক তীর্থক্ষেত্র।...... ইওরস্ ফেইথ্‌ফুলি থেকে আই রিমেইন স্যার দিয়ে যখন চিঠিটা শেষ করে, তৃষ্ণা মেটে না, বার বার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে শুরু করে, শব্দের মাঝে নতুন শব্দেব সংযোজন বিয়োজন, বাক্যের গঠনে মিষ্টত্ব আরোপের আপ্রাণ প্রচেষ্টা, সবকিছু মিলেমিশে সমস্যাকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা, এ-যেন সৃষ্টিরই এক অপার আনন্দ।

রুদ্র জিজ্ঞেস করে, চরণদাদু, আর কিছু আছে।

চরণদাদু কম্পিউটারের উল্টোদিকে ছড়িয়ে থাকা সাত-আটটা মেশিনের দিকে তাকিয়ে থাকে। এ এক অদ্ভুত মেলবন্ধন, চরণদাদু নিজেকে আবার খুঁজে পেতে চায়, আঙুলগুলো কী বোর্ডে রাখে। ঝড়ের বেগে গতির বন্যা বয়ে দেয়।

চরণদাদু আপনি, এত স্পিডে, আমাকে মাফ করবেন।

তুমি ভাবছ হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে, ভাবছ যেন আপদ বিদেয় হল।

আচ্ছা কতজনই তো আমার কাছে এসে কত চিঠিচাপাটি করে নিয়ে যায়, কিন্তু শব্দের মধ্যে যন্ত্রণার শব্দ ফুটিয়ে তুলতে কাউকে দেখি না।

দুর পাগল, তুমি প্রশ্নকে শুধু প্রশ্ন ভাব কেন, এর মধ্যেই মিশে থাকে উত্তরের ব্যঞ্জনা, উত্তরের মধ্যে কত আঙ্গিকের খেলা, বিষয়ের কারিকুরি। এবার তোমাকে একটা গোপন কথা বলি, আঙুলের প্রক্ষেপণ এর মধ্যেই তো আমি একাত্মতা আর অনৈক্যের ভাব টের পাই।

চরণদাদুর তো একেবারে ভুলে যাবার কথা নয়—ঐ যে স্কুলবাড়িটাতে হৈ হৈ রৈ রৈ, কত মেয়েরা কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে নিজেদের বেঁচে থাকাকে জানান দিচ্ছে, এও তো এক স্বপ্ন! কোথায় ছিল এত মেয়ে, কোথায় ছিল ইটের দেয়াল, সুইস অন করেই মেয়েরা পাখার হাওয়া খেতে খেতে ডায়াস থেকে দিদিমণির বক্তব্য শোনে আর নোট করে। এত আসা, এত যাওয়া, এত দিনের এত কথা বলা সব যেন জমা হয়ে আছে ঐ দেয়ালের অন্দরে। চরণদাদু ঐ ঘাসের চাপড়াতে, মাটির মেঝেতে বসে পা দোলাত, ঘেসো গন্ধ, নানা জাতের ফড়িং, গান্ধীপোকা, পিঁপড়ের দল ঘিরে রাখত ওর শরীরের চারদিক, জনা কজন যারা ঐ ভাঙা ঘরটায় এসে বসত, কখন পালিয়ে বাঁচবে, এমন আকাঙ্ক্ষাতেই ডানে বাঁয়ে চোখ বোলাত..... কি হ'ল চরণদাদু, কোথায় বুঁদ হয়ে ছিলেন, কারেকশান গুলো করে দিন, কটা কপি লিখে দেবেন, পয়সাটা আপনার কাছ থেকে ঠিক নেওয়া যাবে না, মানুষের জন্য কাজ করছেন, এইটুকু ছাড় আপনার প্রাপ্য। এবার থেকে আপনি নিজেই টাইপটা করে নেবেন, ভুলের সংখ্যাও কমে যাবে, শ্যাম কুল দুই দিকই রক্ষা হবে।

চরণদাদু রুদ্রর কথা যত শোনে, অবাকই হয়ে যায়, 'ছেলেটা এত ভাবে!'

বি.বি.টি. রোড দিয়ে ভোঁ ভোঁ করে গাড়ি ছোটে, নতুন ডিজাইনের কত লরি, মোটরভ্যান, মোটর, স্কুটার, ট্যাক্সি, এত যে কোম্পানি বলে শেষ করা যাবে না। এখান দিয়ে তেলের ট্যাঙ্কারই বেশি যেত, এখন যত রাজ্যের অটোরিক্সার ভোঁ ভোঁ আওয়াজ আর সাইকেল ভ্যান-এর জড়াজড়ি। বাঙাল কলোনি থেকে ইসমাইল ডাবের গাড়ি নিয়ে আসে। সকালেই দু'গাছের ডাব বায়না করেছিল চড়া দামের বিনিময়ে, সেই পয়সাই তুলে নিচ্ছে। লাভের গুড় পিঁপড়ে না খেয়ে যায়।

তিন

ডুব দে মন কালী বলে।

চরণদাদু সামনের দিঘিটার ঘাটে নিচু হয়ে নেমে চোখে মুখে জল দিয়ে নেয়, ঘামছিল এতক্ষণ গলগল করে, ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়া পেয়ে দম মেরে থাকা শরীরটা খানিকটা যেন চনমনে হয়ে ওঠে। এত কাজ এই বয়সে যেন আর সইতে চায় না। বয়সটাকে তুড়ি মেরে চলতেই চরণদাদুর জুড়ি মেলা ভার। পুকুরের জলটা এই সময় দুপুরের হাওয়া খেয়ে তির

তির বেগে ছোটে। চাঁদা মাছ, খলসে, রুই-এর পোনা পাড়ে এসে মাটির গায়ে জিব ঠেকায়। চরণদাদু ভাবে জলেরও একটা বাতাস আছে, কেমন নির্মোহ হয়ে সে বাতাস মাছগুলোকে ছোঁয়, আর মাছগুলো দৌড়ে পালায়। চরণদাদু এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে চলে যাওয়া মাছগুলো আবার কখন ফিরে আসবে।

হাফিজুল আসছে না এদিকে, ছেলেটা বড় বেশি উচ্ছন্নে গেছিল, আকাশের তারা গুনে গুনে ভেবেছিল একদিন মহাকাশে পৌঁছে যাবে, কত খানা খন্দ, কত হোঁচট খাওয়া, কত ধাক্কাধাক্কি, তবুও ওর পৌঁছে যাওয়ার শখ, তা বাপু সময় হলে যাবি, এত জলদি কীসের!

হাফিজুলকে নিয়ে নানা কথা রটে, তা লোকে যা বলে, কিছু না কিছু তো বটে, তা সে কথা থাক— কিরে হাফিজুল, এমন বোম্বেটের মতো আজকাল চলিস কেন রে!

বড্ড বদরাগি তো বটে, চরণদাদু কিন্তু কখনও দু'কথা বলে না, সেই জোরেই চরণদাদুর এত কথা বলা। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে জবাব দেয়—কী আর করব চরণদাদু!

তাই বলে এসব করে বেড়াস, জুয়াসাট্টা খেলে কি আর জীবন চলে! জীবন চলা এত সোজা না রে, কোনদিন বাঁক নেবে, টেরটি পাবি না।

চরণদাদু, এত চড়া রোদে তুমি কী করতেছ, ঘর চইলে যাও, বলতেছি তো তোমার ঐ সব ফালতু কাজে কিছু হবেনি, খালি দৌড়টাই বেকার হবে। কে এমন হাজী-গাজি আছে, তোমার কথায় কান দেবে, বল দেখিনি, বড্ড নেমকহারাম লোকজন এ-সংসারে। মানুষগুলোকে যত দাও, গিলবে, আর না দাও, নাথি মেইরে মেইরে এমন দূরে পাইঠে দেবে, টিকিটিও খুঁজে পাবেনি।

বড় বড় কথা বলিস না তো হাফিজুল, যেখানে যাচ্ছিস যা, ছোট মুখে বড় কথা মানায় না।

না চরণদাদু ভুল বইলেছি, মাপ কইরে দাও, ছোট বড় কথা বইলে ফেইলেছি রাগের মাথায়, খোদার কসম, আর বইলব না।

একবার যে তুলে নিয়ে গিয়ে পুলিশ ঠেঙিয়েছিল, এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলি।

সেবার টিকটিকি লেইগেছিল, মুখ মেইরে দিয়েছে, আর এ-মুখো হবে নি পুলিশ।

চরণদাদু যেন খানিকটা আস্বস্ত হ'ল। কিন্তু কাজটা যে সুবিধের নয়, বেআইনি এটা তো একশ ভাগ সত্যি। কিন্তু এটাও যে সত্যি সামনের পথটা অজানা অচেনা, তাইতো ওর এ-পথে যাওয়া। চরণদাদু কিছুতেই যেন এ-ব্যাপারটা মেনে নিতে পারে না। তাই তো কেউই কোন ঘটনা ঘটালে সহজে চরণদাদুর কানে তোলে না, লোকটা যে খাল পাড়-এর লোকদের কাছে অন্য রকমের মানুষ, এ-তো ছেলে-বুড়ো-খোকা-খুকু সকলেই জানে, কিন্তু আবার যে সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক সেটাও পদে পদে টের পায়। হাফিজুল কথা না বাড়িয়ে কেটে পড়ার ধান্দা করে, শেষে কেঁচো খুঁড়তে আবার সাপ না বেরিয়ে পড়ে।

ঘেমো শরীরে জবজবে হয়ে ঘরে ফিরলে কেই-বা আর ফুল-বেলপাতা দিয়ে আপ্যায়ন করবে, তাই তিরস্কারই ভাগ্যে জোটে—ঘরে ফেরার কি খুব দরকার ছিল!

চরণদাদু কোন জবাব দেয় না, মানুষের মুখগুলোই সব শোক তাপ রাগ ভুলিয়ে দেয়।

জবাব তোমাকে দিতেই হবে, এক্ষুনি গরমে-ঠাণ্ডায় জড়ভরত হয়ে খুকখুক করে কাঁশ আরম্ভ হবে যে, তারপর হু হু করে জ্বর আসবে, তোমার পরম সুহৃদ-দের সেই-বেলা টিকিটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না, তখন এই সুজাতাই হাতের পাঁচ। নাই-বা হলাম তোমার আপন কেউ, কিন্তু এতকাল যে তোমার মুখ বুজে সেবা করেছি সে অধিকারটুকু তো দেবে।

বারান্দায় দড়ি থেকে নতুন লাল রং-এর গামছাটা টেনে নিয়ে আবার আর এক প্রস্ত কলের গোড়ায় গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নেয়। খড়মটা এক পাশে সরিয়ে রেখে প্রিয় কুকুর 'ডলি'কে কাছে ডাকে, ডলি লেজ দুলিয়ে শরীরটা দু-পায়ের ফাঁকে গলিয়ে দিতে চরণদাদু'র মুখটায় প্রশান্তির ছায়া নেমে আসে।

চরণদাদু'র ঘরে অর্থাৎ 'বসন্তকুঞ্জ'-তে আজ আর নিজের পরিবারের কেউ বেঁচে নেই, দূর সম্পর্কের আত্মীয়া বিধবা সুজাতাই এখন সব, এই নিয়ে দুর্নাম রটাবার লোকেরও অভাব নেই, চারদিকে কানাঘুষো, এমন একজন দেবতার মতো লোকের গায়ে ঐ এক ফোঁটাই কালির ছিটে।

চরণদাদু এসব কথা শুনে আর হাসে। ওরা সমাজের নিয়মের প্রশ্ন তোলে। সমাজের নিয়মটা প্রয়োজনের জন্যই তৈরি হয়, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতেই তো নিয়মের অদল বদল ঘটে, না এক জায়গায় নিয়ম আঁকড়ে জলে ধুলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। চরণদাদু জীবনের যে রংটা দিয়ে মনের ছবি আঁকে, এদের চোখে নিশ্চয়ই তা ধরা পড়ে না, না-হলে প্রিয় মানুষটাকে নিয়মের কলকব্জা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার জন্য ফন্দি আঁটে এমন করে!

ভাতটা বাড়াই ছিল। কলসি থেকে জলটা ঢেলে নিয়ে খেতে বসলেই সুজাতা গলা সপ্তমে চড়িয়ে কথার ঝাল ঝাড়ে— দিদিটা মরে গিয়ে আমার ঘাড়ে ঐ বুড়ো হাবড়াকে চাপিয়ে দিয়ে চলে গেল, এখন আমি শ্যাম রাখি না কুল রাখি, এ যে দেখছি, যাবজ্জীবন কারাদন্ড ভোগ করা। চরণদাদু খেতে খেতেই মস্ত বড় হাই তুলে প্রমাণ করতে চায় কথাটা ওর একশো ভাগ মনঃপূত হয়নি, নিরুত্তর চরণদাদু আবার ভাতের থালাটা বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে ছড়িয়ে থাকা ভাতগুলোকে মাখতে গেলেই বাহিরের দুটি কাক কাঁ কাঁ করে ওঠে। চরণদাদুর দুর্বল মায়াময় সত্তাটা টগবগ করে ফুটে ওঠে।

'এই পালা পালা', কথাটা সুজাতাকে শোনাবার জন্য বললেও আসলে এই কথা বলার সময়টুকু নিয়েছিল ঐ কাক দুটোর খালি পেট ভরাট করবে বলে। কবেই তো মারা গেছিল বউ-মেয়ে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায়। তখন চরণদাদু বলে কেউ এই তল্লাটে ছিল না; ছিল

ফুড কর্পোরেশনের অফিসার গণপতি হালদার। এমনিতেই হালদার বংশের যে কোন নামডাক ছিল তা নয়, তবুও যেন বসন্তকুঞ্জ-এর এই পরিবারটাকে কেউ কখনও অস্বীকার করতে পারেনি, এদের মানে গণপতি হালদার-এর বাবা-কাকাদের ব্যবহার ছিল চোখে পড়ার মতো, চেহারা-সুরত লম্বা-চওড়া টানটান শরীরে সুপুরুষ, কোন কারণ ছাড়াই মানুষের কাছে আসা-যাওয়ার খাতিরেই মানুষ তাদের ভালোবাসার ভাণ্ডার উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে। এই গণপতি হালদার-এর সময় থেকে ব্যাপারটা ঠিক অন্যরকম। ঈশ্বর রমাপদ হালদার একটা সন্তান জন্মাবার কিছুদিনের মধ্যেই কলেরায় মারা গেছিল, মধ্যম ঈশ্বর প্রবোধ হালদার-এর স্ত্রী ধরীত্রির কোন সন্তান ধারণের ক্ষমতাই ছিল না, কনিষ্ঠ ঈশ্বর গঙ্গাপদ হালদার এবং মধুমতি হালদার-এর একমাত্র পুত্র গণপতি হালদার। ফুড কর্পোরেশন-এর অফিসার থাকার সময় থেকে কাউকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়নি, ওর দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত বলে শোনা যায়। সবাই বলত, লোকটা কাজ কাজ করে পাগল হয়ে যাবে। যেমন ছিল তাকত তেমনই ছিল পোশাক আসাকের বাহার, বাড়ির সামনে মজুত থাকত চব্বিশ ঘণ্টা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি, চারপাশের লোকজনের সঙ্গে তেমন হার্দিক সম্পর্ক ছিল বলা চলে না। স্ত্রী এবং কন্যার অকালমৃত্যু যেন লোকটাকে আমূল পাল্টে দিল। ভোগের উল্টোপিঠ যদি ত্যাগ হয়, তাহলে একদম পুরোপুরি এক অন্য মানুষের জন্ম হল যেন। সব সম্পত্তির বিভাজন ও বন্টন রেখাটাই যেন উল্টো খাতে বইতে শুরু করল। ধরা চুড়া নেওয়ার পর থেকেই যে পোশাকটা গায়ে চড়িয়েছিল সেটাই যেন চিরজন্মের মতো তার নিত্য পরিধানের পোশাক হয়ে গেল।

চরণদাদু কেন যে চাকরির মোহ ছেড়ে এ-জীবন বেছে নিল, কে জানে? সে কি নেহাতই বৈরাগ্য! ঘুমিয়ে ছিল গোপনে, পরম যত্নে সমাজ শিশুটি।

ভাতগুলো খেয়ে থালাটা সরিয়ে রেখে জল ঢালে গালে। চারদিকে ভ্যাপসা গরম, নুনজলের মতো গা থেকে গড়িয়ে পড়ছে, সঙ্গে ঘেমো শরীরে চ্যাটচ্যাটে আঠা। চরণদাদু চুপচাপ কোন কথাই বলে না, ঘরের গুমোট আবহাওয়ায় এখন দম বন্ধ হয়ে আসে, সুজাতাকে চরণদাদু নাম ধরেই ডাকে, সম্পর্কের চেয়েও বয়সের ভারটাও মানুষের কাছে কম নয়।

সুজাতা শুয়ে শুয়ে টিপ্পনী কাটে—খাওয়া হ'ল, আর কেন এইবার সুখটান দিয়ে গড়িয়ে নাও। সুজাতার বলার মধ্যে এমনই রসময়তা, এতটাই ভালোবাসার মিশেল ঘটেছে, যেন বয়সের ফারাকটা এসে জোরসে কষে এক থাপ্পর মেরে দিয়েছে।

থালাবাসনটা এক কোণে রাখতে ঝনঝন শব্দে গড়িয়ে পড়ে গেলে সুজাতা হাঁক মারে—কি হ'ল গো!

ভারী অদ্ভুত সম্পর্ক এদের। একটা সম্ভ্রম যেন কোথায় লুকিয়ে আছে, এমনিতে গালমন্দ দিনরাত করেই চলেছে, চারপাশের লোক সেসব কথা শুনে হিঃ হিঃ করে হাসে।

যাবে কোথায়! যাবার তো একটা জায়গা থাকা দরকার। অকাল বৈধব্যের যন্ত্রণা দেখা আর যাপন করার মধ্যে কত যোজন তফাৎ সুজাতা সেটা হাড়ে হাড়ে টের পায়, ওর ননদ অবন্তীর স্বামী গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছিল, রেললাইন থেকে বগি ছিটকে এসে হাজারো জ্যান্ত লোককে শব বানিয়ে দিয়েছিল মুহূর্তে. বেচারি স্বামীর মণ্ড হয়ে যাওয়া শরীরটাও দেখতে পায়নি। ঐ মরার স্তূপ থেকে গা গুলিয়ে ঘরে ফিরেছিল। এমনি ত হয়, সুজাতার বয়স আর স্বামী হারানোর যন্ত্রণা আজ যেমন করে বুকে বাজে, তেমন ফাঁকা কিন্তু অবন্তী'র সাদা কাপড়ে বাপের বাড়ি আসার সময় মনে হয়নি। ভেবেছিল, কপালের দোষে স্বামী গেছে, ওর কিই-বা করার ছিল।

দরজাটা ক্যাঁচ করে শব্দ হতেই বুঝতে পারে চরণদাদু ফাঁক খুঁজে পালাচ্ছে।

পালাক, পালিয়ে আর যাবে কোথায়, ঘরে তো ফিরতে হবেই।

স্মৃতি এসে ওকে কি এখনও মুক্তি দিতে পেরেছে, পারেনি। বইয়ের গাদা চোখ পাকিয়ে দেখছে, মাকড়সার ঝুল তলিয়ে যাচ্ছে অক্ষরের ফাঁকে ফাঁকে, আরও যে কত বই-এ পোকা বাসা বেঁধেছে চরণদাদু'র স্মৃতিকে জড়িয়ে ধরবে বলে কে জানে! পোকাগুলো যত তাড়াতাড়ি শেষ করে দেবে, ও যেন আরও বেশি করে চরণদাদু হয়ে উঠবে। চরণদাদু তাই তো চায়, গণপতি চায়নি। কেন চাইবে! গণপতি'র বেঁচে থাকার রসদ তো খুঁজে পেয়েছিল ঐ ফুড কর্পোরেশনের গুদাম ঘরগুলোর পাশেই পেল্লাই অফিস ঘরে। দূর-দূরান্ত থেকে জমা হওয়া চাল গমের বস্তার পর বস্তা, ওয়াগনের পেট চিরে একের পর এক ঘাসগুলোর চাপড়া চাপা দিয়ে উপরের দিকে উঠে যাওয়া, যেন একটু পরেই আকাশ ছোঁবে।

সুপ্রকাশ তিরকে এসে বলত, স্যার, আর কতক্ষণ! এবার বাড়ি যান।

দাঁড়াও দাঁড়াও, এখন সবে কলির সন্ধে, চাঁদ উঠুক, আলো এসে বিদ্যুতের চওড়া আলোর সঙ্গে মিশুক, তবে না। দেখছ না, গুদামঘরগুলো কেমন থম মেরে আছে। চারধারে শিয়ালকাঁটা আর পুদিনাপাতার ঝোপে, মানুষগুলো সবে পড়লেই পোকামাকড় আর সরিসৃপের ফিসফিসানি। সুপ্রকাশ মাথা নাড়ে। বড় বড় ভাম আর শেয়াল ছানাদের দল বেঁধে কামড়া-কামড়ি ও-তো নিজের চোখে দেখছে, যেন চুপটি করে তাক লাগিয়ে বসে থাকে, কখন সুপ্রকাশরা অফিসঘরে তালা লাগিয়ে পা বাড়াবে, আর ওরা ওদের রাজ্যে'র কাজকর্ম শুরু করে দেবে।

গণপতি হাঁক মারে সুপ্রকাশ, জি.টি. পঞ্চান্ন নম্বর ফাইলটা দিয়ে যাও।

কি বলবে, আর কি বলবে না, মুখ গোমড়া করে ধুলো ঝেড়ে ফাইলটা টেবিলে ফেলে দেয়।

এর মধ্যে কি আছে জান—হাজার লোকের বেঁচে থাকার রসদ, আজ যদি নোট না দিয়ে ফাইলটা হেড অফিসে ফেরত পাঠাই, একদিন দেরি হয়ে যাবে, একদিন দেরি হওয়া মানে, হেড অফিস থেকে মন্ত্রীর ঘরে যেতে আরও একদিন লেগে যাবে,

এইভাবে সময় পার করেই ফাইলটা ঘুরতে থাকবে, তাহলে চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া'র হাজার হাজার মানুষ, যারা রেশন দোকানের চাল গম চিনির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে, তাদের পেটে দানা যাবে না, আর তুমি তখন পারবে, ঘরে বসে পেট পুরে খেতে।

সুপ্রকাশ স্বভাবের কারণে সবটাতেই মাথা নেড়ে বলে—হুঁ।

তাহলে মানুষের কথা ভাবা হ'ল কি না বল।

স্যার, গরীব লোকগুলো ত্যাঁদড় কম নয়, এত ভালো কাজ করলেও একটুও গুণ গাইবে না, বরঞ্চ সুযোগ পেলে মা-মাসি তুলে গাল দিয়ে, আদ্যশ্রাদ্ধ করে ছাড়বে, ওদের আপনি চেনেন না তো, আমি ওদের হাঁড়ির খবর রাখি, এক-একটা হাড় বজ্জাত।

এ-তোমার সুপ্রকাশ রাগের কথা, মন্দ-ভালো মানুষের কথা না ভেবে তোমার দায়িত্বের কথাটুকু ভাব, তাহলে আর কিছু ভাবার দরকার পড়বে না।

এ স্যার, আপনি কি বলছেন!

ঠিকই বলছি, ওদের তৈরি করা জিনিসই ওদের বিলোচ্ছ, বাড়তি কিছু নয়।

ওদের কথার ফাঁকেই একটা ধেড়ে ইঁদুর কোন ফাঁকে বস্তার গাঁটের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

কী হবে সুপ্রকাশ!

কী আর হবে। আচ্ছা আপনি কি পাগল হলেন, স্যার, শয়ে শয়ে ইঁদুর এ সকল গুদাম ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আপনি এখানে হেড অফিস থেকে নতুন পোস্টিং নিয়ে এসেছেন, তাই ওসবের কিছুই জানেন না।

তুমি যেভাবে সহজে কথাটা বলে দিচ্ছ, এমন ভাবে বললে তো সবকিছু এড়িয়ে যাওয়া যায়। আমার মা বলত কি জান, এখনও পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্য উঠছে. সব কিছু সত্য মিথ্যা হয়ে যায়নি। অনেক জিনিসই হয়তো কালের নিয়মে পাল্টে যায়, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস এক থেকে যায়, আর সেটাকে নিয়েই আমাদের কাজ কারবার করতে হয়, আবার কারবার গুটিয়ে ফেলতে হয়।

আপনার সব কথার মানে আমি বুঝে উঠতে পারি না। কিন্তু একটা কথা রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবি, স্যার, এত কাজের এনথু পায় কোত্থেকে।

এনথু বলবে না, বলবে এনথুসিয়াজম, আর না হয় খাঁটি শুদ্ধ বাংলা বলবে, আর তা যদি না পারো, তোমার মুখের কথাটিই বলবে। এভাবে অর্ধেক কথা দিয়ে বোঝালে, কোনদিন দেখবে ভাষাটাই অর্ধেক হয়ে যাবে।

সরি স্যার, আর এমন ভুল হবে না।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। 'প্রেরণা' শব্দটা তোমার কেমন লাগে?

ভালো স্যার, আর কোন আমাদের মুখের কথা।

ইঁদুরটাকে তাড়াবার ব্যবস্থা করা যায় কি করে!

সে তো উপায় আছে, এখন না হয় থাক।

না না থাকবে কেন; এখনই যা কিছু করতে হবে।

তুমি বলবে শয়ে শয়ে ইঁদুর............

কিন্তু চোখের সামনে যখন দেখে ফেলেছি, এমন একটা উটকো বিপদ রেখে যাই কি করে!

রোজ যা ক্ষতি হচ্ছে, এ-আর এমন কি ক্ষতি হবে।

'চাক্ষুস' আর 'অদেখা' এই শব্দ দুটো জানা আছে তো।

প্রথমে সামনের বিপদটা তাড়াও, না হয় পরের বিপদটা সময় নিয়ে ভাবা যাবে।

কী যে বলেন, স্যার! একটা ইঁদুর বই তো নয়।

একটা ইঁদুর সারা রাত ধরে কত ধান গম নষ্ট করবে, অথচ আমাদের দেশের কত মানুষ খেতে পায় না।

ছিঃ ছিঃ এসব কথা শুনলে নিজেকে আর ক্ষমা করতে পারি না। প্রায় কুড়ি শতাংশ লোক আধপেটা খেয়ে বাঁচে। আর অনাহারে মরে, সেও কেবল কম নয়।

সুপ্রকাশ, আমি তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি। কিন্তু তোমার মধ্যে যেটা অভাব, সেটা হল 'অনুভব'। এ-দুটো একসাথে করে দাও, দেখবে উত্তরগুলো লকলকিয়ে বেরিয়ে আসবে।

স্যার, কেন শুধু শুধু লজ্জা দিচ্ছেন।

লজ্জা কেন দেব, সত্যি কথা বলছি, তুমি ভাবছ আমি চেয়ারে বসে আছি, মোটা মাইনে পাচ্ছি, বড় ডিগ্রি আছে, লোকজন মান্যগণ্য করে, একজন কেউকেটা হয়ে গেছি।

সে-তো ঠিকই স্যার।

ঠিকই স্যার নয়, ভুল ওটা।

ডিগ্রি তো কতগুলো সার্টিফিকেট, নির্দিষ্ট কিছু বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো দিয়ে থাকে, আর এটাই আমাদের পরিচয়ের মাপকাঠি হয়ে যায়। তোমার সুবিধে কি জান, তোমাকে আর কেউ স্পেশাল ডিগ্রি দিয়ে বাঁধতে পারবে না, যত খুশি চারপাশ থেকে শিখে নাও, খাঁটি মানুষ হয়ে যাও।

সুপ্রকাশ আকাশ থেকে পড়ে। আরে এ-লোকটাকে দেখে তো বোঝা যায় না, ফুলবাবুর মতো ফিটফাট চলে, একে ওকে তাকে যখন যা মনে আসে বলে ফেলে। মানুষের কি পরিবর্তন! দিনের মানুষটা কি রাতের মায়ায় এমন করে পাল্টে যায়।

যাও, সুপ্রকাশ ইঁদুরটা ধরার ব্যবস্থা করো।

স্যার, আপনার গাড়িটা এলো বোধ হয়।

তোমাকে যা বলছি তা করো।

সুপ্রকাশ জানে গণপতি স্যারের মাথায় একবার যদি কোন কাজের পোকা ঢুকে যায়, কারও শক্তি নেই সেটা টেনে বের করে আনে।

আচ্ছা স্যার। সুপ্রকাশ মাথা নিচু করে চলে যায়।

....

এই কাকে ধরে নিয়ে এসেছ, সুপ্রকাশ!

এত রাতে কাকে আর পাব।

কোথায় থাকা হয় তোমার?

এই স্টেশনের লাগোয়া বস্তিটা দেখেছেন।

ওখানে কি করা হয়? কি নাম তোমার, মোয়াজ্জেম আলি হুজুর।

ছুতোর মিস্ত্রী।

কী করে ইঁদুরটা ধরবে?

কী যে বলছেন হুজুর, একটা কেন, অগুণতি ধরে আপনাকে দেখিয়ে দেব। শুধু একবার ধরার অনুমতিটা দেন।

ক্যাঁচ করে দরজাটা খুলে যায়, গরমের হলকা এসে এক ধাক্কায় মোয়াজ্জেমের বুকের মাঝে এসে ধাক্কা মারে। বাহিরে তখন এক কোণে ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ, মিটি মিটি অস্পষ্ট আলো এসে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে এদিক ওদিক। মোয়াজ্জেম খানিকটা অস্বস্তিতে পড়ে, হঠাৎই বুকের মাঝে এসে ধাক্কা মারে, জীবনে প্রথম এত চাল গমের বস্তা একসঙ্গে দেখল। এমনিতে ওর কাজ হলো, গোডাউনের পচা, বৃষ্টির জলে গন্ধ লাগা, পোকা লাগা, ফেলে দেওয়া চাল গমকে বস্তায় ঢেলে বেছে বেছে স্টেশনের প্ল্যাটফরমে শুকোতে দেওয়া। তাতে যদি কিছু বাঁচে সেগুলো সস্তা দরেই স্টেশনের আনাজপাতি বিক্রেতা হনুমান সিং, অপারেজয় হালুইকরদের কাছে বেঁচে দেওয়া কিম্বা বিনিময়ে সেকেন্ড হ্যান্ড সব্জি চেয়ে নেওয়া।

মেয়োজ্জেম, কাঠের বড় টুকরো আর খান কতক পেরেক আর হাতুড়ি-ছেনি-নাটবল্টু সঙ্গেই এনেছে, এইখানেই বসে একটা ইঁদুর কল বানিয়ে নিয়েছে।

গণপতি খুশিতে হোঃ হোঃ করে হাততালি দেওয়া শুরু করে, সে যেন আর থামতেই চায় না।

দেখেছ সুপ্রকাশ তোমাকে একটু আগে বলেছিলাম না, আমাদের দেশের আমজনতা'র কী জ্ঞানের পরিধি, শুধু বেছেবুছে নেওয়ার অপেক্ষায়, এসেছে বলেই না জানতে পারলে সবকিছুর কেমন কার্যকারণ সম্পর্ক। তুমিও এসে ওর সঙ্গে হাত লাগাও না, দেখবে কেমন মজা পাবে।

সুপ্রকাশ ইতস্তত করছে দেখে গণপতি নিজেই এসে হাত লাগায়।

ছিঃ ছিঃ একি করছেন হুজুর, আপনাদের একটা মান ইজ্জত আছে, না না এ ঠিক

হতিছে না, বাবুকে মানা কর, এমন মানীগুণী মানুষ হাত লাগালি মোদের গুনাহ হবে।

গুনাহ যদি হয়, সে আমার হবে, তোমার নয়, গণপতি ওকে অভয় দেয়।

গণপতিকে গাড়ি করে যেতে মোয়াজ্জেম কতবার দেখেছে, মানুষটা যে এত দিলদরিয়া, এ-তো বোঝা যেত না।

লোকজন মোদের মানুষ বলে জ্ঞান করে না, হুজুর, আপনি আমাকে আজ এত ইজ্জত দিলেন, এ আমি কোনদিন ভুলবোনি।

মানুষের হাতের ছোঁয়া লাগলে যদি মানুষ এতটা সম্মানিত হয়, তাহলে মানুষ দেয় না কেন!

পুরো গুদাম ঘরটায় চলেছে তখন ইঁদুর দৌড়ের খেলা—ধেড়ে ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর যেন মনের সুখে ঘুরঘুর করে। গণপতি ঢুকেই দেখে কত চাল গমের বস্তা কেটে কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে গুদামের ডান দিকের সিঁধ দিয়ে। দেখেই মাথাটা যেন ঘুরে যায়—আরে এ-যে যা-তা চুরি নয়, সিনে চুরি, লোকগুলোর ঘাড় মটকে যদি এখনই না দেওয়া যায়, তাহলে এই ইন-আউটের হিসেব মিলবে কেমন করে!

হুজুর কলটা তৈরি হয়ে গেছে। মস্ত বড় কল।

ওটাকে সঠিক জায়গায় বসিয়ে ওরা চুপচাপ ক্ষনেক অফিস ঘরেই বসে থাকে। ধড়াস করে মিনিট পাঁচেক বাদে এক শব্দ হয়, নিশ্চয়ই এতক্ষণে বড় মালটাই কলে আটকা পড়েছে, এবার কান টানলে মাথা আসার মতোই বাকিগুলো এক এক করে এসে কলে মাথা গলাবে।

গণপতি ভাবছে অন্য কথা, সিঁদেল চোরের কথা, একে ধরার জন্য আর একটা কল ওকে খুঁজে বের করতেই হবে......।

রাত দশটা বাজে। গণপতি পুলের ডানপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকারের পাশ দিয়ে চলে যাবার আগে দারোয়ানকে এক হাঁক মেরে যায়। দারোয়ান সালাম ঠুকে আবার স্বস্থানে ফিরে যায়। গণপতি অফিস ছেড়ে বেরোতেই পেছন দিক থেকে ভেসে আসে ক্রিং ক্রিং শব্দ, এত রাতে কার হতে পারে, বাড়ি থেকে, না কি কেউ যাচাই করে দেখছে ও কতদূর এগিয়ে গেছে, যা কিনা বিপদসীমার বাহিরে, অপারেশন মুনলাইন শুরু করার আর বেশি দেরি নেই, সব্বনাশ!

চার

কোথায় গেলে পাব তারে

স্মরণ থেকে অনেক কিছুই তো মুছে যায়, কিন্তু মানুষের অস্তিত্বকে মুছে ফেলা যায় না, সে বোধহয় হাজার বছর ধরে ফসিল হয়ে এক সময় চৈতন্যে এসে বাসা বাঁধে।

স্কুলের ঘণ্টাটা বেজে গেছে, জাতীয় সঙ্গীতের সুর শোনা যাচ্ছে স্কুলবাড়ির আকাশে বাতাসে।

আজিজুল ক্লাসে ঢুকতে না ঢুকতেই ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু কিছু কথা ফিসফিসিয়ে চলতে থাকে পেছনের আর মাঝের টেবিলের ফাঁকফোকরে। আজিজুল চেয়ারে চুপচাপই বসে থাকে, কোন কথাই বলে না। ওরা কী বলতে চায়, কিছুটা আঁচ করতে পারে। এই দশ বছরের স্কুল মাস্টারিতে এমন একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হবে কোনদিন ভাবতেই পারেনি। যদিও শিক্ষক হিসেবে ওর প্রচ্ছন্ন সুনামটা ছড়িয়েছে দিনে দিনে। কাদা ছড়াবার কারিগরটা কে? মাথা নিচু করে সেই কথাই ভাবে। এমনি সময় হেডমাস্টার এসে হঠাৎ করেই ক্লাসে ঢুকে পড়েন, কারণটা আজিজুলের কাছে স্পষ্ট নয়, এইরকম হঠাৎ ঢুকে পড়ার মধ্যে দিয়ে সন্দেহের পাল্লাটা ভারি হয়। হেডমাস্টার মশাই কোন কথাই আজিজুলকে জিজ্ঞেস করলেন না, সেটাও যে দুশ্চিন্তার পারদটা বাড়িয়ে দিয়েছে। কারও কাছে কি কোন আগাম সংবাদ ছিল!

এটা নবম শ্রেণীর ইতিহাসের ক্লাস। যে মেয়েটিকে জড়িয়ে কে বা কারা বদনাম ছড়িয়েছে, শ্লীলতাহানীর অভিযোগ এনেছে, সেটি দশম শ্রেণীর। মেয়েটি জাতে হিন্দু, বনানী মিত্র। এটাও কিন্তু একটা চিন্তার বিষয়, যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

এমনিতেই আজিজুলকে স্কুল থেকে সাসপেন্ড করা হলো না কেন, এই নিয়ে নানা গুঞ্জন শোনা যাচ্চে, রামপুর, দাসপাড়া, উল্লাসপুরের মানুষ রাগে ফুঁসছে। কথাটা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের কানেও গেছে। তিনি খোঁজ খবরও শুরু করে দিয়েছেন সন্তর্পণে।

আজিজুল-এর কেন এত লজ্জা! কথাটা চরণদাদু স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিল, 'ঘটনার সঙ্গে যখন কোন তোমার সংস্রব নেই, আমিও এ-কথা বিশ্বাস করি, তুমি এ-কাজ করতে পার না। ফাঁসিয়ে দিলেই হল।'

চরণদাদু, মানুষের মন জলের মতো, যে পাত্রে ঢেলে দেবেন সে পাত্রের রং নেবে।

কিন্তু সবই তো বুঝলুম, ঘরে তোমার সোমত্ত দুটি মেয়ে, বড় রয়েছে, ভেঙে পড়লে চলবে কেন?

কথাটা তো সত্যি। এত সহজে দমবার পাত্র আজিজুল নয়। আগে শত্রু চিহ্নিত কর, তবে না আক্রমণের কথা আসবে। বড় জটিল অঙ্ক চরণদাদু।

আজিজুল টেবিল থেকে উঠে এসে ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা সব হাঁ করে চেয়ে থাকে। কি লিখতে কি লিখে ফেলে, শেষে আর এক বিড়ম্বনা। নিজের উপর বিশ্বাসের মাত্রা চতুর্গুণ করতে আবার পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে এমন করে যেন কিছুই ঘটেনি। ওদের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে প্রশ্ন করার আগে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেয় দু'একটা বাক্য—ইতিহাস বড় নির্মম, এর মোকাবিলা করা আরও কষ্টকর! জানালা দিয়ে

তাকালেই চোখে পড়ে পচাখালে দুর্গন্ধযুক্ত জল, মানুষের যাবতীয় বর্জ্য পদার্থ, বিষ্ঠা, প্লাস্টিক, বোতল, ব্যবহৃত প্যাড, সব মিলে মিশে মণ্ড তৈরি করে কালো কুচকুচে জল। মরা শরীর, কুকুরের না মানুষের, স্রোতে ভেসে এসে আটকে পড়েছে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আর মেঘের গর্জনে কেঁপে যাচ্ছে ঐ সরু খাল।

স্যার, আমি বলব।

আজিজুল চুলগুলো যত্ন করে গুছিয়ে ক্ষণেক চিন্তা করে কী এমন প্রশ্ন করেছিল যে ছাত্রটি জবাব দেবে।

স্যার, আমি বলব।

আরও দু'চারটে ছেলেও হাত তোলে।

মেঘকালো আকাশের আলতো ছোঁয়ায় শরীরটা গুছিয়ে নেওয়ার আগে মনটা ছিটকে বেরিয়ে গেলে এমনটাই হয়, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

কি যেন বলছিলাম?

মেয়েগুলো হাত দিয়ে বোর্ডের দিকে আঙুল তোলে—ইতিহাস বড় নির্মম।

আচ্ছা, তোমরা সবাই চরণদাদুকে চেন?

হ্যাঁ স্যার।

কি জান?

ভবঘুরে, ধুতি আর ফতুয়া পরে, গলায় গামছা আর পায়ে কাঠের স্যান্ডেল পরে এক হাতে হাতির দাঁতের লাঠি আর অন্য হাতে কাগজের মোড়ক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

আচ্ছা, তোমরা জান, ১৯৪৮ সাল ১২ জানুয়ারি কি কারণে বিখ্যাত?

মহাত্মা গান্ধী এই দিন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির জন্য তার জীবনের শেষ আমৃত্যু অনশন শুরু করেন কলকাতায়।

আর কী কারণে জান?

ঐ দিনটায় চরণদাদু'র জন্ম।

চরণদাদুর আসল নাম?

জানি না স্যার।

গণপতি হালদার।

১৯৮৭ সালের ২২শে নভেম্বর কেন বিখ্যাত জান?

বিপ্লবী সুরকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস দেহত্যাগ করেন।

আর কোন ঘটনা ঘটেছিল সেদিন?

গণপতি হালদার-এর নবজন্ম হয়েছিল, চরণদাদু নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

স্যার, ইতিহাসের ক্লাসে সাধারণ জ্ঞান পড়ব কেন?

সাধারণ মানুষের সঙ্গেই যে ইতিহাসের প্রকৃত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, একথাটা আমরা

আগে বুঝিনি, যখন বুঝলুম, বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

মেয়েগুলো ফিসফাস শুরু করে আবার, আজিজুল স্যারের মাথাটা কি সত্যিই খারাপ হয়ে গেল!

স্যার, এবার আসল ইতিহাসের বইতে আসুন।

আজিজুলের যে আজ সত্যিকারের ইতিহাসে ঢুকে পড়া সম্ভব নয়।

ইতিহাসের বর্ণময় চরিত্ররা যে ভাবে যে ভাষায় কথা বলে, আজ যে আজিজুল অন্য ভাব অন্য ভাষায় কথা বলবে বলে ঠিক করেছে।

তোমরা যে যার কলম নিয়ে বস।

তোমরা ভাবছ চরণদাদু স্যান্ডেলে পা গলিয়ে গলায় গামছা দিয়ে ফতুয়া আর ধুতি পরে ঘরের কাছেই তো হেঁটে চলে বেড়ায়, তার সম্বন্ধে এত গল্পগাছা কেন! প্রয়োজন আছে বই কি। সে মানুষই ইতিহাস হয়ে ওঠার যোগ্যতা রাখে, যে ঘটনার নতুন মূল্যায়ন করে, বাহিরের কাঠামোটা পালটে দিয়ে ভিতরের কাঠামোটা.......।

বাহিরে এত গোলমাল কিসের?

স্যার, স্কুলের ভেতরে একটা ষাঁড় আর গাইগোরু ঢুকে পড়েছে। ছাত্রীরা বলাবলি করতে গিয়ে গোপন হাসি হাসে।

তাই বল, আজিজুল কথাটা বলতে গিয়েও থমকে যায়। তবে কি যে কথাটা ওরা এতক্ষণ বলতে চাইছিল, এইভাবেই প্রকাশ করল, সরাসরি বলতে পারেনি বলে। সত্যিই হয়ত কোন গরু কিংবা অন্য প্রাণী ঢোকেনি। ওরা স্রেফ মজা করার জন্য গল্প ফেঁদেছে, কিন্তু এর আগে তো এমনভাবে মজা করেনি, তবে কি গোটা ঘটনাটা ওরা এইভাবেই পাল্টে দিয়েছে; বা অন্যভাবেও বলা যেতে পারে, ওরা গল্পটা শুনে খুব একটা আমল দেয়নি। আজিজুল স্যারকে জানে বলেই সত্য মিথ্যে যাচাই করার ইচ্ছেটুকু হয়নি, কিংবা ওরা এমনই এক নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে দেখেছে, যেভাবে গার্জিয়ানদের দেখার চোখ তৈরি হয়নি। ওরা এক তরফা রং চড়িয়েছে। তাহলে এতদিনের বিদ্যে বিতরণের একটা দাম অন্তত পেল, আজিজুলের কাছে এইটে ওর একমাত্র স্বস্তি ও সান্ত্বনা এই মুহূর্তে, হয়ত সামনের দিনগুলোতেই বাঁচার শক্তি যোগাবে।

কাউকে দেখলাম যেন জানালার নিচে!

কই কেউ না তো স্যার।

আমি যেন দেখলাম কাউকে।

আপনার মনের ভুল।

বাসের ধোঁয়াটা কুণ্ডলী পাকিয়ে ভাসতে ভাসতে জানালায় ঢুকে পড়েছে। বড্ড ঘন কালো ধোঁয়া। সাপের মতোই ফণা তুলে, দংশন করে যেন ধরা ছোঁয়ার বাহিরে চলে যাচ্ছে। অটো স্ট্যান্ড থেকেও ক্যাঁচর ম্যাঁচর, হৈ হল্লা, কান ফাটানো আওয়াজ, বেপরোয়া

পাশ কাটাতে গিয়ে স্কুলের দালানে ধাক্কা মারে, বলতে গেলে পিঠে পড়বে দশমণি ঘা, আর কত যে বড় থাপ্পর খেতে হবে, শুনতে হবে কাঁচা খিস্তি, বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে।

আজিজুল মুখ ঘুরিয়ে দেখে ছেলেগুলো সটান উঠে দাঁড়িয়েছে; হেডস্যার এসে গলা বাড়িয়েছে, চোখ দুটো বড় বড় করে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে—শুনুন, ক্লাস শেষ হলে আপনি একবার আমার রুমে এসে দেখা করে যাবেন, অনেক কথা আছে।

ঠিক আছে স্যার।

হেড স্যার কটমট করে তাকায়, গটগট করে হেঁটে চলে যায়। ভয়ে প্রায় আত্মারাম খাঁচা হয়ে যাবার জোগাড়, শেষে চাকরিটা না চলে যায়।

মে আই কাম ইন স্যার।

আসুন, বসুন।

হেডস্যার কলম চালিয়ে রেজিস্ট্রারে কী-সব কাটাকুটি করে। একবার মুখ তুলেও মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আলমারির দেয়ালে একটি টিকটিকি অনেকক্ষণ চেষ্টার পরেও পোকাটিকে ধরতে পারছে না, পোকাটা কখন যে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘরে চলে এসেছে, দেয়ালের গায়ে সেঁটে আছে, টিকটিকি জিবের ডগায় একটু হলেই গিলে নিয়েছিল, আর কি।

আজিজুল হুস্ বলে পোকাটাকে তাড়াতে যায়, আর শিকার আর শিকারী দুজনেই দুদিকে ছিটকে যায়। এইসময় চরণদাদুর কথা খুব মনে পড়ছে আজিজুলের।

হেডস্যার মাথা তুলে বললেন, 'কী হয়েছে?'

না আসলে দেয়াল রং করা হয়নি অনেকদিন, কালচে বিন্দু-বিন্দু জলের দাগ পড়েছে, সেদিকে চোখ যেতেই দেখে টিকটিকি আর জাবরাপোকা।

তাতে কি হয়েছে! আপনি তাড়াতে গেলেন কেন? ওর খাওয়ার যদি কেউ কেড়ে নেয়, টিকটিকিটাই বা বাঁচবে কি করে, আপনার কথাই ধরুন না, আপনার চাকরিটা যদি আমি কেড়ে নি, আপনি ও আপনার পরিবার না খেতে পেয়ে মরবে, সে কাজ কি আপনি পছন্দ করবেন?

একে আগুন ঢালা গরম, জামা গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে, হেডমাস্টারের ইঙ্গিত শুনে গা দিয়ে টস টস করে ঘাম ঝরে পড়ে।

আরে ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আমি কি সত্যি সত্যি আপনার চাকরি কেড়ে নিচ্ছি।

শুনুন, কাল থেকে আপনাকে একটা অ্যাডিশনাল দায়িত্ব দিচ্ছি, লাইব্রেরী রুমের দত্তবাবু লাইব্রেরীর কিছু বোঝে না, লাইব্রেরীর জন্য এমন সব বইপত্র পছন্দ করেছে, কচি ছেলেমেয়েদের মাথাটি চিবিয়ে খাবে। আপনি যদি দায়িত্ব নেন তো আমি নিশ্চিত হই। হেডমাস্টারের আস্থা দেখে আজিজুল এতটাই খুশি হয়, যেন কেঁদেই ফেলবে, পাছে হেডমাস্টার মশাই টের পেয়ে যান, কফ ফেলার নাম করে গলা খাঁকারি দিয়ে জানালার কাছে এসে রুমাল দিয়ে চোখটা মুছে নেয়। আজিজুল কি সত্যি সত্যিই দুর্বল

হয়ে যাচ্ছে, এতটা দুর্বল মানসিকতার মানুষ তো ছিল না ও। ঘটনার আঘাত আর বয়সের ভারে মানুষ এতটাই মুষড়ে পড়ে যে আসল লোকটাই যেন অন্য সুরে কথা বলতে আরম্ভ করে। আজিজুল নিজেকে সামলে রাখে, যা হোক হবে ও ফেস করবে, কিন্তু পিছু হটবে না, মনের জোরটাও দ্বিগুণ বাড়িয়ে নেয়।

ঠিক আছে স্যার, আপনি যাই বলেন, তাই হবে।

আবার পরক্ষণেই সন্দিগ্ধ মনটা অনেক প্রশ্ন করতে শুরু করে, এটা হেডস্যারের কোন নতুন কারসাজি নয় তো ছাত্রদের মতো, সরাসরি বলতে পারছে না বলে ঘুরিয়ে চাপ সৃষ্টি করে চলে যেতে বলা। আবার নিজেই একশ-আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়—দেখাই যাক্ না।

এই বৃষ্টি, এই রোদ। বৃষ্টির ফোঁটা আর গরম দুয়ে মিলে শরীরটাকে আদ্রতায় মুড়িয়ে দেয়, গামছা চিবনোর মতো নোনা জল নিংড়ে বের করে। ষড়ঋতু এখন ডুমুরের ফুল হয়ে গেছে, হাপিত্যেশ করে কখনও সখনও দেখা মিললেও মিলতে পারে। চরণদাদুই বলেছিল, আজিজুল খবরের কাগজটা খুটিয়ে পড়, আর তাও যদি না পার, অন্তত সম্পাদকীয় কলমটা পড়ে দেখ আজকে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা বলেছে, বলছে বরফ গলে নদী ফুলে ফেপে উঠবে, ওপার বাংলার বেশ কিছু জেলা জলের তলায় সেঁধিয়ে যাবে, আদ্রতা বাড়বে যত দিন যাবে।

চরণদাদু, সবটাই মানুষের পাপের ফল।

পাপ-শব্দটা বলে পাপের অপব্যাখ্যা করা হবে, আদ্রতা আর উদাসীনতা শব্দটা এখানে খাপে খাপে মিলবে।

চরণদাদু, আপনি শব্দ ও উচ্চারণ, বানান এসব সম্বন্ধে এতটা সচেতন কেন?

কেন তুমি সচেতনতার কি দেখলে, যেভাবে বলা উচিত, যেমন করে বলা উচিত, যা বলা উচিত, বলার আগে সবটাই যে মনে রাখতে হবে, না হলে চলবে কেন?

আপনার সম্বন্ধে আমাদের সুকুমার পিওনের কাছে গল্প শুনেছি, ভুল বানানের চিঠি লিখলে আপনি নাকি আবার ফেরত পাঠিয়ে দেন।

চরণদাদু দু'এক কদম এগিয়ে গিয়ে ঠকাস ঠকাস স্যাণ্ডেলের আওয়াজ করে অবাক হয়ে বলে, ঠিক করেছি না ভুল করেছি, তুমিই বল।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্বন্ধে সেদিন প্রায় আড়াইশ শব্দের এক মনোজ্ঞ ভাষণই দিয়ে দিয়েছিল। উদ্দেশ্য একটাই, যদি ছাত্র-ছাত্রীদের দু'এক কথা শুনিয়ে সচেতন করতে পারে।

অজিজুল বড় রাস্তায় উঠে যায়, হাতটা মাথায় দিয়ে আপ-ডাউন গাড়ির ফাঁক ফোকরে গলে গিয়ে রাস্তা পার হয়। গাছগুলো যেন কিসের নেশায় ঝিমিয়ে থাকে, বর্ষায় ঝমঝম করে ভাঙা আকাশের গা লেপটে থাকা জলবিন্দু মাটির কণাগুলোকে একটু পরেই ধুয়ে

দিয়ে যাবে। আজিজুল সেই অপেক্ষাতেই দাঁড়কাকের মতো দু'এক গোছা ভেজা চুল দিয়ে শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে নেয়। জগদীশপুর একটু দূর বই কি।

পাঁচ

জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা

ইঁদুর কল বানিয়ে যেদিন ইঁদুর মারার যজ্ঞে নেমেছিল গণপতি, ভেবেছিল অনেক মানুষের রুটির ব্যবস্থা তো করা গেল। দু'বেলা দু'মুঠো জলভাত খেয়ে তো বাঁচবে। তাতে গণপতি সাহেবের গায়ে অনেক জমাট বাঁধা ধুলোর আস্তরণ উড়ে এসে রাঙিয়ে দিয়েছিল ধুলো রং-এ, পোশাক-আশাক তো বটেই, মাথার কুচকুচে কালো চুলগুলো সাদা-কালোতে জট পাকিয়ে এক অন্যরকম চেহারা নিয়েছিল। অফিসঘর থেকে বেরিয়েই লম্বা চওড়া কালো কুচকুচে দাঁড়াশ সাপকে দেখে ভয়ে চুপসে গিয়েছিল—কত পথ, আর কত পা যে সেপথে সাবধানে ফেলতে হবে, মানুষকে তা ভাবার সুযোগই দেয় না। দ্বিতীয়বারও একটা ক্রিং ক্রিং শব্দ জব্দ করার চেষ্টায় ছিল। গণপতি ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল 'হুশ্', এত কিছু ভাবলে চলে না সুপ্রকাশ, গাড়িতে চড়ে বস, তোমাকে জিঞ্জিরা'র মোড়ে ড্রপ করে ছুটবে আমার নন্‌স্টপ গাড়ি।

বাজারে এখনও লোকজন গমগম করছে, মাছওয়ালারা দর হাঁকাচ্ছে শেষবেলায়—বাবু কোয়ালিটিটা তো দেখবেন, কি দিচ্ছি একবার কড়াই-এ চড়িয়ে মুখে ঠেকালেই বুঝতে পারবেন। লোকটা মাছ রান্নার একটা রেসিপিও দিল। এটা বোধ হয় ব্যবসার নতুন কৌশল।.... আরে বাবু এখানে যা কিছু সব আমার নয়, জনগণের, যা লাগবে নিন.... পয়সার কথা আপনাকে বলেছি, আমরা মানুষ চিনি, বলেন তো আমার লোক গিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে আসবে।

বাঃ বেশ তো লোকটা চটপট কথা বলে! গণপতি ভাবে, 'কাল থেকে ওর জায়গায় যদি আমি বসি আর ও আমার চেয়ারে বসে, কী ঘটনাটা ঘটবে!'

কি ভাবছেন এত বাবু? বুঝেছি, আমি এত কিছু শিখলাম কোত্থেকে!.... স্রেফ অভিজ্ঞতা..... মানুষের মনের হদিশ খোঁজা।

তার মানে!

আপনি যা ভাবছেন বা ভাবার চেষ্টা করছেন, তাকে আমার মনের ছাঁচে ফেলে একটু পেশাই করে নিলেই গড়গড় করে আমি সব বলে দিতে পারি!

না, না, তোমার মধ্যে আরও কিছু আছে।

কি আছে বলুন তো?

তাই তো ভাবছি, এত লোকের আকর্ষণ বিকর্ষণে ঠেলা সামলাচ্ছ কি করে।

আপনাদের কৃপা আর গুরুর আশীর্বাদ।

আলু, পটল আর সবজি দোকানের মধ্যে মনিহারি দোকান খুলে বসেছে কালো বেঁটে মতো লোকটা। হাসলে বেশ লাগে। ভুঁড়ি এলিয়েই কেমন দেঁতো হাসি হাসছে—যেই আসুক আর যতই বেছে নিক না কেন দাঁড়িপাল্লার কাঁটায় কাঁটায়, ওজনে ও কচুকাটা করে ছাড়বে। সাটার টেনে দিয়েই নিমাই বাগদিকে ভ্রূকুটি করে চলে যায়। যাবার বেলায় টিপ্পনি কাটে— যা পারিস দুয়ে নে।

আরে যাও যাও, তোমার মতো চশমখোর, হাঁড়কিপটে, রক্তচোষা দোকানদার নিমাই নয়, বুঝলে, আরও সাতবার জন্মাতে হবে, তবে যদি নিমাই বাগদি হতে পার।

আরে করিস তো চাঁড়ালগিরি, তো এত কথা কিসের রে!

তাতে তোর কি, কারও বাপের খাই না পরি, যাও যাও আগে নিজের ঘর সামলাও গে, তারপর পরের চরকায় তেল দেবে।

কথাটা উল্টো করে বলার ফাঁকেই ও পাল্লাটার কাঁটাটা দেখে নেয়।

বাবু, ঠিক আছে তো!

কোমরের গামছাটা খুলেই যাচ্ছিল, টেনে খুব করে কষে বাঁধে।

বাচ্চা ছেলেটা আধা পচা আলু পটল কুড়াচ্ছিল, নিমাই-এর নাজেহাল অবস্থা দেখে ফিক্ করে হেসে ফেলে।

হাসো, হাসো, আরও বেশি করে হাসো, তোর বাপেরটা দেখে আরও বেশি করে হাসিস।

ছেলেটা কোমরের তাগায় ঝোলানো ঘণ্টির শব্দ করতে করতে ফুড়ুত করে পালিয়ে যায়।

সবজির লরিটা কোলে মার্কেটের পাইকারদের কাছ থেকে মাল নিয়ে চোঙা চোঙা ধোঁয়া ছেড়ে গাঁক গাঁক করে নিমাই-এর দোকানের সামনেই দাঁড়াল।

গণপতি চারদিক ভালো করে দেখে নেয়। রাত যত বাড়ে, রাতের অতিথিরা ততই বাড়তে থাকে, তাদের মুখ আগলে মুখোশটা জাঁকিয়ে বসে, মানুষগুলোকে চিনেও যেন চেনা যায় না। কত মুখই তো গণপতির অচেনা লাগে অথচ মনের আয়নায় মানুষের প্রতিচ্ছবি আঁকতে ও হাড়মাংস রক্ত একদিকেই বইয়ে দেয়। মানুষের ছবি আঁকার এত আগ্রহ ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

একটা নেড়ি কুত্তা ভয়ে হোক আর সমঝোতায় হোক বেজি দেখে তাড়া মারে—ভাবখানা এমন, এ গলিটা আমার, এখানে আসার তো তোমার কথা ছিল না। গোঁফওয়ালা বেড়ালটা গোঁফ ফুলিয়ে কড়কড়িয়ে চায়, ঠিক আছে, তুমি আমার পাড়ায় এলে আমিও দেখে নেব, দশটা কুকুর লেলিয়ে দেব, তোমার মুখ ছিলে নেবো।..... কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠে বুক ফুলিয়ে, যা যা আর বুকনি দিস না বেপাড়ায় এসে,

মারধোর খেয়ে যাবি, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা.......। সত্যি সত্যি বেজিটা ফিরে তো গেল, রেখে গেল অনেক প্রশ্ন—এভাবে দেয়াল তুলে বাঁচা যায় কি : গণপতি ঐ হুলো-হুলাদের চক্করে পড়ে নাজেহাল হয়ে যায়। নিমাই ব্যাগটা গাড়িতে তুলে দিয়ে বলে, আবার আসবেন। আঁধার নেমে আসলেই মানুষ নতুন করে ভাবতে শিখে ফেলে, চেনার পরিধি বাড়িয়ে দেয়।

হু হু করে বি.বি.টি. রোড বরাবর গাড়ি ছোটে। লম্বা লাইনে জ্যামে আটকা পড়ে যায় একটু পরেই। শ্যামপুরেই কোন গোলমাল হয়েছে। বাস, ট্যাক্সি, ট্র্যাকার-ভ্যান গাড়ি, লরির মাঝখানে অটো গাড়িটা হঠাৎ ব্রেক ফেল করে আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। ড্রাইভারের ডান পাশে বেআইনিভাবে যে দুজন বসেছিল তারাই ছিটকে গিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির মোটা লোহার পাইপের মাথায় গিয়ে পড়ল। হায় কপাল!..... মাথা ফেটে খুলি বেরিয়ে গেছে..... বিপত্তি বলে বিপত্তি...... যাও এবার আল্লার উপর ভরসা ছাড়া নিস্তার নেই..... কখন যে খুলবে..... তসবি জপ আর কি।..... দিনকাল এমনিতেই ভালো নয়.... এই তো কালই ছিনতাই হয়ে গেল মাছ ব্যাপারির দশ হাজার টাকা..... আর বলেন কেন দেশ থেকে শান্তি উবে গেছে। ড্রাইভারটাকে সামনে এগিয়ে দেখতে বলে গণপতি প্যান্টের জিপ খুলে হর্‌র্‌.... হ্ র্ র্ করে হিসি করে হালকা হয়, চারপাশ তাকিয়ে দেখে নেয় কোন পরিচিত মহিলার মুখ চোখে পড়ে কিনা.... লজ্জা লুকোবার জায়গা থাকবে না।... মানুষের আক্কেল যে কবে হবে!

পকেট থেকে রুমালটা বের করে জামার বোতামটা খুলে ঘামটা মুছে নেয়, মুছলে কী হবে, আবারও জামাটা ভিজে যেতে থাকে।

কুন্তল মজুমদার, পাড়ার জামাই, লোকটার পোশাক-আশাকের বাহিরে ঢঙটা যেন মজ্জায় মজ্জায় ঘোরে। সিগারেটটায় ফুঁ দিয়ে গাড়ির বাহিরে মুখ বাড়ানো গণপতিকে দেখতে পায়।

কেমন শিক্ষে হল! এবার বুঝছেন তো দেশটার হাল।

এর সঙ্গে দেশের হালের কি ব্যাপার হ'ল।

ন্যাকা সাজবেন না তো! এই আপনাদের মতো লোকদের জন্যই নট নড়ন চড়ন।

কীসের?

কীসের আবার, আমাদের সরকারের।

সরকার আবার কি করল।

করল তো অনেক কিছুই, যা করা দরকার ছিল না।

একটা জ্বলন্ত উদাহরণ।

দেশের লোকদের মূর্খ বানিয়ে ছেড়েছে!

আপনার কথা আপনি বললেন, কিন্তু এই দুটা টার্মস-এ কি করেছে সেটা বললেন না

তো, সেটা কি নিটফল শূন্য।

কিন্তু সরকারের ব্যর্থতার সঙ্গে রাস্তার গাড়ির মাঝখানে অটো ঢুকে যাওয়ার কী সম্পর্ক?

সম্পর্ক আছে বই কি, লাই দিয়ে মাথায় তুলেছে।

আরে মশাই এই ছেলেগুলো বেকার হয়ে চুরি-ডাকাতি করলে আপনি কিন্তু একই কথা বলতেন।

ব্যক্তির আচরণের জন্য কে দায়ী?

খুব গুরুত্বপূর্ণ ও মজার প্রশ্ন করেছেন। উত্তরটা খুবই জটিল।

ব্যক্তির কাজে সমষ্টির ক্ষতি হয় ঠিকই, কিন্তু দায়টা সব সময় সমষ্টির থাকে না। সেখানে ব্যক্তির সিদ্ধান্তই সেই মুহূর্তে অসুবিধা সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা নেয়। এতে রাজনৈতিক রং চড়ানোটা ঠিক নয়। আরে জামাইবাবু কথা না বাড়িয়ে একটু এগিয়ে দেখুন কদ্দুর কি হল! গাড়িটা ক্লিয়ার করা গেছে কিনা!

দেশে নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, সমস্যা বাড়ছে বই কমছে না।

তাহলে শুধু নির্দিষ্ট একটা সরকারকে দোষারোপ করে লাভ তো নেই, যখন অর্থনীতির লাগামটা ধরে আছে অন্য একজন।

আপনি দেখছি একপেশে অর্থাৎ একদিকে ঝোল টেনে কথা বলছেন।

না, এমন দুরভিসন্ধি আমার নেই, কিন্তু সত্যি কথাটা তো বলতে হবে। বড় ফাঁকা জায়গা পূরণের জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন, একদশক, দেড় দশক তো সময় নেয়, যেখানে শত বছরের জঞ্জাল স্তূপ হয়ে আছে। ব্যক্তির কথা বলছিলেন না, ব্যক্তি যখন মনে প্রাণে সমষ্টি না হয়ে উঠছে, এ-অনিয়ম বেনিয়ম চলছে চলবে, কারও কোন সাধ্য নেই, অনিয়মের ক্ষেত্রটাকে বুজে ফেলে।

হার মানছি গণপতিবাবু, আপনাকে কথায় হারানো যাবে না, এই আমি মাথা নত করলাম।

আরে এ-কি করছেন! আপনি হলেন সবার জামাই, আপনাকে এটা মানায়!

আরিব্বাস! ঐ লোকগুলো ওখানে কি করছে?

আবার কি করছে, হেরোইন খাচ্ছে।

এত ভালো জামা কাপড় পরা শিক্ষিত ছেলে, পাঁকুর গাছের তলাটাই ওদের পছন্দ হ'ল।

নেশাখোরদের আবার জায়গা।

অবিশ্বাস্য!

যুবক ছেলেমেয়েদের প্ল্যান করে মারা হচ্ছে মশাই, এ-দেশে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চলছে।

এর পেছনে কার হাত রয়েছে!

পরিষ্কার করে নির্দ্বিধায় বলতে চাই আই.এস.আই.-এর। এরা সারা দেশে জাল বিছিয়ে ফেলেছে।

বাপ্‌রে! একবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের যুবক সমাজের কপালে দুঃখ আছে।

বেকারত্ব আর দারিদ্র মোচন না হলে এই অবস্থার সুযোগ ওরা নেবেই। ওরা প্রথমেই টার্গেট করে গ্রামের দরিদ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ছেলেদের, ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়েই কাজ হাসিল করার চেষ্টা করে।

কিন্তু এদের উদ্দেশ্যটা তাহলে কি?

উদ্দেশ্য একটাই, সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া।

আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখতে হবে।

একটা শ্রেণীর মানুষ এদের পাতা ফাঁদে পা দিচ্ছে কেন?

কোথায় ওদের ক্রাইসিস।

আপনার কি মনে হয়?

আইডেনটিটি। এ-এক মস্ত বড় ক্রাইসিস, নিজেদের মেজরিটি থেকে বিচ্ছিন্নভাবা, সেই মোটিভেশন। ভাবতে বাধ্য করে বিভ্রান্তদের, এই দেশ তোমাদের দেশ নয়, তাই এর শক্ত বুনিয়াদ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দাও।

কিন্তু তর্কের খাতিরে আপনার কথার সত্যতা যদি মেনেও নি, তাহলে মাইনরটিদের মেজরিটি হওয়া অঞ্চলে এত স্যাবোতেজ হচ্ছে কেন?

এর উত্তর হল নিয়ন্ত্রণহীন সরকারি ব্যবস্থা আর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উপর সরকারের নির্ভরতা আর তাকে অশুভ কাজে ব্যবহার করা, আর সেটাই একসময় বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। আশ্রয়দাতাকে নির্মূল করে দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চায়, যখন সেই আশ্রয়দাতাই তাঁর উদ্দেশ্যের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়।

বাঃ সুন্দর বলছেন তো, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ, গণপতিবাবু।

আমি শুধু আমার অনুভবটা বললাম, এর মধ্যে তত্ত্বগতভাবে ভুল থাকতে পারে, আমি তো আর বিশেষজ্ঞ নই।

তাহলে উপায়!

আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে এটা মুক্তির পথ নয়। জনগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রেখেই সকলকে নিয়ে এগোতে হবে;একা নয়। রবীন্দ্রনাথের কথা আছে না "যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে, পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

উঃ লোকটা যে কী ধাতু দিয়ে তৈরি, একবার যদি ওর মাথার খুলিটা বের করে গবেষণা করা যেত।

চলুন, রাস্তা বোধ হয় ক্লিয়ার হয়ে গেছে, আমার বাসটা পেছনে রয়েছে, চললাম আবার কথা হবে।

একযোগে শত শত গাড়ি স্টার্ট দেওয়া হ'ল, শুরু হল শব্দের জঙ্গিপনা, গণপতি ভ্রূ কুঁচকে কানে আঙুল দেয়। ভাগ্যিস লোকটা সূত্রটা ধরিয়ে দিয়েছে, তাই না এতগুলো কথা বলা গেল। কিন্তু বলে কি কোন ফায়দা আছে, কাজ চাই, প্রচুর কাজ চাই, মানুষের জন্য কাজ। গণপতি ডান হাতটা ভাঁজ করে কনুইটা জানালায় ঠেস দিয়ে হাতের পাঞ্জা মাথায় ঠেকিয়ে এতক্ষণের গুমোট আবহাওয়া থেকে চটজলদি মুক্তি পেতে চাইছে। নির্ঘাৎ একটা নিম্নচাপ সৃষ্টি হবে বঙ্গোপসাগরের কাছে, গত সপ্তাহে নিম্নচাপটা ঝাড়খণ্ড ছত্রিশগড়ের কাছে যেতেই আবহাওয়া দপ্তর ঘোষণা করেছিল, 'আপাতত আতঙ্কের কোন কারণ নেই।' মানুষ যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচে ছিল। তবুও এখন মনে হচ্ছে, বৃষ্টি না নামলেই নয়।

ড্রাইভারকে স্পিডটা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়ে দম বন্ধ করে বসে থাকে গণপতি। দর দর করে ঘাম ঝরে। গণপতি ড্রাইভারটার কথা ভাবে—হ্যাঁগো, তোমার এতক্ষণ বসে থাকতে কেমন লাগছে!

ড্রাইভারটা প্রথমে চমকেই উঠল, আরে বাবু আমার কথা ভাবতেছে কেন?

সন্দেহ দানা বাঁধল। লোকটার কোন মতলব আছে কিনা!

.....সবাইকে সন্দেহ করলে হয়..... কিছু কিছু মানুষকে বিশ্বাস করতে হয়, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর।

কি গো তুমি যে বড় আমার উত্তর দিলে না।

গণপতির এবার খুব রাগ হলো, উত্তর দিতে গিয়ে ভাবে পনের মিনিট, সে কিনা আমার ড্রাইভার!

গণপতির ভাবনাটা ঠিক হচ্ছে না বুঝতে পারে, ...আমার মধ্যে, কর্তা হুজুর, প্রভুসুলভ ব্যাপারটা কাজ করছে, না হলে ড্রাইভারকে ছোট করে দেখে নিজেকে বড় করার ইচ্ছে হ'ল কেন?

হ্যাঁগো, তোমার নামটা আমি বেমালুম ভুলে যাই, কতবারই না তুমি বলেছিলে!

আসলে বাবু ছোটনোকের নাম মনে রেইখে কি আর করবেন? আপনার আর দোষ নিই, আমিই মনে কইরতে পারলুম নি!

গণপতি ওর কথাগুলো বিবশ হয়ে শুনল, জিবকে নিয়ন্ত্রণে রেখে বলল, না কোন কথা বলবি না, অপরাধের কথা বলতে নেই।

বাবু, আপনি রাগ করলেন কি! রাগ করবেন নি, বাবু, মুখ্য সুখ্য মানুষ, কি বইলতে কি বইলে ফেইলেছি. দোহাই আপনার, আপনি মুখ বেজার কইরে থাকলি খারাপটা

মোরই নাগবে।....

মোর বউ বলে বড় মানুষকে অশ্রদ্ধা করো নি।

কেন তোমার মা কোথায়!

সে তো গত হয়েছে বছর পাঁচেক আগে, চইলে গিয়ে মোদের রক্ষা কইরেছে।

মার সম্বন্ধে এত ছোট বড় কথা বলতে তোমার লজ্জা হয় নি।

নজ্জার কথা কি আর বইলব, সে বেটি নিজেই যে মোদের নজ্জিত কইরে ওপরে পাইলেছে।

কী রকম!

মোর বাপকে বিষ দিয়েছিল অন্যের সঙ্গে পীরিত মাড়াতে গিয়ে।

তাই বলে!

এখনও তো আসল কথাটা বলা হয় নি বাপু। মার যখন শরীরে যন্ত্রণা দেখা দিল একদিন, রক্ত পরীক্ষা কইরে ডাক্তারবাবু বললো মারণ রোগ—এইড্স। কি বলবো বাবু, মার কি কষ্ট, সে চোখে দেখতে পারবে নি। সবাই মোদের এক ঘরে করে রাইখলো।

ধোপানাপিত বন্ধ কইরল।

কেন আর কেউ ছিল না!

ছেল বাবু ছেল। ছোট ছোট দুটো ভাই, বলতি পারেন সবে চোখ ফুইটেছে।

পড়ালেখা করলে না!

বাপ পান বিড়ির দোকান করে পড়াত মোরে। স্কুলের দিদিমণি বাপকে বলত, 'ছেলের তোমার মগজ ভালো, পড়ালেখা শেখাও, আখেরে লাভ হবে।' পারলুম নি বাপু। মা চলে যাওয়ার পর বাপ মোর ভেইঙে পড়ল। কত বুঝালুম, ওরকম বউ-এর কথা ভেবো নি। যে কিনা তোমারে বিষ দিতে চেয়েছিল, তার তরে এত চিন্তা কিসের। মার কষ্টের কথা বইলে পেত্থম পেত্থম কাঁদত, তারপর তো দোকানপাতি বন্ধ কইরে ঘরে বইসে গেল। চই'লে এলাম এক খুড়তোতো ভাই-এর হাত ধইরে শহরে। মথুরাপুর থেইকে বাসে কঙ্কনদিঘিতে.....হরিচরণে।

চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল, যেন হীরে মুক্তো মোড়ান।

এই তো মাকে যা-তা গালাগাল দিলে, আবার তার জন্য এখন চোখের জল ফেলছ।

কী করব বাবু, মাকে বড় ভালবাসাতাম যে, সে বেটি বুঝল নি।

গণপতি বোবা হয়ে গেল যেন কথাটা শুনে-কী বিচিত্র মানুষ, আর আরও বিচিত্র তার মন, কে জানে কার ঠিকানা। গণপতি হরিচরণকে আর একটা কথাও জিজ্ঞেস করে নি। বাইরে ততক্ষণে নেমেছে ঝমঝম বৃষ্টি, সামনের কাঁচটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, ওয়াইপার-এর দৌলতেই একটু একটু বৃষ্টি ভেজা রাস্তাটা দেখে ফেলা। হরিচরণের চোখের জলের

যে গোপন স্রোত, তার সঙ্গে এর এতটুকু তফাত নেই।

ছয়

শেষ হয়েও না হয় শেষ

থমথমে অন্ধকারে আকাশ ফুঁড়ে গর্জন শুরু হয়েছে, গণপতির মাথা ফুটো করে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক এসে বেরিয়ে যাবে। নেড়া সুপুরি গাছ, বাতাবি গাছ ফলবতি হয়ে বাতাসের দোলায় নুয়ে পড়ছে, স্কুল বাড়িটার টিনের ছাদ জল খেয়ে তরতাজা... ধর্মের ষাঁড়টার ভিজেই যেন আনন্দ, বৃষ্টি থেকে বেঁচে যাবার এতটুকু আগ্রহ নেই.....

গণপতি হরিচরণকে বিদায় দিয়ে ছাতাটা মেলে ধরল। পায়ের নিচে সরসরিয়ে কি যেন চলে গেল..... ভয় আর কি, বিষদাঁত বসাবে, বিষের হুল তো এমনিতে কম খেতে হয় না, তবে ঐ বিষের ডাক্তার বদ্যি নেই, এ-বিষের ওঝা তুকতাক, হেকিমি, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি সবই আছে, খাপে খাপে পড়ল তো বাঁচোয়া, না-হলে ফুস্।

কান্নাটা যেন দিঘির ওপার থেকেই ভেসে আসছে। একদম ঈশান কোনেই গণপতিদের একতলা বাড়ি। বাড়ির ছাদের উপরে মস্ত বড় দুটো আমগাছ, বাড়িটাকে যেন আগলে রেখেছে, রোদ বৃষ্টি ঝড় কোনটাই কিছু মনে হয় নি কোনদিন, তাই নিশ্চিন্তেই দরজা-জানালা সব উদোম রেখেই বিছানায় গা-টা এলিয়ে দেওয়া। বৃষ্টির আমেজ সারা দিনের ক্লান্ত শরীরে আরও নিস্তেজ করে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।

বৃষ্টি তুমি কার?

যখন যার শরীর ভিজিয়ে দি, তার।

কত লোক, মুটে-মজুর, জোয়ান-বুড়ো, গরীব-গুরবো, চোর-বাটপার, রাজা-মহারাজা-সম্রাট, মালিক-কর্মচারী, মন্ত্রী-সান্ত্রী সবই তো একই সঙ্গে বৃষ্টির জলে ভেজে।

তাহলে তুমি কার?

এ-তো ভারি বিপদে ফেললে। এর উত্তর খুঁজতে তো আমার জন্মদাতার কাছে ছুটতে হবে।

বরুণ দেবতা।

দাঁড়ান দাঁড়ান। একটু কথা বলে নি।

আকাশের ভুবনে কি এস.টি.ডি. বুথ আছে, যে চাইলেই পাবে।

আরে আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন?

দেখুন, কেমন করে কল করি।

সত্যিই তো বৃষ্টিটা উবে গেল, কথার পালা সাঙ্গ হল, আকাশটা আবার ঘন কালো মেঘ হল। টেনে নিল কি আদরের কন্যাকে! বুকে জড়িয়ে হয়ত এতক্ষণে জিজ্ঞেস করে

ফেলছে, মা, তুই কেন আমাকে ছেড়ে চলে যাস ঐ বজ্জাত লোকগুলোর কাছে...। বৃষ্টি হয়ত অভিমান বশে কানে আঙুল দিয়ে বলে, এ কী বলছ জন্মদাত্রী, তুমি না পাঠালে আমি যেতে পারি! ওরা আমাকে এত করে ডাকে, কান্নাকাটি করে, কত যে মন্ত্র আওড়ায়.....। কত কবিতা করে, 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে।' 'বৃষ্টিরে তোর কোথায় বাস, আমার ঘর দেখে যাস।' ওরা আমাকে পেয়েই না তোমার কথা স্মরণ করে, বাপ মেয়েকে কে এমন করে স্মরণ করেছে জন্মদাতা।

তাতে কি মা, তুই যাস না, ঘর আমার বড় শুকনো শুকনো লাগে, বড্ড খাঁ খাঁ করে, আমি ভাবি মেয়েটা আমার কবে ফিরে আসবে, আবার এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে গুনগুনিয়ে গান ধরবে।

তাতে কি বাবা, সে-তো মাত্র তিন মাসেরই জন্য, তুমি তো সময় ফুরোবার আগে টেনে আনতে চাও।

তুই যে এতসব ভালো ভালো কথা বলছিস, জানিস, হুমকো হুতো, ন্যালাক্ষ্যাপা, চাঁদবদন, ধুরন্দর মানুষগুলোকে, সুযোগ পেলে গালমন্দ করে তোর চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করে ছাড়বে। তুই একটু বেশি সময়ের জন্য ভালোবেসে যাস দেখি, রাখবে ওরা। যত কারিকুরি করবে তোকে তাড়াবে বলে, তখন শুধু রাতদিন বসে বসে রোদের মন্ত্র আওড়াবে।

গণপতি তাহলে কান পেতে বৃষ্টি-বরুণ, কন্যা-পিতার সব কথা শুনে ফেলে।

কই বৃষ্টি তুমি বললে না তো, তুমি কার?

ঐ যা, বাবাকে এই কথাটাই জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি, অন্য কোনদিন না হয় তোমাকে এসে বলে যাব, আমাকে ভুল বোঝ না যেন!

তুমি নিজেকে এমন করে ঢেকে রেখেছ কেন?

একটু ছাতাটা সরাও, তোমার মুখটা আমি দেখি।

গণপতি আড়ালটা সরিয়ে নেয়, বৃষ্টি এসে ওকে ছুঁয়ে ফেলে ঝম-ঝমা-ঝম, এ কোন বৃষ্টি, পথ চলতে গেলে দু'পা আগলে ধরে, চোখ চাইতে গেলেই আঁধারের চাদর দু'পাশে ঝুলিয়ে দেয়, কোথায় খাল, কোথায় দিঘি, কোথায় ঘাস, কোথায় দূর্বা, কোথায় মাটি, কোথায় শীষ।

গণপতি চোখ মেলে দেখো, 'এই তো আমি'!

তোমরা এমন করে ঘিরে আছ কেন? আমাকে যেতে দাও। ঘরে আমার স্ত্রী-কন্যা-মা বারান্দায় এসে আঁধারের বুক চিরে চেয়ে আছে।

আমি কাকেই-বা বলছি, তোমার তো প্রেমই হয় নি এখনও।

হাসালে গণপতি হাসালে! এত মানুষের ভালোবাসার উষ্ণীষ যে মাথায় জড়িয়ে রয়েছে, তার আবার প্রেম লাগে নাকি।

লাগে, লাগে, তুমিও তো সে বন্ধনে জড়াও নি।

আমার বন্ধনে কোন জ্বালা নেই, মুক্ত বিহঙ্গের মতোই আমার নায়ক নায়িকারা ঘুরে বেড়ায়।

তাহলে তুমি কি উভয়কামী!

না।

তবে সমকামী!

তা-ও না। যখন যে যেভাবে আমাকে চায়, তার কাছে আমি সেভাবেই ধরা দিই।

তুমি বলতো আমি তোমাকে কীভাবে চাইছি।

তুমি এতক্ষণ প্রেমিকা হিসেবে কামনা করেছিলে, আমি সেই তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে।

কোথায় তুমি?

তুমি আমায় সত্যি দেখতে পাচ্ছ না, গণপতি! আমি কিন্তু তোমার ভালো করে দেখতে পাচ্ছি, এমন রূপবান, গুণবান, বড় মনের মানুষদের কেউ হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দেবে তুমি ভাবলে কী করে!

বৃষ্টি চলে যায়, অঝোরে কাঁদিয়ে চলে যায়; ধাক্কা মেরে চলে যায়, তিরস্কার করে চলে যায়, প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে চলে যায়, গণপতি টেরও পায় না।

গণপতি, আমি এখানে। আমি যে তোমাকে পেয়ে গেছি।

কেমন করে পেলে?

মনটাকে ঝাঁকিয়ে দেখ, দেখবে চোখ দিয়ে বেরুচ্ছে তোমার বৃষ্টির ধারা।

গণপতি সত্যিই কেঁদে ফেলে। কতগুলো ছায়া ওর ঘরের দোর আগলে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের সামনে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে দু'জোড়া বন্ধ চোখ, শরীর ছেড়ে ওরা এইমাত্র শূন্যে উঠেছে।

গণপতি'র চোখে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল. তা যে এখনও থামল না, সে যে দ্বিগুণ হ'ল। সে যখন চিৎকার করে বাড়ি কাঁপিয়ে বলে, 'মা, ওমা, তুমি কোথায়!'

সারাজীবন এত কথা বলে শেষে তুমিও বোবা হয়ে গেলে।

সাত

পাল্টে ফেলা জীবন দেখ

আলনায় ঝোলান জামা-প্যান্ট কখন যে ধুয়ে জল হয়ে গেল, ও এতবার করে চেয়ে থেকেও টের পেল না। শেষে জোর করে ঠেলে সারিয়ে সিঁড়িঘরে নিয়ে গেল। গিয়ে কি দেখল! জ্যান্ত বিষধর চুপটি করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, গণপতি ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, না সমস্ত লাঠি, বল্লম, শাবল দিয়ে দু'টুকরো করে ফেলবে বুঝে উঠতে পারল না।

বৃষ্টি বলল, আমায় দেখ, যেতে দে ওকে।

ওরে রে রাক্ষুসি, এই যদি তোর মনে ছিল, আমাকে নিয়ে যেতি সংসার উজাড় করে। এত শোক, শোকের ভার, থম মারা সারা বাড়ি। ফোটা ফোটা চোখের জলে বারান্দাটা ভিজে উঠলো, অপরাধের ভয়ে নত হয়ে বিদায় নিল বিষহরি।

পাল্টে যেতে লাগল গণপতি সেই রাত থেকেই, ও অনেকক্ষণ ভিজে বৃষ্টিতে নিজেকে ধুয়ে নিল, ধোয়া শরীর নিয়ে ডুব দিল জলের আঁধারে, কত বার যে এপার ওপার হ'ল সেও কি জানে! বিষধর খোলস পাল্টালো, রেখে গেল কাঁঠাল গাছের নিচে।

সবাই দেখল, গণপতি আর নেই।

সে কী তবে নিরুদ্দেশ! সময়টা তো পাল্টালো। পাল্টে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি পর্বের এটাই ছিল গণপতি'র শেষ মুহূর্ত।

কিন্তু এ যে আর এক মানুষ। সাদা শরীরে ধবধবে রং যেন রাঙতার মতোই মুড়িয়ে রয়েছে, চরণে এক অদ্ভুত পাদুকা, বৃষ্টির মতোই এক তুলতুলে নরম চাহনি, উজাড় করা শূন্যতায় ভরাট করে নিয়েছে তিল তিল করে..... কি চাই, কেন চাই, কেন সব, এসব কথা জিজ্ঞেস করলেই মজে যাওয়া নদীর সরু নালার মতোই ঝিরঝির করে ঝরিয়ে দেয় ফোঁটা ফোঁটা হাসি। কেউ যে প্রশ্ন নিয়ে আসবে, সে সুযোগ যেন আপনাতেই বন্ধ হয়ে যায়। নিজের রসে নিজেই মজলে এমনটা হয়।

বৈরাগ্য!

বৈরাগ্য জড়ায়ে মুক্তি খোঁজা, সে-তো কাজের কথা নয়। পথচলা কোথায় গিয়ে থামবে কেউ বলে দেবে না, মানুষ তো শরীর পাল্টায় না, পোশাকই পাল্টায়, পোশাকের অন্দরে গোপনে বেড়ে ওঠা, ছুঁতে না পারা, কল্পনার চাদরে মোড়ান কী একটা যেন শরীরকে বৃত্ত করে ঘুরতে থাকে, সে একসময় নিজের দেশে যাবে বলে ছটফট করে, যাবার বেলায় বলে এইভাবে আমাকে সাজিয়ে দাও, এই রঙে আমায় রাঙিয়ে দাও, আমি একটুখানি আমার করে পৃথিবীটাকে দেখি।

গণপতি চেয়ারে হেলতে দুলতে, কথার যাদু ছড়াতে ছড়াতে মানুষের মুক্তির গান গাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হচ্ছিল, ছুটে গিয়ে। স্নিগ্ধ শরীর এসে ভাঁজ খুলে দিয়ে বলেছিল— যাও এবার বাঁধনছাড়া বনের পাখি, এবার তুমি কল্পতরু সাজ। গণপতি ঘর ছেড়ে বাহিরে এসে বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে, রোমে রোমে নিরানন্দ ছেঁকে আনন্দের বান আনে।

বাচ্চা ছেলেটা ওর পাদুকা দুটো আলগা হতে দেখেছিল। মৃত্যু নদীর ঘনিষ্ঠতা ছেড়ে জীবন পথের পথিক সাজলে এই হয়।

কোথায় যাচ্ছ গো চরণদাদু?

বেশ নাম, সবাই শুনলো, মেয়েটাকে বাহবা দিল। সেই নাম শ্যামপুকুর, ঈশ্বরীতলা, গণিপুর, রায়দিঘির আকাশ ছাড়িয়ে চব্বিশ পরগণার বাতাস ভরাল।

চরণদাদু, আর দাঁড়িয়ে থাকে না। এক অসম বিক্রিয়ায় শরীরের রসায়নটা বুঝে নেয়। গণপতি উবে গেছে, বৃষ্টি তাকে পুরোপুরি ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে। এখন সে কি উদাস বাউল, ঘরে ঘরে একতারাতেই তার দিন যাওয়া, সাঁঝবলার মায়ায় ডানা মেলা, কত যে ডাক শোনা আর এই ডাক শোনাতেই ষোল আনা মজা, নামের কি যাদু—চরণদাদু।

আট

পথের নেশায় পথই খোঁজা

ঠক্ ঠক্ ঠকাস ঠকাস শব্দ। বিনা তারে যেন বীণা বাজে। চরণদাদু এক তোড়া কাগজ নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে, মাঝে মাঝেই ঘড়ির কাঁটায় টোকা দেয়।

উদয়ন কমার্শিয়াল কলেজ
বলরামপুর, ঈশ্বরীতলা

এখানে টাইপ ও কম্পিউটার অত্যন্ত যত্ন সহকারে দক্ষ ও পেশাদার অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া দেওয়া হয়।

গন্ধটা অনেকক্ষন ধরেই যেন ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অটো রীক্সা থেকে নামল জোড়ায়, জোড়ায়। হাসি হাসি মুখ করে উচ্ছলতায় ফেটে পড়ে ইটের রাস্তাটা সন্তর্পণে টপকে এসে যে যার মেশিন নিয়ে বসে। আঙুলের খেলা খেলে, এ. এস. ডি. এফ. জি., পি. কিউ. আর. এস. টি ....। তাল করা এই মুদ্রা চরণদাদুকে এক স্বপ্নের রাজ্যে নিয়ে চলে যায়। চরণদাদু নিজেও স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, অন্যদেরও স্বপ্ন দেখায়। ঐ যে পাঁচতলা বাড়িটা দেখছ, ওখানে রোজ এসে একটা অদ্ভুত পাখি বসে! ঘুরঘুর করে চারদিক চায়, আবার চলে যায়। ঐ যে স্বপ্নে দেখা পাখি, যার লম্বা লম্বা সোনালি ডানা, সামনের পা দুটো বেশ বড়, তুলনায় পেছনের পা দুটো ছোট, হলুদ লাল রঙ, কার অপেক্ষায় সে যেন আসে, আবার উড়ে চলে যায়।

তোমরা স্বপ্ন দেখতে জান?

জানি চরণদাদু।

তাহলে আজ থেকে সেই স্বপ্নের রাজ্যে হেঁটে বেড়াতে শিখে নাও। সেখানকার রাজা, পুত্র কন্যা, রানি সবাইকে চিনে নিয়ে তোমাদের আর্জি পেশ কর। তোমাদের রাজা তোমাদের স্বপ্নের বস্তুকে খুঁজে এনে দেবে।

ছেলেমেয়েগুলোর প্রশ্নের অন্ত নেই। নিরাপত্তাহীনতা আর অসহনীয় জীবনের দুঃসহ জ্বালা ওদের অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে ধরে। অক্ষরের যাদু চিনে নিয়ে ওরা গতির ঝড় ওঠায় — যদি একটা হিল্লে হয়।

কর্ণধার বনাম গাইড শশাঙ্ক'র কড়া নজর, পিঠে চাবুক মারার মতোই শ্যেনদৃষ্টিতে

ওদের ঝড়ের গতির দিকে নজর রাখেন, শুধু গতি নয়, নির্ভুল গতি, পরিচ্ছন্ন গতি, একাগ্রতা এসব মুলমন্ত্র নিয়ে এদের রক্তচক্ষু দেখিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেন, অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে ওরা। পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়লে অর্থাৎ শব্দ সংস্থাপনের খেলায় পিছিয়ে পড়লে বাতিল ঘোষণা করা হবে ভয়ে তটস্থ থাকে ওরা।

চরণদাদু তার নির্দিষ্ট টুলটায় এসে বসে।

কিরে হাতে ওটা কি?

'অল ইন্ডিয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্যাজেট'।

সঞ্জয় কী দেখা হচ্ছে?

'এমপ্লয়মেন্ট নিউজ'।

চরণদাদু মস্কারা করে বলে, ' রাতদিন এসব মুখস্ত করছিস বুঝি।

কি করব চরণদাদু, এ-ছাড়া না করেই বা কি করব, বাবার চাকরীর মেয়াদ আর ছ'মাস। চিন্তায় মুখ ভার করে থাকে। লোকজনকে বলে বেড়ায় — ছেলেটা এখনও কিছু করে উঠতে পারল না। আজ মা'ও দু' চার কথা শুনিয়ে দিল — ভালো করে চেষ্টা কর খোকা, তোর বাবা আর কদ্দিন!

ঠিকই তো বলেছে তোর মা।

দেখছেন তো সকাল বিকাল দু'বেলা প্র্যাক্‌টিস করি। শর্টহ্যান্ডটা শিখলে চাকরি পাওয়া যায়, কিন্তু ইংরাজীতে অষ্টরম্ভা, কোন কঠিন বাক্য পেলে চৌদ্দবার চিন্তা করতে হয়।

স্টেট্‌সম্যানটা রোজ পড়লেই তো পারিস, শব্দ আর বাক্য গঠনের ক্ষমতা বাড়বে।

হয়না চরণদাদু, সারাজীবন বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়ে এখন চোখা চোখা ইংরেজী শব্দ দেখলে মাথা ঘুরে যায়।

চরণদাদু সঞ্জয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

ঠিক আছে, তুই সপ্তাহে দু দিন আমার কাছে আসিস, আমি তোকে ইংরেজী শিখিয়ে দেব।

সঞ্জয় ভাবে, সংসারে এরকম মানুষগুলো কেন থাকে; এরা কারও কারও জীবনে ধূমকেতুর মতো আসে, আবার মিলিয়েও যায়।

ওদের গতির পরীক্ষা চলতেই থাকে। কমপিউটার আলটপকাই ঢুকে পড়ে এই গতির ভুবনে। চরণদাদু'র আসা-যাওয়ার রোজনামচায় চলে সময়ের সঙ্গে যুঝে নেওয়ার পালা।

চরণদাদুর মাথার উপর বন বন করে পাখাটা ঘুরতেই থাকে, লাঠিটা একপাশে সযত্নে সরিয়ে রেখে হাতে জড়ানো পুটলিটা খোলে। ঘর থেকে বেরোবার সময় ঠিকই করেছিল, আজ আজিজুল-এর কাজটাকে ও অনেকটাই এগিয়ে রাখবে। কাকে বলা যায়! হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট'-এ আর্জিটা করা মনস্থ করে। একটা নির্দোষ ব্যক্তির

অনবরত মানসিক যন্ত্রণার স্বীকার হওয়া, এও তো এক ধরনের ধর্ষণ!

চরণদাদু, তুমি আজ কার হয়ে লড়ছ!

ওঃ হাসালি, আমি আবার কবে লড়ালড়ি করলুম। আজিজুলকে কালই চরণদাদু একটা ইন্টারভিউ করেছিল খানিকটা সাংবাদিকের ঢঙে। খানিকটা সত্যানুসন্ধানীর ভূমিকায়, আজিজুল রাজিও হয়েছিল।

কাকে তোমার সন্দেহ হয়?

এখনও নির্দিষ্ট করে কাউকে সন্দেহের তালিকায় রাখছি না। তবে তারা এমন লোকজন যারা স্কুলের ভালো চায় না।

তাহলে ওরা তোমাকে আক্রমণ করবে কেন?

তার দুটো কারণ হতে পারে। এক, ওরা বদনাম ছড়িয়ে আমার ক্রমবর্ধমান খ্যাতিতে রাশ টেনে ধরবে। দুই, ওরা কোনও ভাবে মেয়েদের শ্লীলতাহানীর কথা তুলে স্কুলের ক্ষতি করবে। আর একটা ক্ষীণ কারণ ভাবলে ভুল হবে না, হতে পারে কোন পারিবারিক বিবাদের জের।

আজিজুল, তোমার কি এর জন্য কোন অনুশোচনা হচ্ছে?

অনুশোচনা কেন? গোটা ব্যাপারটাই যখন কারও পূর্বপরিকল্পিত, তখন এ নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই।

ভেবে দেখ কোন অসতর্ক মুহূর্তে।

চরণদাদু, শেষে আপনিও ....।

আরে না, আমি ঘটনার যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

এবার বল তো, গত একমাস ধরে কারা কারা তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশেছিল।

চরণদাদুর এই ধরনের গোয়েন্দাগিরি এখন সর্বজনবিদিত। সকলে জানে, কোন বিষয় নিয়ে একবার লেগে যদি পড়ে, কেউ তার থেকে রেহাই পাবে না।

কিন্তু ওর পোশাক নিয়ে নানা মুণির নানা কথা।

আরে এগুলি সব ভড়ং, নিজেকে আলাদা একটা ভেন্ন জাতের মানুষ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা।

'ঠিক তাই', চরণদাদু এই বলেই মাথা নাড়ে। সত্যি কথাটা মানুষের মনের গহনে কুহু কুহু শব্দ করে বসন্তের কোকিলের মতো জানান দেয়।

হ্যাঁ দু'একজন মানুষ আমার ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছিল, আমল দিই নি। কি করে আমল দেব বলুন তো, কেনই-বা দেব। স্কুলের মেয়েদের মূল ফটকের কাছেই উল্টো দিকে লাইসেন্স পেয়ে মদের দোকান করেছে রুহিতন মল্লিক।

রুহিতন মল্লিক রেগে মেগে বলেছিল — এটা কি বাংলা মদের দোকান হচ্ছে, রীতিমত বিলিতি মদের দোকান।

আপনি কি বলতে চাইছেন বিলিতি মদে নেশা হয় না, এলাকার যুবক ছেলেদের মাথা চিবিয়ে খাবে না! রুহিতন মল্লিক এক-পা পিছিয়ে গিয়ে মোক্ষম কথা বলেছিল, 'একটু আধটু মদ না হয় খেলই, তাহলে দোষের কী!'

আজিজুল জানে এই মদের দোকানের পাশেই গজিয়ে উঠবে অন্য আরও অনেক কিছু, তখন রুহিতন মল্লিকদের টিকিটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এরা যখনই বিপদ বোঝে, তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালায়, তার আগেই যত হম্বিতম্বি।

আচ্ছা আপনিই বলেন, মদের দোকানের প্রতি আপনার এত রোষ কেন, সরকার তো ঢালাও লাইসেন্স দিচ্ছে, এখন তো লুকিয়ে গলিঘুঁজিতে মদ বিক্রি করার রেওয়াজ নেই, তা আপনার আর মাথাব্যথা কেন? সরকারের ঘরে এখন রেভিনিউ আসছে। আপনি কি ন্যাকা সাজছেন? সারা কলকাতা শহর জুড়ে যা কাণ্ড কারখানা হচ্ছে, টের পাচ্ছেন না।

না, পাচ্ছি না, পেতে চাইছি না। এ নিয়ে আমার অত মাথা ব্যথা নেই, আমি ব্যবসায়ী মশাই, ব্যবসা বুঝি, অত সতিপনা আমার ধাতে সয় না। ব্যবসা বাড়াতে গেলে অত সমাজ টমাজ নিয়ে ভাবলে চলে না।

তবে আপনাদের ভাবনার বিষয়টা কী শুধু পুঁজি আর মুনাফা! শুধু মদ বিক্রি করে আপনারা খুশি তো হবেন না, আপনাদের তো আরও কিছু চাই, মাতাল বানাবার লাইসেন্স তো সরকার দেয় নি, মদের হাত ধরে এসবও তো আসছে, ঢুকছে পাড়ায় পাড়ায়।

আপনি কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন আজিজুল স্যার, এবার কিন্তু আমি আর সম্মান দিয়ে কথা বলতে পারব না।

চরণদাদু, এসব গল্প শুনে থ বনে গেল।

তাহলে তো ব্যাপারটা নিয়ে লেগে পড়তে হয়, দেখলেন তো আঁতে ঘা লাগতেই এতগুলো কথা বেরল।

এ আর এমন কি কথা বেরল। বললে তো অনেক কথাই বলতে হয়। রাজ্য শুদ্ধ লোকের কথা বলে সবাই দেখেন না, নিজেকে কেমন ধন্য ধন্য মনে করে, আমি না হয় এরকমই হলাম কিছু।

তোমার কথা পুরোপুরি ঠিক, লোকজন এখন আর মুখ তুলে চাইছে না, মুখ ঘুরিয়ে চাইছে, কখনও বলে আসুন বসুন, চেয়ারটি টেনে দিই। কখনও বলে, কেন এসেছেন অসময়ে, পাছা ঠেকিয়ে তো লাভ হবে না।

যাক গে যে কথা হচ্ছিল। তাহলে এ ঘটনার পেছনে তোমার ভাবনা অনুযায়ী আরও একটা কারণ কাজ করছে।

আচ্ছা, ঐ মেয়েটি তাহলে দাবার চালের বোড়ে।

না, তা নয়, সময় সুযোগ বুঝে নৌকা হয়ে যেতে পারে, যাতে চড়ে বৈতরণী পার হওয়া যাবে।

মেয়েটি কিন্তু টু শব্দটি করে নি, আসলে ওকে প্রশ্ন করার কেউ প্রয়োজনও বোধ করে নি। তোমাকে নিয়ে পড়েছে কিনা?

তুমি মেয়েটাকে কোন প্রশ্ন করেছ?

না, সে সুযোগ আমার হয় নি, আর মুখোমুখি হলেও বলত, 'স্যার, সত্যি কি আপনি জানেন, এই নিয়ে আমার অত মাথাব্যথা নেই, কিন্তু যারা আমাকে জড়িয়ে দুর্নাম ছড়াচ্ছে তাদেরই আগে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসা করা উচিত।' আমি যদি প্রশ্ন করতুম, 'তোমার মা-বাবা বেজায় খাপ্পা হয়ে আছে?'

তাতে কি! এ দুনিয়ায় কত কিছুই তো ঘটে যায়, কোন ব্যাখ্যা চলে না, তবে ব্যাখ্যা দিচ্ছে হিঁদুর মেয়ে।'

মেয়েটি যে দিকটা বার বার ইঙ্গিত করছে – 'ঐ শুঁড়িখানা আর তার গোপন বেশ্যাখানা।'

'তোমারও কি ধারনা, এরকম কিছু একটা!'

মেয়েটি আঁতকে উঠে বলত 'রুহিতন মল্লিক বাবার কাছে আসতে পারে, কিন্তু এতদূর সাহস পাবে কী করে!'

চরণদাদু ঘটনার পরম্পরা খোঁজার চেষ্টা করছে -- আজিজুল, রুহিতন মল্লিক আর ঐ মেয়েটা ছাড়া আর কোন চতুর্থ কোন ঘুঘু লোকের হাত ....।

নয়

পথের আবার অনেক বাঁক

ভারতবর্ষে কত নারী পাচার হয়! নারী পাচারের দোকান বসেছে যেন। চরণদাদু ঠক ঠক আওয়াজ করে পা চালিয়ে আসে। পথে কাউকে দেখা হলে জিজ্ঞেস করে, 'বনানীদের বাড়ি চেন?'

কেন চরণদাদু? দোকানদার উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করে, বনানীকে তোমার কি প্রয়োজন?

আছে, প্রয়োজন আছে।

আসলে মেলামেশার বহরে সকলে বুঝে গেছে, চরণদাদু ওদের মতো একজন ছাপোষা মানুষ, যার কোন ঠমক গমক নেই, যিনি নিজেও বোঝেন না তিনি ঠিক কোন দলে, পূর্ব পরিচয়ের আদলটাকে তাই সহজে গলা টিপে মারতে পেরেছেন। আখেরে লাভই হয়েছে চরণদাদুর, মানুষকে বুকে টেনে নিতে তাই এতটুকু কষ্ট হয় নি তার।

চরণদাদু কোন কিছু গায়ে না মেখেই আবার ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করে। বৃষ্টির জলটা এখনও গোড়ালি ভরে উঁকি মারছে। দু'একটা ছেলে অদ্ভুত মানুষটাকে টান টান হয়ে দেখে। চরণদাদু ছাতাটাকে বগলে নিয়ে আবার কাগজের তোড়াটা ডান হাতে নাড়তে নাড়তে বাঁ হাত দিয়ে গামছাটা কাঁধে ফেলে সামলে সুমলে নেয়।

ও চরণদাদু, চরণদাদু, তোমার বউ নেই বুঝি।

নারে, সেই কবে ....

এক সময় এখানে মস্ত বড়ো এক আমগাছ ছিলো। ঝড় তুফানের তাণ্ডবে গাছটার দফা-রফা হয়েছে। সেটাই যে যার মতো সাবাড় করে দিয়েছে। টুকরো টাকরা এখনও পড়ে আছে, সে তো বাপের ভাগ্যি. না হয় যা দিনকাল পড়েছে রাস্তায় কুটোটি পড়ে থাকতে দেয়! কালই তো মুনিম এসে এক প্রস্ত গালাগাল দিয়ে গেছে — শালাদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, খালি কোন কিছু দেখলেই হলো, হাতানোর তালে থাকে। কোথায় যে কার টিকি বাঁধা আছে, আল্লাই জানে। অত কথা বললে হয় খালি, ফাঁকিবাজ।

কেন মুনিম? মানুষের উপর মানুষের বিশ্বাস না থাকলে জগৎ সংসার চলবে কেন! কথাটা তখনই অল্প বিস্তর উঠে এসেছিল। মেয়ে ছাওয়ালদের নিয়ে এতসব নচ্ছার কাণ্ডকারখানার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ হওয়া দরকার। হাটে হাঁড়ি না ভাঙলে জাতকুল কোনটাই যে বাঁচে না।

বসন্ত কথার মাঝখানে ঢুকে পড়ে নিজেকে জাহির করতে ছাড়ে না। আরে বাপু বড়ো বড়ো বুকনি ছেড়ো না, মেয়েদের সম্মানের কথা বলছ! কি সম্মানটা মেয়েদের দাও। কত ভাবেই তো মেয়েরা আলাদা প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, ওদের ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলো অন্দরমহলে রেখে টুটি চেপে ধরেছ। ওরা হাঁসফাস করছে।

তোমার জাতেই-বা মেয়েদের কী স্বাধীনতাটা আছে! তাহলে অত বউ পোড়ায় কেন? আর বউরা এত গলায়-বা দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ে কেন?

বসন্ত আর তর্ক না বাড়িয়ে কথার মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়। সে না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু তফাৎটা এই, একটা হ'ল অনুশাসন,,আর একটা হ'ল একজন মানুষের হঠকারিতা। দুটো দু'ধরনের নির্যাতন।

বসন্ত আর মুনিম দ'জনেই মেনে নিল এই চলতি অবস্থাটা মোটেই গর্ব করার মতো কিছু নয়।

এই আজিজুল মাস্টার-এর কথাই ধর, হিন্দু মেয়েদের দিকে হাত বাড়াল। এটা কি ভালো করল।

চরণদাদু গম্ভীর হয়ে চোখ বড় বড় করে দলটার দিকে তাকিয়ে রাগত স্বরে বলল, সহজ কথা সহজ করে বলা ভাল, অত সহজে কোন মানুষের সম্মান নিয়ে টানাটানি করো না।

কি হল চরণদাদু রেগে যাচ্ছ কেন? নাও, গরম গরম চা খাও, রাগটা গলে জল হয়ে যাবে।

দোকানের পেছনের থেকে টুং টাং শব্দ হয়। কে যেন ভেতর থেকে বলে, যাঃ পালা এখন, অনেক আড্ডা হয়েছে, এবার মানে মানে কেটে পড়। ধীরেন একটু নরম সুরে কথাটা বললেও একটু শ্লেষ ছিল।

চরণদাদু গামছাটা কাঁধে ফেলে উঠে দাঁড়ায়। দু'চার জন ঈশ্বরীতলার থেকে হবে, আমের ওজন নিয়ে কথা কাটাকাটি করে গায়েও হাত তুলে দেয় এবং এমন সব বিচ্ছিরি আওয়াজ করে, কানে আঙুল দেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। ওদের বলার কথা থামেই না – হারামের পয়সা তো, এমনি করে ওজন কম দিয়ে ঠকাস, এর চেয়ে ভালো, ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক, দু' পয়সা জুটে যাবে, চুরি জোচ্চুরি করে লোক ঠকাস কেন?

তোর বাবার কি? তোর পছন্দ হয় নে, না হলে রাস্তা দেখ।

কেন তোর শ্বশুরের রাস্তা যে তোর কথা শুনতে হবে।

দেখ শ্বশুর নিয়ে কথা বলবি না।

কেন খুব গায়ে লেগেছে বুঝি। এমন হীরের টুকরো জামাই জুটবে কেমন করে!

চরণদাদু চলে যেতে ও কানে আঙুল দেয়, ওপাশ থেকে একটা ভ্যান গাড়ি মাইক বাজিয়ে কানের পর্দা ফাটিয়ে ভাষণ মেরে চলে – জোর খবর, জোর খবর, কাল মহেশপুর এর মাঠে লটারি খেলার আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম পুরস্কার – স্যামসুং টি. ভি., দ্বিতীয় পুরস্কার ডি. ভি. ডি., তৃতীয় পুরস্কার – আগফা ক্যামেরা, এছাড়াও রয়েছে অনেক সান্ত্বনা পুরস্কার। জলদি আসুন, আর একটি দুটি করে টিকিট সংগ্রহ করুন, টিকিট মূল্য – পাঁচ টাকা। এ সুযোগ হেলায় হারাবেন না, সুবর্ণ সুযোগ, সুবর্ণ সুযোগ। দশ বারোটা হাফ প্যান্ট পরা ছেলে উদোম গায়ে যেদিকেই ভ্যানগাড়ি যাচ্ছে, সেদিকেই ছুটছে, এতেই যেন প্রাণ খোলা আনন্দ। ওরা টিকিটও কাটছে না, লটারিও নিয়ে মাথা ঘামায় না, ছোটাতেই যেন ওদের মজা, হয়ত এই আনন্দ আর মজাটুকুনি নিয়েই দিনের শেষে ওদের ঘরে ফেরা। আবার শব্দগুলো যেন ওরা ভাসিয়ে দিয়েছে বাতাসে -- আসুন, আসুন, জলদি করুন, জনগনের সেবা করার এমন সুযোগ হাতছাড়া করবেন না, এই লটারি থেকে পাওনা টাকা ক্যান্সার আর এড্‌স এর মতো দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের সাহায্যার্থে ব্যায় করা হবে, আপনাদের একান্ত সহযোগিতা প্রার্থনীয়। ওরা লিফলেটও ছড়িয়ে দিচ্ছে হাতে হাতে।

লোকগুলো বলে কিরে!

সব ভাঁওতাবাজি, ভাগাভাগি করে খাবে। এসব মালদের আমি চিনি। এদের অন্য ধান্দা আছে, টাকাপয়সার হিসেবপত্র কেই আর দেখতে চায়। জনগনের টাকা ঐসব ধান্দাবাজদের পকেটে ঢোকে।

এই জন্যই তো এ-দেশের কিছু হ'ল না।

চরণদাদু দেশের কথা বলাতে একটু ছোট্ট করে হাই তুলেলো। সবকিছুতে দেশের উচ্ছন্নে যাওয়ার এমন উক্তি ওকে খানিকটা চিন্তিত করে তোলে। দেশের প্রতি অবিশ্বাসের এই দায় ওদের কোথায় নিয়ে ফেলবে! কি মনে হতে মোড়ান কাগজের মোড়ক থেকে দু' একটা সাদা কাগজ টেনে দু' টুকরো করে। ডট্ পেনের খোঁচায় শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে মনের কথাগুলো লিখে ফেলে আর কাটে। ইংরেজি থেকে অনুবাদ করলে চিঠিটা অনেকটা এরকম।

মাননীয় রাষ্ট্রপতি,

প্রশ্নগুলো টুকরো টুকরো। দেশভক্তি নিয়ে দু'চার কথা, দেশের নগন্য এক নাগরিকের অতি তুচ্ছ প্রতিবেদন ....। লিখতে গিয়ে না জানি কত কথা বলার ইচ্ছে হয়, হতাশা! অনীহা! মানুষের এই অবিশ্বাসের মূল ধরে নাড়া দিলে, গাছটা একটু সজীব হবে। ওদের অন্তরের গহনে ছিঁড়ে যাওয়া সুতোটা জোড়া লাগবে। এ-দেশের নাগকিরকে আপনার-ত অজানা নয়। হ্যাঁ, প্রথম পুরুষ কাঁচা রাস্তার মাটি মাড়িয়ে, হাঁটু জলে, কোমরে গামছা বেঁধে জলা পার হওয়া থেকে মুক্তির ঘ্রাণ নিচ্ছে, ওদের গায়ে এখনও মেঠো গন্ধ, কেতাদুরস্ত পোষাক ফুঁড়ে কত যে বিচিত্র গন্ধ এসে ধরা দেয়, ওদের কোন জাত বেজাত নেই, ওরা আসছে, কিন্তু সময় ওদের একটু একটু করে নানা কথা বলিয়ে নিচ্ছে, একটু অন্যরকমভাবে ওদের দিকে তাকালে ধন্য হয়। যত জটিলতা, ওরা না পাওয়ার নিরানন্দে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এ-কোন থেকে ও-কোন। ওরা কথা বলে, আবার বলেও না। ওরা গুটি গুটি পায়ে চলে, ওরা দৌড়য়, গাড়ি ওদের ধাক্কা মেরে পেছনে ফেলে দেয় -- ওরা বৈদ্যুতিক আলো গায়ে মাখে বটে, আলো ওদের ছোঁয় না। ওদের এত অসহিষ্ণুতা, এত আক্ষেপ, এত ক্রোধ, এত অপমান বঞ্চনা আর অবহেলা, যুক্ত হয়ে বিযুক্তির খেলা খেলে। এক বৃহত্তর ভারতবাসীর জন্ম হচ্ছে এভাবেই! এদের কথা জানাতে গিয়ে চোখের জল এখনও শুকিয়ে যায় ....।

ধন্যবাদান্তে,

আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন

জনৈক নাগরিক

চরণদাদুর ভাবনার ঢেউ-এ ওরা সাঁতার কাটতে পারে না। হুড়মুড় করে প্লাবনের মতো দলে দলে লোক বাস থেকে প্রবল ধাক্কায় নামলে সামনের বারান্দায় শুয়োরগুলো লজ্জায় চোখ বুঁজে ফেলে। লুঙ্গিটার গোছ আলগা হলে শক্ত করে বাঁধা হয়, পাজামার দড়ি আলগা হলে গিঁট মেরে দেয়, অস্বস্তি বাড়িয়ে একদল অন্য দলকে গালমন্দ করে। সামনের পিচ রাস্তার উল্টোদিকে ক্যামিক্যাল কারখানার ধোঁয়া গলগল করে ওঠে। ওরা ওখানেই লম্বা-চওড়া গেইটের ফাঁক দিয়ে লাইন করে ঢুকে যায়, রাস্তাটা শূন্য হয়,

গেইটটা কোন যাদুবলে পরস্পর জোড়া লাগে।

রাস্তার ওপাশে ক্লাবঘরে বাখারি দিয়ে যে মাচান তৈরি হয়েছে, জমায়েত হয়েছে অনেকে, শিল্পবিমুখতা আর শিল্পায়ন বনাম বন্ধ কলকারখানা নিয়ে নরম গরম বক্তৃতা হচ্ছে সেখানে। ঐ লোকগুলো গেইটের ওপারে গিয়ে ওদের ভাগ্যকে ঈর্ষা করে – শালা, আমাদের দ্বারা আর কিছু হবে না, বেকার হয়ে গেল জীবনটা, চল দেখি, ঐ কোম্পানির গেইটে গিয়ে বাওয়াল করি।

দেশের নাগরিক হয়ে কলা চুষতে বসে আছি!

বাউলটা হাতে একতারা নিয়ে ঘোরে, কি জানি অরজিনাল কিনা। গান ধরে জম্পেশ --- পিরিতি কাঁঠালের আঠা, লাগলে পরে ছাড়ে না ....।

ধরো না ভাই আর একটা জমাটিয়া গান, দিল খুলকে গাও। পকেট ফুটো, তোর দোকানের সামনে যখন ভুলো ভাই, তুই প্রোগ্রামটা স্পনসর করে দে বাপ।

ঠিক এই সময় সাইকেল সারানোর দোকানে টায়ার বার্স্ট করলো। ওই দেখ, কপাল ফুটো হলে টায়ারও বার্স্ট হয়। খেলার রিলে হচ্ছে, হুতোমপ্যাঁচা সাইকেল মিস্তিরি'র আর অত খেয়াল আছে। ধুত্তরি তোর ক্রিকেটের নিকুচি করেছে। সৌরভের পরে এখনও পর্যন্ত কেউ সেটই হতে পারল না। কালে ভদ্রে হয়ে যায় আর কি, গোটা জাতটা আর জাগল কবে। চিমটি কাটা জাত।

কেনরে আবার জাত তুলে কথা বলছিস!

গায়ে ফোসকা পড়েছে, জাতের জন্য কি দরদ রে।

হবে না, তিন তিনটে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে।

ঐ আনন্দেই থাক চাঁদবদন।

ভালো কাজের প্রশংসা আর কবে করতে শিখবি জীবনে! কিচ্ছু হ'ল না এই জন্যই।

আরে কি হ'ল রে! গোলমাল শুনতে পাচ্ছি।

বিষ্টুদার মেয়েকে ঈশ্বরীতলার কালুমস্তান ছিঁড়ছে।

কি করা যায় বলতো, মেয়েটা শেষে কালুর বিষ নজরে পড়ল আমরা থাকতে।

চল দেখি বাপ, একবার দেখে আসি গে।

কালু মস্তান তো কি হয়েছে, আমরা কি কিছু কমতি আছি; বেপাড়ার ছেলে এসে আমাদের পাড়ার মেয়ের গায়ে হাত দেবে এ-ও সহ্যি হয়। যা হবে বে, একবার মেপে তো নি।

কিন্তু বাপ, কালুর কাছে কিন্তু মেশিন আছে, রকচটা ছেলে, মাথা গরম হলে কিন্তু স্যাটাস্যাট চালিয়ে দেবে।

এই যে মস্তানের ছেলে মস্তান, এত সাহস, বেপাড়ায় এসে বাওয়াল, তাও বিষ্টুদার মেয়ের ইজ্জত নিয়ে লোফালুফি। তোমার গায়ের চামড়া খুলে আজ ডুগডুগি বাজাব।

ডুগডুগি বাজিও না বাপ, এই খানেই তড়পানি থামাও।

চরণদাদু, আপনি কোথা থেকে ধূমকেতুর মতো হঠাৎ হঠাৎ আসেন আর সকল কাজে বাগড়া মারেন, এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না।

কি ঠিক হচ্ছে না!

মেয়েটার এইভাবে ইজ্জত লুটে নেওয়ার চেষ্টা! অথচ কেউ কোন রা কাটল না, খালি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে।

ছেলেগুলোর দিকে হত বাড়িয়ে বলে – এই না হলে বাপের বেটা, কালু'র মতো জাত মস্তানকে জব্দ করলো।

জনতার মধ্যে দু'-একজন বলে উঠল – গুরু হাত মেলাও।

কালু মস্তান মুচকি হাসছে।

কি গুরু কেইসটা কি?

এক গ্লাস জল গড়গড় করে গলায় ঢেলে পথ খোঁজার চেষ্টা করে – কী মনে হয়?

গট্ আপ।

আরে ঐ মেয়েটা !

মেয়েটা অরজিনাল।

উদ্দেশ্য মহৎ। মস্তানের গুরু হিসেবে দলে স্বীকৃতি পাওয়া, না হলে পাড়ার লোকদের চমকাবে কেমন করে!

আরিববাস, ক্যায়া ব্রেইন, গুরু পায়ের ধুলো দাও।

চরণদাদু কেমন বুঝছেন। লিখে ফেলুন আর কি।

কি লিখব বল-তো! লেখার কিছু নেই, বিস্ময় আর বেজার হওয়া ছাড়া গতি কী।

গতি ছাড়া খ্যাতি আসবে কি করে! খ্যাতির জন্যই তো খ্যাতিমান।

বাইকের শব্দ এসে গড়গড় আওয়াজ করলে ওদের কথার বাঁধনটা ভাঙতে থাকে। চরণদাদু বিস্ময় বালকের মতো ওদেরকে পথচলার গল্প শোনাতে গিয়ে ক্ষান্ত হয়।

কালু মস্তান এসে ধমক মারে – বড্ড বেশি ওদের মতো ছেনালি করো না তো, বত্রিশ পাটি দাঁত উপড়ে দোবো।

কষ্টে বুকটা চেপে ধরে চোঁ চোঁ করতে থাকে, মনের মধ্যে একটা ভাবনা ঘুরে ফিরে মরে – আমি চরণদাদু, আমাকে ঘাবড়ালে চলে। চরণদাদু হঠাৎই তৈরি হওয়া ঝিমুনিটা ঝেড়ে ফেলে ডুব দেয়, ডুব দেওয়ার মধ্যে একটা আশ্বস্থ হওয়ার ভাব ফুটে ওঠে।

না, আজ আর দেরি করলে চলবে না, আজিজুলকে নিয়ে বসতে হবে, মাথাটা আগুপিছু দোলালেও আজিজুলের ভাবনাটা ওর ভেতর থেকে রং ছড়াতে থাকে।

এটা কি বয়সের দোষ!

নয়ন যে, তুমি কতক্ষণ। ....

আরে ভাবছ কি, বয়সের এমনই যাদু তোমাকে দিয়ে এমন সব কাজ করিয়ে নেবে, তুমি ভাববে, এ আবার কি করলুম! বালিগুলো ঝুর ঝুর করে গায়ে এসে পড়ে। সরু মিহি দানার বালি, সোনালি রং, পাণ্ডুয়ার বালি হবে। একটু কাছাকাছিই সিমেন্টের বিজ্ঞাপণ, এ. সি. সি. সিমেন্টের ডিলার, অদ্ভুত মেলবন্ধন, লরিটা এসে থামতেই ডালাটা মেলে ধরল, দু'একটা ছেলে এসে দৌড়ে দুই দিকে আটকে থাকা লকগুলো গুঁজে রেখে দেয়। লোকজন এসে এরে মধ্যে তিতিবিরক্ত করে ফেলে — লক্ষণ কেজি খানেক সিমেন্ট কম পড়ে গেছে, একটা ছেঁড়া বস্তায় প্যাক করে দিস কিন্তু। লক্ষ্মণ মাথা নেড়ে সায় দেয়। জয়দীপ কথা দিয়ে কথা রাখার অভ্যাসটা তৈরি করে।

চরণদাদু ভাবে জীবনটা সিমেন্ট বালি জোড়া লাগাবার মতোই খাপে খাপে লাগলেই ছক্কা, না হলে ফক্কা। বাবু মধুসূদন দাস এসে জোর দেখিয়ে তাড়াতাড়ি সিমেন্টের বস্তাগুলো তুলে দিতে বলে। দোকানের মালিক তো। এ বাঁধন যেন লাফার্জ সিমেন্ট জোড়া, মালিকের ধমকধামক যেন জলভাত।

জয়দীপ ওটাকে গায়ে মেখে নেয়, ফোঁস করে ওঠে — এত মুখের ঝামটা সইতে পারব না, রইলো তোমার চাকরি, এমন চাকরির কাঁথায় আগুন।

নয়ন ভাবে, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার ভঙ্গিমায় চরণদাদু একটু একটু পা চটকায়।

চশমখোর লোকটা গোরু ছাগলের মতো লোকজনকে ঘাটায়। জয়দীপ আর না হেসে থাকতে পারে না, লক্ষণের মাথা গোঁফ যেন সিমেন্টের পুকুরে স্নান করে লেপটে আছে। কে কাউকে ধরতে চাইলেও সময় মিলছে না।

আরে ঈশ্বরীতলার ঐ মেয়েটি না, কালু মস্তান খাবলে খেতে চেয়েছিলো।

এই মেয়েটা শোন, ব্যাপারটা কি!

মেয়েটা দু' চোখ ফুলিয়ে ফোঁপাতে থাকে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে দু' চারটে শব্দ বেরিয়ে আসে — লম্পট ঐ কালু মস্তান ঈশ্বরীতলার ঐ মেয়েদের টিকতে দেয় না, এর কাছে মেয়ে নিয়ে খেলা তো জলভাত।

চরণদাদু'র বিশ্বে যেন অত্যাচারিতের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। এরই ফাঁকে ছেলেপিলের ঝুপঝুপ শব্দে দিঘির জলের ঢেউটা নাচতে নাচতে যেন কোথায় চলে আসে, ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়াটা শিরশিরিয়ে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মাথা পর্যন্ত চাড়িয়ে যায়।

নয়ন বড় মুখ করে জিজ্ঞেস করে, 'তবে চরণদাদু বাকি হালচাল কী!'

এই আছি, এই নেই। ঐ দেখছো ভোঁ করে প্লেনটা কেমন গোত্তা মেরে বনবন করে ঘুরে কোথায় মেঘের ফাঁকে মিলিয়ে যাচ্ছে। কত যে হাইজাম্প, লংজাম্প দিচ্ছি, কোন তল খুঁজে পাচ্ছি নে।

কেন তোমার আবার ভাবনা কী?

চাল নেই, চুলো নেই, খালি কলম-কাগজের টুকরো টাকরা, কত নিবি নে, লোম

ছিঁড়বে, আজিজুলকে নিয়ে একটুখানি ভাব চরণদাদু।

মেঘটা জমাট বেঁধেছে বটে, তীরের মতো ছুটছে, ঝিলিকও খেলছে ঐ কারখানার দেওয়ালে, চরণদাদু কথার পিঠে কথাই ভাঁজতে থাকে, বনানীকে কোথাও ধরে ফেলতে পারে কিনা।

আজিজুল, ও আজিজুল থামিস না বাপ, লড়াইটা চালিয়ে যা।

দশ

মনের কথা মনেই থাক

চরণদাদু ঈশ্বরীতলা, মহেশপুর, গণিপুর, কেটোপোল, রায়দিঘিকে ধরতে চায় গোটা দুনিয়াকে একসাথ করে! এটাই তো বিপত্তি মনে হয়, পৃথিবীটা হাতের মুঠোয় এসেও ছটফট করছে। মনের কাছে শরীর দামি, না শরীর ছাপিয়ে এক লিকলিকে সাপ খেলে বেড়ায় কোনা ঘুপচিতে। চরণদাদুর জন্মান্তর হওয়ার পর দোলনায় দোল খেতে মন সায় দেয় নি। গড়াগড়ি খেয়েছে ধূলোয়, কি জানি মাটির কণা গায়ে মেখে নিলেই মনে হয় সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এসে পায়ের কাছে লুটোপুটি খাচ্ছে।

চরণদাদু তুমি কাঁদ কেন?

শরীর জেগে ওঠে ভাই, পোষ মানাতে গিয়ে কত ঘাম ঝরে তাই, রক্ত টগবগিয়ে ছোটে, শরীর খোঁজে।

চরণদাদু, এত ঘাবড়াচ্ছ কেন! এটাই তো আসল কথা, শরীরের যন্ত্রণা তো শরীর দিয়ে হজম করতে হবে।

এই তো ভারি বিপদ! কত যে বোঝাই, এমন করে জাগিস না বাবা, লিকলিকে সাপটা কি পোষ মানতে চায়! বলে তুমি ঘুমোও, জেগে আমি, চৌকিদার পাহারা দেবে না, ঘরের মালিক জাগবে, এমন কথা শুনতে যাবে কেন তোমরা!

চাঁদের আলোর মায়া ছড়ায় কারখানার শেডের উপর নীচ, কত লোকজন আসে আর যায়, মাড়িয়ে যায় সে মায়াবী আলো, চরণদাদু আকশখোলা বেমানান আলোতে ঠকাস ঠকাস স্যাণ্ডেলের শব্দ তুলে কাউকে না কাউকে সতর্ক করে দেয় , 'আমি এসে গেছি, এবার আমার কথা শোনাব'। জানালাটা খোলাই ছিল। চরণদাদু কি মনে করে পিছিয়েই আসছে। চরণদাদু জানালাটা খুলে দিলে দমকা হাওয়াটা ঘুমের মধ্যে চট করে যেন থাপ্পর মেরে দেয় — এমন বেয়াদবি কে মাপ করবে!

এমন একটা সকালেই সুজাতা বিধবা হয়ে বয়সের মাথা খেয়ে এ-বাড়িতে এসেছিল। রূপের হাটে আগুন লাগলেও একটা এমন ঝরণার জল ছিল না, তাকে নিভিয়ে ঠাণ্ডা করে, গুটিয়ে রেখেছিল সেই মনের ভেতরে দমে থাকা পোড়া আগুন।

আজ এমন কি হ'ল, সেই জমতে থাকা ধিকি ধিকি আগুন ফোঁস করে উঠল।

চরণদাদু ভয়ে যেন অস্থির হ'ল। আগুনের হলকাটা দমকা হাওয়ায় উথলে উঠে পুরো ঘরেই না আগুন ধরিয়ে দেয়। সুজাতা ছড়ানো চুল কালো প্রজাপতির ডানা হয়ে রঙ্গিন বিছানা হয়ে উঠতে চায়। কেন আজ সুজাতার চোখে এত রং-এর মেলা! দ্বিতীয় কোন আগন্তুকের এলোমেলো চলাফেরা! চরণদাদু'র চোখে কত কিছুই খুঁজে মরে। সুজাতার কেন যে এমন হল!

মেয়েটার শরীরের উত্তাপ পারদ চড়িয়েছিল, চমকে দিয়েছিল চরণদাদু!

কি হতে কি যে হয় সর্বনাশ! যার ঘরের বউ সেখানেই তো মানানসই, শেষে যদি হয় অন্য কিছু। অশ্বত্থগাছের পাতাগুলো সবুজ রং ছড়িয়ে সেজেগুজে উঠলে ম্যাড়মেড়ে গাছটা যে কোথায় উবে যায়, এক নিমেষে শ্বাস নিয়ে বুকটা ভরে যায়।

সুজাতা ও সুজাতা।

আঁচলটা গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়। বৃন্ত দুটো ফুল পাপড়ি ছড়িয়ে নিজেকে মেলে ধরতে চায়। সুজাতা কি কোন ভুল করল! ফুলটাকে ফুটতেই দিলো, টু-শব্দটি করল না, ঠোঁট দুটো ফুলিয়ে রঙিন হয়ে চরণদাদুকে ছুঁতে চাইলো। বারে বেটা বা! এতকাল পরে শরীর এসে আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়।

সুজাতার শরীর কি কথা কয়!

চরণদাদু কথার রসে পুরো জীবনটাকে মুছিয়ে দেয় — চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে, তোরা ভেবে করবি কী!

ভাবনাটা প্রশ্রয় দিয়ে ঢোক গেলে।

স্বপ্ন দেখছে না তো! শরীরটা এগিয়ে এলো। থমকে দাঁড়ালো। কোন কথা, নতুন বাজি। কে বলতে পারে কার কথা। কথা হচ্ছে যে শরীরটা ....।

শরীরটা এলো! এমন করে এলো কেন! সত্যিই কি এমন করে আসার কারণ ছিলো। শিরশিরে বাতাসটা দমকা বাতাসের রূপ পালটে ওর গলা পর্যন্ত ঢাকনা খুলে দিল।

শরীরটা উঠে এল!

চরণদাদু শরীরটাকে গিলে ফের ....

চরণদাদু তোমার কী হচ্ছে! আর একটু হলে ফসকে যাচ্ছিল। ছিঃ ছিঃ তোমার এত মতিভ্রম! শরীর গিলবে এত অসময়ে! শরীরটা তবুও এলো!

ঘোর নামলে চোখেমুখে এমনটা হয়। বিশ্বাস কর এমনটা হয়। তোমাদের হলে টেরটি পাবে।

শরীরটা এবার আরো কাছে।

সুজাতা হেসে গড়িয়ে নিলো।

চরণদাদু প্রতিরোধ করবে বলে গুটিয়ে নিতে চাইলো।

হায়রে শরীর!

কত আর খেলবে, ঝরো হাওয়া উঠে গিয়ে বাদল এল, নিরামিশ আমিশ হ'ল, এত সঙ্কোচ, সারা গায়ে একটু একটু করে গঙ্গাজল ছিটালো।

কথাটা কে বলছে, সুজাতাই তো।

ঘরটায় পচা গন্ধ, জানালার ফাঁক ফোঁকরে ঢুকে পড়েছে হয়তো। কি হল, সুজাতা গন্ধটা টের পাচ্ছে না!

এমন হাসির কথা তুমি বল না গণপতি, থুড়ি চরণদাদু।

সুজাতার চোখ দুটোতে সাজ সাজ আয়োজন, ফোটা বৃন্তের কাছে হেলা ফেলা যেন।

চোখ দুটোর প্রতি দরদ উথলে উঠল চরণদাদুর।

কে আছ, সুজাতার চোখ দুটোকে উপড়ে আমার হাতের পাঞ্জায় ছড়িয়ে দেবে! মোলায়েম মাখনের শরীর কি হেরে যেতে বসল!

না চরণদাদু ওকে আর বাঁধা দেবে না।

সুজাতা চরণদাদুর চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামাল, ঠোঁট দুটোতে ঠোঁট রেখে ভরিয়ে দিল যত খুশি। ফাটাফুটা শুকনো জমিনে আচমকাই মেঘলা আকাশ আর আকাশের বুক থেকে রিমঝিম বৃষ্টি। ভেজা মাটি রস টেনে তৃপ্তির আনন্দে টইটম্বুর, বৃষ্টির তাতে কি এল গেল, শুধু যে মিশে গেল ফাটলে, ভেজা জমিন দেখে সান্ত্বনাই সার হল, এখানেই ঘুমিয়ে আছে পরম নিশ্চিন্তে. নীরবে।

চরণদাদু, বৃষ্টি হতে চায় নি, শুকনো বৃষ্টিতে ঝড় হয়ে তাণ্ডবে মাতবে এই ছিল আশা।

চলো তবে লুকোচুরিই হোক না।

লোমশ বুকটায় ডুবে যাবার এক চেটিয়া অধিকার এই মুহূর্তে কেবল সুজাতার। চরণদাদু দৌড়ে ছিটকে বেরিয়ে যায়, দিঘির জলে এপার ওপার হয়। তৃষ্ণার্ত পাখিটা তখন এক নাগাড়ে ডাকতেই থাকে।

ঘরের পাশের আমগাছটা থেকে টুক করে কটি আম এসে পড়ল ছাদে।

ধুপ, ধপাস।

সুজাতা ভাবল, চরণদাদুর ঘোর কেটেছে। না হয় কতবারই তো কত ইশারাই না করেছে, চরণদাদু কথার পিঠে কথা সাজিয়ে সুজাতার ডাককে মুড়িয়ে দিয়েছে অন্য রং-এ।

চরণদাদু, তুমি শরীরের হদিস পেলে না, মনের রং-এ অস্থির হয়ে মরলে - শরীর রাজা, মন মন্ত্রী!

ভুল বললি সুজাতা।

হয়ত ভুল, ভুলটা ঠিক হলে অন্তত তোমার কাছে এতটা বেহায়া হতে হতো না।

হাসালি, তোর রূপ যৌবন আছে , তাই তোর আস্পর্ধা। শরীরের জেল্লা ছড়িয়ে তুই

তৃপ্তির দখলদার হোস।

না হলে আর কিই বা করতে পারতাম, বলতো তোমার কাছে ধরা দিতে আমার আর কি কোন রাস্তা খোলা ছিল! চরণদাদু, হৃদয় নিয়ে বাঁধার মন্ত্র কি শরীরের কাছে এত সহজে হার মানবে!

সুজাতা ঠোঁট দিয়ে হাসলো. ভাব দিয়ে লাস্যময়ী হ'ল, ফুল ছড়িয়ে উর্বশী হওয়ার মতলব করলো।

তবে তুমি একবারটি গণপতি হয়ে যাও। চরণদাদুই তোমার আমার মধ্যে দূরত্বের সীমা বাড়াল।

তাহলে তো আরো কত যে বিপদ। গণপতি তো তোর হতে পারে না সুজাতা। সে তো অদিতির মৃত্যুতেই শেষ হয়ে গেছে। সে যে এখন চরণদাদুর কঙ্কাল ছাড়া কিছুই নয়।

যাও, যাও, তুমি নিজেই ঠিক কর , সুজাতার হবে, না মৃত অদিতির স্মৃতির সৎকার করবে।

চরণদাদু এবারও হো হো করে হাসলো । সেই শব্দে পোষ মানানো আগন্তুককে দেখল নাকি। সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে চরণদাদুর. তৃতীয় মানুষটাকে হারাবার আপ্রাণ চেষ্টা করল।

সুজাতা বলল, এর জন্য দায়ী কে ? আর কবে প্রমাণ করবে।

চরণদাদু এবার অস্থির হয়ে উঠল, রক্তে জাগল গরম স্রোত। সুজাতার মুখটা সরিয়ে দিয়েও তার স্রোত বইয়ে দিতে পারল না অন্য খাতে।

সামনের পিচ রাস্তাটা এখন ঝিম মেরে আছে. শত শত লরি বাস ট্যাক্সির চাপ সইতে না পেরে সুযোগ পেয়ে একটু যেন কঁকিয়ে ওঠে। চরণদাদু সমব্যথী হয়। একটা ভ্যান গাড়ি ইট সুরকির ভাঙা রাস্তার উপর দিয়ে ভট্ ভট্ করে পাড়া ছাড়ে। ধুপ্ করে কি যেন শব্দ হয় মাঝ দিঘিতে।

এত কাছাকাছি. এত জল টলমলে, গোবরে পদ্মফুল, এমনই কথা চালচালি এফোঁড় ওফোঁড় করে। জল-ছোঁয়ার এত টান, কে কাকে বোঝাবে সেই কথা। হৃদয়ে কাঁপুনি ওঠে, বেদনার ভাঙা ভাঙা স্রোত এসে ধাক্কা মারে. কুর্নিশ করে । মনে হয় কি ছিল . কি হয়েছে। অতীতের গল্প এসে দু'চারবার ধাক্কা মারলেও চরণদাদু সামলে নেয়। সামলে না নিলে অন্যদের অভিসম্পাত কুড়োবে যে সারা বছর।

রাতের গভীরে ঘোষের দোকানের সামনের লাইটপোস্টের আলো এসে দুমড়ে মুচড়ে পড়লে আলো অন্ধকারের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বাঁদিকে সরকারি যোজনার টাকায় তৈরি ডিপ টিউবওয়েল-এর জলে জায়গাটা ভিজতে থাকে -শেওলা পড়ে লোকজনের যাতায়াতে পিচ্ছিল।

চরণদাদু আরও কত কিছুই মনের কোনে জায়গা দেয়।

সবকিছু চলজলদি পাল্টে যায়। পাড়ার ছেলে ছোকরাদের টাকায় বাস স্টপেজের পাশেই বাখারি দিয়ে সরু লম্বা মাচান হয়েছে। চোখটা জাল বিছায়। সকালেই তো এই নিয়ে হুজ্জতি।

এই সব কিছুই পাল্টে যাবে ধীরে ধীরে। দু'পাশে এপাশ ওপাশ ছফুট করে বারো ফুট রাস্তা বাড়বে। কিন্তু লোকগুলোর ভাত-কাপড়ের চিন্তা। এই কুড়ি কাঠা জমিতে বিক্রিবাটার বহর তলানিতে ঠেকবে এ-ওর জালে. কিন্তু উপায় কি? মানুষের মনের উপর চাপাচাপি দাপাদাপি করলে নিট ফল শূন্য। রোজ দেখা সকাল বিকেলের মানুষগুলো হাঁটি হাঁটি পা পা করে পরিবর্তনের ঢেউয়ে সামিল হবে।

চরণদাদু কি সেকেলে পুরোনপন্থী।

মেলানো এত সহজ ব্যাপার নয়। কেউ হয়ত বলবে পেছন ফেরে আর তাকিয়ো না-তো বাপু, অনেককাল তো হ'ল, মরছে ওগুলো মরুক।

ঠিক কথাই তো বলে। তবু নিত্য দেখা মুখগুলো। এ-ওতো এক বিরাট জনগোষ্ঠী;ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মাইলের পর মাইল। মদনের খাতা পেন্সিলের দোকানটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে; এমনই ছএখান, ছিটকে এসে পড়ল সাইকেল টায়ারের নিচে। মাথা গলিয়ে কালিঝুলি মেখে-দাদা কি হবে। চোখ দুটোর জল গড়গড়িয়ে।

এমনটা হয়, ফ্ল্যাটবাড়ির ধাক্কায়। লোকজন কেউ পোষ মানে না। তিন পুরুষের বাড়ি, শরিকি গোলমালে নাজেহাল, গোদের উপর বিষফোঁড়া, ভাড়াটে শুদ্ধই এতকালের আগলে রাখা দশ খানা কামরার দোতলা বাড়ি বিদেয় হল ওরা। পড়েছিল অনাথ হয়ে, কাগজপত্তর হিসেবের গোলমেলে জেরবার... ভাঙচুর ধুমধাম, মচর মচর, মুখ থুবড়েই পড়ল, কে কাকে দেখে...। মেহগণি গাছটা সঙ্গ দিল, কোথায় এতটুকু আঁচড় লাগে নি, শুধু দু'একটা খাতা, কাঁদল কি কাঁদল না, এঁকেবেঁকে পুকুরের পাড় বরাবর ডিগবাজি খেয়ে লম্বা সিমেন্ট বালি মাখানো ড্রেনটায়, লোকগুলো আগন্তুকের আগমনে—টগবগিয়ে।

মেহগণির ডালে ডালে ভ্রমরের আড্ডাখানা, গুনগুন করছিল কদ্দিন ধরে, যায় কোথায়; তাই বনবন করল এ-ডালে ও-ডালে, ওরা আবার উড়ে চলে যায় নতুন ঠিকানায়, শিউলির মমতায় জড়িয়ে বুক ফাটিয়ে, চিৎকারে—এতদূর থেকে শোনা যাওয়া মুখের কথা নয়, ওরা শুনল, পতপত করে উড়ল, কানে কানে নতুন কথার মহড়া হল, মেহগনির ডালে আর ভ্রমর এল না। ইটগুলো বাড়তে লাগল থাক থাক। সম্বিত এল যখন—চারপাশ হৈ হৈ কলকল—অভয়বাবুর বাড়ির ফাটলটা লম্বালম্বি, অবন্তিবাবুর আড়াআড়ি, দেয়ালের ফিসফাস-গোঁ গোঁ শব্দ। কে কার কথা শোনে? বনবন করে ঘুরল কথার ফুলঝুরি, কথার লাফালাফি। ইটের গাঁথুনি বেড়েই চলল আকাশছোঁয়া।

চরণদাদুর ছোঁয়া আকাশ সুজাতার শরীরে লাগে নি। সুগন্ধির প্লাবন ছড়িয়ে মৌ মৌ করলেও—উদাসী হাওয়া বড় বেশি উদগ্রীব। সুজাতার চোখ দুটো যে কালো ছিল, কাজল লেপটে ছিল, ঠোঁট দুটো আরও বেশি রঙ্গিন ছিল, কথার রং-এ ফাগুনের রং আপন হতে

চাইলেও বাজল যেন এমন বীণা, সুরের তার ছিঁড়ে চিন দিয়েও হ'ল অচেনা।

সুজাতার আঁচলের মেয়েলি গন্ধে কত না ডাক, চরণদাদু এত উপেক্ষার বাজনা বাজাতে চাইল না, সুজাতার হাত দুটো হাতের তালুতে রাখতেই, দোল খাওয়া পাতার মতোই নেচে নেচে হারিয়ে গেল অনেকদূর—রোমকূপের অন্দরে অন্দরে জমে গেল বিন্দু-বিন্দু ঘাম। সে ঘাম চেটেপুটে খেল দুজনেই দুজনায়।

এগার

খুঁজে দেখলে মন্দ কি

সূর্য উঠল, মোরগডাকা সকালে আলোর মত বাজনা বেজে উঠল ডালে ডালে, সে-কথা নাই শুধোল কাউকে। প্রশ্ন করতে তো কোন বাঁধা রইলো না—আলো যে এমন বেপরোয়া, শরীরভেদী শব্দকে ভাঙচুর করে এ-সবের শেষ কোথায়! অলপ্পেয়ে ধুলো তার মর্ম বুঝবে কি।

আজিজুল জানে-শব্দভেদী বান অব্যর্থ। কোথায় গিয়ে বিঁধবে কেউ জানে না, শুধু জানে শব্দটা ভাসিয়ে দাও, যে যার মতো মেজেঘষে নেবে।

স্কুল বাড়িটা থমথমে, টেবিলগুলো, পুজোর ছুটির দিনগুলো পার হলেও সাফসুতরো করা হয় নি। বনানী টেবিলটার যে কোনে বসেছিল থম মেরে, ধুলোর উপরে জমেছে যেন আরও কিছু। মাছিরা বনবন, বৃত্তের আকারে ঘুরে ঘুরে নিচ থেকে উপরে উঠে আসে। মালি এসে ঘুরঘুর করে। এমন কুকর্ম না করলেই চলছিল না।

আজিজুল ঘরের চৌকাঠে পা রাখে। ঘরে একটা মাত্র আলনা চার থাকে ভাগে ভাগে মা-বউ-বোনের শায়া-ব্লাউজ। ওর শার্ট প্যান্টটাই পরিপাটি করে সাজানো থাকে। ঈদ আর দুর্গাপুজোর ছুটিগুলো হেমন্তের ছেঁড়া মেঘের মতোই হারিয়ে যায় চটজলদি। এত উৎসবের আমেজেও মেজাজটা যেন বন্দী হয়ে থাকে অন্য কোথাও, কথায় কথায় বেরিয়ে আসে চোরাগোপ্তা ভাব-ভালোবাসার কথা।

আজিজুল মুখ লুকিয়ে থাকবে, এ কেমন কথা!

বাবা যত খুশি গাল খাস, চুপটি করে থাকিস না—রাবেয়া দম মেরে থাকার পর চোখ খোলে।

বারান্দায় একচালা মেঝেতে মাদুর পেতে ভাত-ঘুম দিচ্ছে মা-বোন আর বউ।

রাজিয়াকে আলাদা করে চেনার নানা কারণ আছে। রাজিয়া ক'দিন ধরে এক ফোটা কথা বলে নি, নিজেকে আলাদা করবে বলে ডুব সাঁতার কেটেছে। দেয়ালের এক কোণে বসে বিড়ালটা ম্যাঁও ম্যাঁও করে। এই বাড়িটা আজিজুলের বাবা আখতার মহম্মদের বানানো, দলিজে কাপর কাটার মাস্টারি করেই এই সংসার তিল তিল করে তৈরি করেছিল। ছাওয়ালটাকে লেখাপড়া শেখাবে এই ইচ্ছাতেই দিনরাত এক করে খেলা, মরশুমে হাড়ভাঙা খাটুনিতেও ছাওয়ালটার মুখটা মনে পড়লে সব কিছু ভুলে যেত।

ডিজাইন মাস্টার কেয়ামত আলি কিছুতেই যেন ছাড়ে না- আরে বাপ, বয়সে বড় এই খাতিরে একটা কথা বলি, মিঞা, আর একটা বাচ্চা নাও, খেমতা আছে, তাকত আছে, রাজিয়া মা-এর তো কাঁচা বয়েস, এখন নিবা না তো কবে নিবা।

কি যে বলেন চাচা, ইচ্ছে তো কত কিছুই জাগে, সব কি আল্লা পূরণ করে।

ও আজিজুল, আজিজুল—কোথায় গেলি বাবা?

রাজিয়া নিজেকে স্থির রাখতে পারে না, ভেতরে ভেতরে গুমরায়।

মাথা ঘুরিয়ে বালিশের উল্টোদিকে বিনুনি সরিয়ে বাঁ পাশে মুখ রেখে শুলে ও আজিজুল-এর প্রতিটা পদক্ষেপ টের পায়। আজিজুলকে শাদির পর থেকেই ও একদিনের জন্যও কাছ ছাড়া করে নি। এত বড় বদনাম হ্যারিকেনের মতোই তাণ্ডব করে ওর ভেতর বাহির ভেঙ্চুরে খানখান করে দিয়ে যায়—এত বড় কুকর্মটা করতে পারল আজিজুল! কোন উত্তরই পেত না।

আজিজুলকে পত্রপাঠ তালাক দেবার হুঁশিয়ারি দিতে পারত কিন্তু স্বামীকে আর একটু সময় দেওয়াকেই সঠিক মনে করল। রাজিয়ার বাপের বাড়িতে পূর্ণিমা-অমাবস্যা কোন পক্ষতেই এমন দিন যায় না যেখানে কারও দাওয়াত পড়ে না। মনোহারি দোকান আর চাষের জমিও কম নয়, লাটেও জমি কম নেই; স্কুল মাষ্টার আজিজুলকে খাঁটি লোক বলেই মেয়ে দিয়েছে। এখন যদি মানটাই খুইয়ে বসে, বাকি আর রইলো কী!

আজিজুল রাজিয়াকে কোনও কথা না বলার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে চায়, ঐ বদনাম রটার পর থেকে নিজেকে লুকিয়ে চুরিয়ে রাখতে পারলেই বাঁচে। ও যেন দূরত্বের আড়ালটুকু কিছুক্ষণের জন্য হলেও উপভোগ করে।

রাজিয়ার পড়াশুনোর বিদ্যে মুসলিম ঘরের মেয়েদের শিক্ষার বহরে কম বলা যাবে না—হায়ার সেকেন্ডারী পাশ, মাথাটা সাফা, কথার পিঠে কথা রাখতেই চট করে বিষয়টাকে চটকে নির্যাসটুকু টেনে বের করতে এতটুকু দ্বিধা করে না।

রসুইঘর থেকে বাসন-কোসন পড়ার শব্দ হ'ল যেন।

ফাতেমা চেঁচায়—ভাবী রান্না ঘরে বেড়াল পড়ল গো।

ফাতেমার সঙ্গে আজিজুল-এর বয়সের ফারাক প্রায় বছর সাতেক।

এমন ব্যবধান খুব কমই চোখে পড়ে।

ফাতেমা দৌড়ে দেখতে গিয়ে হোঁচট খায়।

রাবেয়া এবার মাথা চাপড়ায়—কতবার বইলেচি, অত হুটোপাটি কইরে কাম কাজ করিস নি, ঐ জমিদারের বেটি কোন কথা কানে তোলে নি। একবার শরীলে খুঁত ধরলি পরের ছাওয়াল-এর মন উঠবে, বেশ তো, আইবুড়ো হয়ে থাক, তোর ভাবী তালে তাল মারে যখন দু'জনা গলাগলি কইরে পইড়ে থাকবি।

এ-আবার কেমন কথা মা, মোদের ফাতেমার রাজপুত্রের মতো বর হবে, বড়নোকের বউ হবে, পেল্লাই শ্বশুরবাড়ি হবে, দেমাকে পা পড়বে না মাটিতে, তবে না।

বউ, এ-তো ভালো শিক্ষে নয়, মেয়েছেলের দেমাক সোন্দর নাগে না।

মা ওকি মুই সত্যি সত্যি বইলেছি। আচ্ছা, ফাতেমারে মোরা আইবুড়ো করেই রাখব, ঠিক তো! এই বলে ননদ এর গাল টিপে দেয়। ফাতেমা আদরে গলে গিয়ে ভাবীর আঁচলে মুখ লুকায়। 'লাগেনিতো রে বোন, বুড়া আঙুলটায় রক্ত বের হতি নেগেছে দেখতিছি, দাঁড়া, কচু গাছের রস লাইগে দি, এক্ষুণি বন্ধ হয়ি যাবে।'

মা-বৌ-বোন এই ত্রিমূর্তি'র কথাবার্তায় এমন ভাব-যেন মালা গাঁথা হচ্ছে। আজিজুল ওখানে কিছুতেই নাক গলাতে পারে না।

মাষ্টার মানুষ যার তার সঙ্গে মিশতে তো পারে না। পায়ে হাওয়াই চপ্পল গলিয়ে, ঐ দলিজের বরাবর জোরে হাঁটা লাগায়। দলিজের উল্টোদিকে বাঁশ বাগানের কোচর মোচর শব্দ, বাঁশের শুকনো গোড়াগুলো চোখ মেলে চেয়ে থাকে। মগডালটা যেন এমন ভাব করে, 'কোথায় গিয়ে ঠেকব, পরে টেরটি পাবি।'

শঙ্কর বাগদি সেই দুপুর থেকেই ঐ যে গামছা পেতে পোঁদ আলগা করে বসেছে, কখন ফাতনাটা নড়ে উঠবে, টান মেরে তুলবে কই, হাইব্রিড মাগুর, পাঙাস, কত মাছ যে ডুব ডুব খেলা খেলে। বিকেলে মোল্লার হাঁটে দু'শো টাকা করে দর হাঁকাবে।

কি গো মাষ্টার, কোথায় যাও, এখনও তো বেলা পড়ে নি গো, খুব যে ছুটি মারতেছ মাষ্টার।

শঙ্কর এক পাও দাঁড়ায় না। ওর তো ভালো মন্দ জ্ঞানগম্যি কম, কি বলতে কি বলে ফেলবে, শেষে এই নিয়ে আর এক ক্যাঁচাল।

আজিজুল এর কষ্টটা বাড়ে। ওর যে কত রকমের কষ্ট, মানুষগুলো সব মুখ্যুসুখ্যু হয়ে আছে, পয়সা কড়ি কম, দু'বেলা দু'মুঠো জুটে যায়, এই যা। সেলাই আর দোকানপাতি করে কয় পয়সা হয়, লোকের বাড়িতে ছাপোষা মানুষগুলো জনমজুর ঘাটে, স্বভাব-চরিত্র পাল্টালো না। অনেক বলা-কওয়া করে তবে না ছেলে-মেয়েদের ইস্কুলে পাঠানো। ছেলেদের একটুখানি হাত-পা গজালেই সেলাই-এর মেশিনে বসিয়ে দেয়-শুরু হয় জীবনভর তালে তালে পা-এর ওঠান'মা আর ডান হাতে মেশিনে ভর করে ধীরে ধীরে কাপড় টানা আর সেলাই করে চলা, যন্ত্র আর মানুষের যুগলবন্দী।

আজিজুল-এর কানে ভাসে মেশিনের ঘর্ ঘর্, ঘর্ র্ র্ র্ ....র্ শব্দ, কান সয়া হয়ে গেছে। এ-পাড়া, ও-পাড়া, এখানে ওখানে যাতাযাতের সুবাদে ওদের পাড়াটাকে কারখানা ছাড়া কিছু মনে হয় না।

দুর, এখানে আর বসবাস করা যাবে নি।

ওস্তাগার গোলাম চৌধুরী কথার ঝাঁল সইতে না পেরে বলে—তা যাওনা বাপু অন্য পাড়ায়, কেমন টিকবে দেখ দেখি। পাখনা যখন গজিয়েছে, ডানাটা মেলে দাও।

কটু-কথা হজম করার লোক আজিজুল না, সে যত বড় ওস্তাগারই হোক না, কিন্তু অবস্থার বিপাকে চুপ মেরে থাকে।

খালের পাড়ে জয়নাল পাড়া, পঞ্চাশ ষাট ঘর লোকের বসবাস, গিজগিজ করছে, পা-রাখার জায়গা নেই, মারামারি, গুঁতোগুঁতি। পা রাখতে গিয়েই হড়কে যাচ্ছিল আজিজুল।

বাড়িগুলোর চাল টালির বানানো, উপরে মোড়ানো প্লাস্টিক। গরমকালে হাঁসফাস, বর্ষার জল প্লাস্টিক-এর ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে: চাল টুবটুবু হলে পানি এসে নালা গুলোয় জমে, তারপর তো নালার পানি, চালের পানি ঘরের দাওয়ায় এসে আছড়ে পড়ে। বাপরে বাপ, ঐ শেওলা ধরা উঠোনে কিলবিল করছে চারগণ্ডা কাচ্চাবাচ্চা, গায়ে-পিঠে বাচ্চারা ঐ কফ থুথু পচা সবজি গলা কাদা মেখে কেঁচো, কেন্নো, গোবর পোকার সঙ্গে জড়াজড়ি করে, লিকলিকে সরু ঠ্যাং, ল্যাংচিয়ে ল্যাংচিয়ে চড়ে বেড়ানো ছেলেমেয়েগুলোর পাছায় ডান হাতি থাপ্পর কাঁইকুঁই করে কুকুরের বাচ্চার মতো দে ছুট।

আজিজুলের কানে সয় না, দিন-দুপুরে সকাল সন্ধ্যে কত কিছুই না পাল্টে পাল্টে চলে, মানুষকে কেউ মানুষ জ্ঞান করে না, উপরে তুলে আছড়ে মারে, নাড়িভুঁড়ি বের করতে পারলে জিতে যাওয়ার আনন্দে পাঁচ হাত লাফ—উঁচুতে আর সামনাসামনি।... আইসক্রিম! আইসক্রিম! দুধ সাদা রং-এর, লাল, পেস্তা রং-এর, ক্যাণ্ডি বা কাপে, কচকচে নোট বের করে দেয়, মেয়েছেলেরা ঘর ছেড়ে, কাপর ঝোলান পর্দা সরিয়ে, বোরখা উঠিয়ে—দু'টাকা দামের আছে?

পাঁচ টাকার নিচে হবে নি গো।

কেন এত চড়া দাম নিতেছ মুকবুল মিঞা।

আইসক্রিম খেতে হবে নি মেয়ে, তোমার ঘরের পয়সা আঁচলে জড়িয়ে রেখে দাও, ব্যাটা ছেলেগুলো কাল বিড়ি ফুঁকবে।

কেন খোঁচা মারতেছ, দিতে হয় দেবে, না হয় বল পারবু নি, এত কথা কীসের! মেয়েছেলেদের একলা পেয়ে যা-তা বলতেছ, লোক ডাকতি নাগব।

আরে দিদি গোসা করতেছ কেন? আজ না হয় কাল দিও, পয়সার কথা বলতেছি আমি!

মকবুল মিঞা চোখ টাটিয়ে দেখে—আহা টসটস করতেছে গো।

কি বললা মিঞা!

শোন শোন, পয়সা তোমার দিতে হবে নি, আর একটা আইসক্রিম নাও।

এই নাও বলে হাতটা চেপে ধরে, নাসরিন হাতটা ওর হাতে রেখেই দেয়। আর এক হাতে আইসক্রিমটা জিবে ঠেকায়। হাতটা মোলায়েম করে চেপে ধরে চুড়িগুলো নাড়েচাড়ে।

হাতটা ছাড় মিঞা এবার, আইসক্রিম শেষ, যাও ইবার পালাও, কাল আসব কিন্তু!.... খাঁচার পাখি উড়ে যাবে, ধরতি গেলে উড়ান দিতে হবে গো মিঞা।

মাঠে ঘাটে জল এখন তেমন নেই, শুকনো, খট খট চারদিক, দু'একটা বৃষ্টির ফোঁটা পড়লেও লাফিয়ে লাফিয়ে বড় খালের দিকে চলে যায়, টাপুর টুপুর করে, বেশরম, দাঁড়ায় না একটুকুও। বাঁশ ঝাড়ের উল্টো দিক থেকে দু'একটা পাখি যেন কুব্..... কুব্.... খিঁচিমিচি, খিঁচিমিচি, উহু-উহু-উহু-উহু, যদি একবার হাতের মুঠোয় পেত, এপাশ ওপাশ দুলিয়ে দেখত, গলার স্বর যাদের এত সুমিষ্ট, চেহারা সুরত না জানি কেমন! রাজিয়ার গলার স্বরের সঙ্গে পাখিগুলোর থেকে থেকে মিলে যায়, রং-টাও বোধ হয় মিলজুল খেতে পারে!

বার

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে

সত্য কথার ডালপালা নেই—আজিজুল এই বিশ্বাসেই সকাল থেকে নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছিল। অভদ্রতা, অসম্মান শব্দগুলো ওকে আদা ছেঁচানোর মতো করেই রসকসহীন করে দিচ্ছিল, বলছিল, বেশ তো ছিলি, কেন শুধু শুধু এ-গলি ও-গলি গিয়ে কাদা সরানোর অতি আগ্রহে ফেটে পড়লি। বড় দুঃখ হচ্ছিল কি ভেতরে ভেতরে!

দুঃখ হবে না, দুঃখই আনন্দের সেতু রচনা করে—এটাই কি আজিজুলের সান্ত্বনা না দুর্বলতা। চুলটাকে পরিপাটি করে সাদা ধবধবে রং-এর ফুলহাতা শার্টটা'র হাতার বোতাম লাগিয়ে জিপটা টেনে, বেল্ট বেঁধে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়—কেমন লাগছে ওকে, কীভাবে দেবে সেদিনকার অপমানের জবাব। চরণদাদু যে ভরসা যুগিয়েছিল, তাকেই হাতের মুঠোয় করে নেমে পড়বে লড়াই-এর ময়দানে। যুদ্ধ প্রস্তুতি শিবিরের অর্থাৎ কামান দাগানোর আগে গরু ভেড়া মোষ কাউকে না কাউকে দিয়ে পরখ করে নিতে হবে।

বনানী কি পাপেই!

ওরি ব্বাস এত বড় বড় ভাবনা।

কখন যে কোথা থেকে বাজনা বেজে ওঠে, কারা সেই বাদ্য বাজায়! এই না জানার যন্ত্রণা কত যে পীড়া দেয়, সময় আসে, তাও বাটোয়ারাও করা যায় না। বনানীকে সামনে দাঁড় করিয়েই কি উত্তর খুঁজবে! তার আগে কত কথাই জেনে নিতে মন চায়—কে বেশি এই নাটকে বড় ভূমিকা নিচ্ছে! সত্যি সত্যি জানালাটা বন্ধ করে শিকগুলো নাড়ানোর চেষ্টা করে ও বুঝে নেবে ওর বিদ্যে বুদ্ধির বহর কতখানি! পা ফেলার আগে ও দেখে নেয় কে কত পসরা সাজিয়ে বসেছে। সকাল সকাল যুগলের দোকানেই আজ দাড়িটা পাঁচ টাকা বেশি দিয়ে স্পেশাল করে কাটিয়েছিল।

কী গো শ্যাম্পু করে নেবে নাকি মাস্টার!

না-অত স্টাইল মেরে লাভ নেই গো।

দিই না চুলগুলো একটু কলপ করে।

কেমিক্যাল!

না বাপু।

আরে পুরোপুরি হার্বাল। তুমি পরখ করে দেখই না একবার!

কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

মাষ্টার তুমি দিনে রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখ।

তোমার হয়েছেটো কি!

আজিজুল নিশ্চিত জানে ঘটনাটা ওদের ধারেকাছে গিয়ে গেঁড়ে বসে নি। চাওর হয়ে গেলে মান-সম্মান ধুলোয় মিশে যাবে, হাতে হ্যারিকেন!

রোগীগুলোর ভিড় কমতে চায় না। একটু হালকা হলে অন্তত চোখ জুড়িয়ে একটু আধটু হিসেব কিতেব করে নেওয়া যেত, এত যে কথা, কোথায় গিয়ে নতুন কথা জুড়বে। বিবাদবিসংবাদ প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে জন্মাচ্ছে, বুদবুদ হয়ে শরীরকে নাড়াচ্ছে, আবার মিশে যাচ্ছে চটপট, আজিজুল এমন করে সংবাদের শিরোনামে আসবে, ভেবেই আত্মারাম খাঁচা হয়ে যায়।

শরীর ও মেজাজ দুটোই একে অপরের সতিন। একটা চাঙ্গা হলে অন্যটা বিগড়ে যায়।

রাজিয়া কথাটা বলেই ফেলেছিল, সন্ধ্যায় গা ধুতে গিয়ে কীসব ফুসুর ফাসুর আওয়াজ শুনেছি। গলাটা চেনা লাগল, কিন্তু ইচ্ছে করেই কথাগুলো কেটে কেটে বলছিল, জুড়তে গেলে কাল ঘাম ছুটে যাবে, এই ভয়ে এক পা-ও না এগোয়। ওরা জাল পাতলে চার কোণা মেরেই পাতে, ফাঁকফোকরে সাপ ব্যাঙ না সেঁধিয়ে যায়।

যুগলের দোকানের সামনে বড় বড় করে লেখা-নলিনী হেয়ার কাটিং। সাধারণ কাটিং আর স্পেশাল কাটিং, দুই লাইনে ইংরেজী অক্ষরের তিনটে শব্দই ভুল। বিবেকানন্দের ফটোটা অর্ধেক ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে, এক কোণে গণেশ ঠাকুর ইয়া বড় ভুঁড়ি বের করে তাকিয়ে আছে। দুটো বাতাসা, জবা আর টগর ফুল। এতেই-বা কম কি! খরিদ্দারের নানা আব্দার সামলে তবেই না নজর দেওয়া।

জোর খবর, জোর খবর, গয়লার মাঠে বিরাট জমায়েত। বক্তা বিখ্যাত রাজনীতিক হিরু লস্কর, বিকেল চার ঘটিকায়। বিষয় ঃ এলাকার সমস্যা ও পরিত্রাণের উপায়।

কী সর্বনাশ! এবার মরণ ছাড়া গতি নেই, কোথাকার জল কোথায় গড়াবে, শেষ পর্যন্ত গয়লার মাঠে!

উঃ এত মানুষের আনাগোনা, একটু যে আনমনে হেঁটে চলে বেড়াবে, সে উপায় নেই!

দুটো গরুকে মুখ বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে কালি মোল্লার হাঁটে, পেছনে দু'জনে লাঠির আগায় দড়ি বেঁধে আর পাশাপাশি দু'জনে চেঁচিয়ে-হ্যাঁ....ট, হ্যাঁ......ট।

আজিজুল ভাবে, ওদের কখন তাড়িয়ে জবাই করবে, কে জানে!

আজিজুল শঙ্কিত হয়েই স্কুলের সামনে ঘুমটি ঘরটায় সামনে এসে দাঁড়াল। অঙ্কের মাষ্টারমশাই জীবনবাবু বাঁকা চোখে তাকিয়ে গটগট করে ঢুকে যায়—ভাবখানা এমন চোখাচোখি হলে কি বলতে কি বলে ফেলবে, 'আর কি অপকর্ম করেছ বাবু, দেখ চাকরিটা খুইয়ে বসেছ কিনা।' চাকরিটা আজিজুলের কাছে টাকা-পয়সার চেয়েও দামী, এই সম্মান তো আত্মীয় পরিজনের কাছে দুলর্ভ বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুল শুরু হওয়ার আগে জরুরি মিটিং-এ বিশেষ এজেণ্ডাই ছিল 'আজিজুলের দ্বারা ছাত্রীর শ্লীলতাহানি।' এ বিশেষ মিটিং-এ আজিজুলকে অন্ধকারে রেখেই ডাকা হয়েছে এলাকার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি, গার্জিয়ান ও প্রতিনিধিকে, এর মধ্যে চরণদাদুকেও রাখা হয়েছে। কোন এক অজ্ঞাত কারণে কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিকে এই সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয় নি। এই অবহেলার সমুচিত জবাব দিতেই কি কোন এক রাজনৈতিক দলের খোলা মিটিং! জল যে এতদূর

গড়িয়েছে আজিজুল স্বপ্নেও ভাবেনি। আজিজুল নিশ্চিত ভাবেই এমন অবস্থান নিয়েছে, 'অপেক্ষা কর এবং দেখ।' মানুষের দীর্ঘকালের অর্জিত সম্মানকে ধূলোয় মিশিয়ে দেওয়া, অপমানে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া এ-ও এক আধুনিক পরিহাস!

স্থানীয় ক্লাবের সেক্রেটারি 'আবির'। মাধ্যমিক ফেল করে পাড়ায় গুলতানি মারছিল, তার থেকেই পোস্টার লেখার কাজে নেমে পড়া আর রাজনৈতিক দাদা-দিদিদের ছত্রছায়ায় চলে আসা, সুযোগ সুবিধেমত দল পাল্টানো---এই হ'ল আবির এর বায়োডাটা। আর ক্লাব ইলেকশানে নামটা প্রস্তাব করেছিল গতবার মিউনিসিপিল্যাটির ঐ হেরে যাওয়া ক্যান্ডিডেট সুবোধ চৌধুরী। কেতাদুরস্ত ধবধবে পোশাক, সাদা ধুতি, সাদা-পাঞ্জাবী, তিনি ইচ্ছেমত পোশাক আশাক দিনে রাতে পাল্টে ফেলেন গিরিগিটির রং পাল্টানোর মতো। ওনার সামনের বারান্দাটা যেটা মূল ঘর থেকে অনেকটাই একটা প্যাসেজ দিয়ে বিচ্ছিন্ন, রাতের আঁধার জমাট বাঁধলেই মদের ফোয়ারা ছোটে, শ্যাম্পেন খোলা, মেয়েবাজি, সুবোধ চৌধুরীর এত সব কোয়ালিফিকেশান, উনি মানুষের সম্মান নিয়ে টানটানি করার অধিকারী হবেন না কে হবেন?

কে এসেছিল ঘরে! আজিজুলকে ভোটের আগেই ডাক করেছিল সুবোধ চৌধুরী! হঠাৎ সুবোধ চৌধুরী'র তলবে খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে দু'তিনবার পায়চারি করে নিয়েছিল আজিজুল। জামাটা গায়ে চড়িয়েই উল্টোসিধে ভাবতে ভাবতেই হাজির হয়ে গেছিল ঘণ্টা খানেক আগেই। আজিজুল সবেমাত্র অনেক চিঠি চাপাটি করে ট্রান্সফার নিয়ে এসেছে লোকাল স্কুলে; সেইখানেই কি বিপত্তি! তাতে করে সুবোধ চৌধুরীর এত মাথাব্যথা কেন, সে তো কারও পাকা ধানে মই দেয় নি, হবে হয়ত সুবোধ চৌধুরী'র কোন ক্যান্ডিডেট ছিল, না এরকম কিছু তো শোনে নি। তবে সন্দেহ দানা বাঁধতে গিয়ে দু'তিনবার হোঁচটও খেল। রবীন ডাক্তারকে দেখে জেনে নিতে চাইলো-আচ্ছা বলতো দাদা, ব্যাপার স্যাপার কী, হঠাৎ সুবোধ চৌধুরী'র এই অধমকে তলব কেন? রবীন ডাক্তার ডাক্তারিতে এখনও হাত না পাকালেও পাড়ার রাজনীতি ওর কাছে জল ভাত।

কারণ অনুমান করতে পারছি আজিজুল, তবে সবটাই আমার অনুমান, কিন্তু এটা আমি ষোল আনা নিশ্চিত, সুবোধ চৌধুরীকে যতদূর চিনি, একবার যখন নজর দিয়েছে, ঘাড় মটকেই ছাড়বে।

আজিজুল দাওয়ার একপাশে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে, দু'একটা ব্যাঙ থপথপ করে ওর দিকেই লাফিয়ে লাফিয়ে চলে আসছিল, যত তাড়ায়, তত বেশি করে ওর দিকে ধাওয়া করে। 'বাপরে বাপ! এ-ও কি তবে সুবোধ চৌধুরী'র পোষ ব্যাঙ!' ব্যাঙ তো তাড়াল, আরও যে সব সৈন্য-সামন্ত আছে তাদের রুখবে কে! একটা তেতুলে বিছে পায়ের কাছে অনেকক্ষণ ঘুরঘুর করছিল, নজরে পড়ে নি, তাতে তো বিছের কোন দোষ নেই, যাকে বিষের হুল ফোটাবে, সে যদি পা বাড়িয়ে বসে থাকে, দংশনকারীর কি করার থাকতে পারে!

বিষের জ্বালায় উঃ আঃ উহুঃ আহাঃ শব্দ করে বাড়ি মাত করলে একজন বেঁটে মত লোক, শীতের রাতে মাঙ্কি ক্যাপ চড়িয়ে বেরিয়ে আসে, ভেতরে তখনও হুলস্থুলু চলছে!

আরে মাষ্টার যে, অনেক আগে চলে এলে, কোন মতলব নেই তো!

না চৌধুরীবাবু, আপনি এই অধমকে স্মরণ করেছেন তাই একটু আগে আগেই চলে এলাম।

কী যে বল মাষ্টার, তোমরা হলে গিয়ে দেশের মেরুদণ্ড, তোমাদের স্মরণ করব আমরা, একটা অনুরোধ করব বলেই...... অবশ্য তুমি বললে আমি স্বয়ং তোমার বাড়ির দরজায় হাজির হয়ে যাব। আরে কে আছিস। মাষ্টার এসছে আমার ঘরে। একটু খাতির যত্ন কর। মাষ্টার এই সন্ধ্যাবেলায় তোমায় কি দিই বল তো। তোমার তো আবার এই হট ড্রিঙ্ক চলবে না, তুমি বরঞ্চ কফিই খাও।

সুবোধ চৌধুরী নিজেই ঢেলে দিলেন—যাও মাস্টার, এই লোক কখনও কাউকে কফি নিজে হাতে ঢেলে দেয় নি, তুমিই হলে প্রথম লোক, যাকে......।

কি যে বলেন সুবোধ বাবু, আপনার কথায় এত লোক উঠে বসে, বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, আর আপনার এই বদান্যতা তো আমি কখনও ভুলব না।

বাঃ মাষ্টার বাঃ এই তো চাই। তোমার মতো লোক থাকলে এই দেশের উন্নতি কে রুখবে বল তো?

সুবোধ চৌধুরী মাষ্টারের পিঠ চাপড়ে দেয়।

মাষ্টার এবার কাজের কথায় আস। জান তো সামনে মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশান, আমি এবার দাঁড়াচ্ছি বুঝলে, তোমার সহযোগিতা না পেলে আমি মাঠে মারা যাব।

এতক্ষণে আজিজুলের কাছে গোটা ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো। এত আগাম পরিকল্পনা, ব্যাপারটা একেবারেই আঁচ করতে পারে নি আজিজুল। ওর নিজেকে পুরোপুরি গণ্ডমূর্খ মনে হ'ল। পাখাটা ফুল স্পিডে চললেও আজিজুল ঘেমে নেয়ে একসা।

কি হে মাষ্টার ঘাবড়াচ্ছ কেন? মোটেই ঘাবড়াবে না।

না, চারদিকে যা গুমোট আবহাওয়া। শরীরটা একটু কষে গিয়েছে আর কি।

ও, এই ব্যাপার, আমি ভাবলাম কিনা কি, তো রোজ একটু করে গ্লুকোন ডি খাও, আমি তো রোজই খাই, দেখনা এই বয়সে কেমন শক্ত সমর্থ আছি, বলো, আমায় ভোরের শিউলির মতো তরতাজা দেখাচ্ছে না।

আজিজুল চুপ করে থাকে, লোকটার এত গুণও আছে।

কি হে মাষ্টার, এই ইলেকশানে তুমি আমার সঙ্গে আছ তো।

একটা কথা বলি চৌধুরী বাবু, আমি স্কুলে শিক্ষকতা করি, রাজনীতি'র 'র'-ও বুঝি না, আমাকে এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন?

আরে জড়ালাম কোথায়? তুমি শুধু তোমার মুসলমান ভাইদের মধ্যে আমার হয়ে একটুখানি প্রচার চালাবে আর কি। এর বিনিময়ে যা চাও পাবে, ওই নিয়ে তুমি কিচ্ছটি ভেবো না।..... বলো তো এখন তোমার কি চাই? আরে কে আছিস্ মাষ্টার হেঁটে হেঁটে

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ছাত্রী পড়ায়, মাষ্টারের জন্য হিরো হণ্ডা গাড়ির বন্দোবস্ত করে দে।

না মি. চৌধুরী, এসবের দরকার হবে না, আপনি একটু ভাববার সময় দিন।

এতে ভাবাভাবির কি আছে বল, তুমি হলে গিয়ে মাষ্টার মানুষ, তোমার কথা সবাই মান্যি করে, তাই এত করে বলা।

বলছি তো বাবু, আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন।

তাহলে, আমরাও ভাবি মাষ্টার। এই কে আছিস, মাষ্টারকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয়। নাই-বা আমায় দেখল, মাষ্টার তো!

তের

তোমার বিচার করবে কারা!

অফিসঘরে চেয়াবগুলো এলেমেলো ছিল একটু আগে। স্কুলের দারোয়ান সুদর্শন রায় এসে সভা চলার মতো সাজিয়ে গুছিয়ে দিল। প্রথমেই হেডমাষ্টার মশাই ঢুকলেন। আজিজুল জানে এই লোকটির প্রতি সামান্য হলেও ওর আস্থা ও বিশ্বাস আছে। দ্বিতীয় লোকটি আবির বিশ্বাস, আর তৃতীয় লোকটি চরণদাদু—এই সভায় বড়ই বেমানান, তবে সত্যানুসন্ধানী, এলাকার দু'চারজন শিক্ষিত ভদ্রজন আর স্কুলের সেক্রেটারি মনোময় হালদার—ইনি অন্যের ভালোমন্দের চেয়ে নিজের ভালোমন্দের কথা ভাবতে বেশি পছন্দও করেন, প্রয়োজনে পেরেক পুঁততেও ছাড়বে না।

আলোচনা সভা শুরু হ'ল। তাকিয়ে রইল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বিদ্যার সাগর নাকি বিখ্যাত ভুবনে, রাজা রামমোহন রায়—এনার দৃষ্টি সোজা দরজার দিকে, অর্থাৎ আসা-যাওয়ার পথের মানুষগুলো'র সমস্ত খতিয়ান ওর মুখস্ত। আর বাঁ দিকের দেয়ালে ঝোলান যিনি, চিনবেন সবাই, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর;উনি এই ভেবেই অস্থির হচ্ছেন, কেন ভুল জায়গায় জ্ঞানের বীজ বপন করেছেন, ফসল যখন সোনালি রং-এ মাঠ ভরাট হয়ে বসন্তের বাতাসে দুলে দুলে উঠছে, পোকারা এসে দিয়েছে প্রথম ঝটকা, দ্বিতীয় ঝটকা এলাকার ছাড়া গরুর ভাঙা সিং দিয়েছে, যারা বাছুরের দলে নাম লিখিয়েছে। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে একমাত্র আসামী আজিজুল গোলটেবিলটা ছেড়ে হেডমাষ্টারের মুখোমুখি। সাজানো গোছানোর ভাবভঙ্গী মহামান্য আদালত-এর বিচারকক্ষের মতো। জুরি মহোদয়গণের মত প্রকাশের পর রায় ঘোষণার আগে বিচারের সাপেক্ষে আসামীর বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ দেওয়া। এখানে একটু গোটা ব্যাপারটা অদল বদল করে নেওয়া।

আজিজুল তুমি জান, আজ কেন আমরা এখানে সভা ডেকেছি!

হ্যাঁ স্যার।

তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তুমি ওয়াকিবহাল।

না স্যার।

সে কি তুমি অভিযুক্ত আর তুমিই জান না!

উত্তরটা সোজা, ঘটনাটা সাজানো, বানানো, ঝুরি ঝুরি মিথ্যার মালাগাঁথা হয়েছে।

তাহলে আপনাদের মধ্যে কে ঘটনাটা সম্বন্ধে আলোকপাত করতে চাইবেন, আচ্ছা আবিরবাবু, আপনিই বলুন।

চরণদাদু এতক্ষণ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিলেন, তিনিই হঠাৎ হাত তুলে এই আবিরবাবু সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে চাইলেন।

স্যার, মূল ঘটনায় প্রবেশ করবার আগে, আমি আগে জানতে চাইব, আবিরবাবু এই কমিটিতে বিচারের জন্য মনোনীত হলেন কীভাবে? উপস্থিত আমরা সবাই জানি, ওর সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই ওঠা অনেক আপত্তিকর ঘটনার কথা, এবং আমি আশা করি আমার অন্যান্য সুধীমণ্ডলীরাও জানেন।

উপস্থিত সবাই ঘটনার আকস্মিকতায় মাথা নিচু করলেন, এর জবাব কী হতে পারে এবং সরব হওয়ার প্রতিক্রিয়া কী দাঁড়াবে, প্রত্যেকে সেটা জানেন, তাই এত নীরবতা। সভায় কিছুক্ষণ টু-শব্দ না হওয়ায় হেডমাষ্টার মহাশয় আবিরকেই প্রশ্ন করলেন—আপনি জবাব দিন আবিরবাবু।

আমি এর উত্তরে প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে একটা কথাই জিজ্ঞেস করব আজকের সভা আমার বিচারের জন্য ডাকা হয়েছে, না অন্য কারও।

হেডমাষ্টার মহাশয় আবারও বলেন—যখন আপনার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, জবাব তো আপনাকে দিতেই হবে।

জবাব তো আমার একটাই—এই সভার সভ্যবৃন্দরা আমার যোগ্যতার বিচারক নয়। কিন্তু এই যুক্তি মেনেও আমি এই প্রশ্নে সভার কাজ এখানেই আজ বন্ধ ঘোষণা করার প্রস্তাব রাখছি।

চরণদাদু যে এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন, আজিজুলের বুঝতে বাকি রইল না।

আবির এই সভার মুলতুবিকে নিজের পরাজয় ভেবে রাগে ফুঁসতে লাগলেন। ওর ধারণা ছিল, এ-সভায় নেওয়া প্রস্তাব পাশ হলেই লোকটাকে জব্দ করা যাবে, এখন সুবোধ চৌধুরী'র কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে। এর একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে।

সুবোধ চৌধুরীই যে আজিজুলকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার জন্য কবরটা খুঁড়ে রেখেছিলেন, এটা বুঝতে অনেক সময় নিয়েছিলেন কেউ কেউ, আবার অনেকেই এই সূক্ষ্ম চালকে মাথাতেই রাখেনি, বরঞ্চ আমতা আমতা করে আজিজুলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

চরণদাদু সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে গিয়ে লম্বা শ্বাস নিলেন। জানালার বাহিরে থেকে যে কৃষ্ণচূড়া গাছটি লাল-হলদে পাপড়ি মেলেছিল, ঝরে পড়ল চরণদাদুর মাথায়, প্রাণভরে পাপড়িগুলোকে হাতের মুঠোয় নিয়ে চুমু খেলেন। কী অনাবিল ভালোবাসা চরণদাদুকে মাঝে মাঝেই নাড়িয়ে দেয়। বড় কষ্ট হয়েছিল কদমফুল আর জুঁই ফুলের

গাছটা কাটা পড়ায়, রাস্তা চওড়া হলো, কিন্তু ভেঙে গেল চরণবাবুর হৃদয়।

কোথায় গেল সেইসব দিন! খোলামেলা, নানা রং-এ নিজেকে সাজিয়ে তুলত প্রকৃতি, বাতাসে ভেসে বেড়াত কত রকমের ঘ্রাণ, শিমুল তুলোর আনাগোনা, দু'চারজন মানুষের ছোঁয়া পাবে বলে দীর্ঘ অপেক্ষা, সেই যদি পেলো, আদরে জড়িয়ে ধরে করলো কোলাকুলি।

এক পা এগোতেই চরণদাদু চার-চারটে লোকের গায়ে ধাক্কা খেল। বাঁ পাশ কাটিয়ে ডান পাশে যেতেই যত বিপত্তি। ঝটকা লাগল চরণদাদুর, এ-যেন ইচ্ছে করেই ধাক্কা মেরে চলে যাওয়া, মরণ কামড়ের গন্ধ লেগেছিল, বিছে হুল ফোটাবে বলে শুঁড় বাড়িয়ে দেওয়া। গাটা কাঁটা দিয়ে ওঠে আজকাল অল্পবিস্তর।

দমার পাত্র নয় চরণদাদু। স্যাণ্ডেলের ঠাসঠুস শব্দে পা-চালিয়ে চলে। কাঁচা মাটির বুক চিরে পাতা ইটের টুকরোয় হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়ে যায়। চরণদাদু এইসব বাঁধা পেয়ে আরও দ্বিগুণ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তবে রে দেখাব তোদের মজাখানা!

ছাগলটা পাতা মুড়িয়ে কচ্‌মচ্‌ করে চিবোচ্ছিল, সঙ্গে দু'একটা বুনো ফুল মুখে চলে গেলো খাঁকখাঁক। রিক্সা'র চাকায় চাপা পড়ে কুকুরটার পথের মাঝখানে ডান-পাটার হাঁড় ভেঙে ফুলে গেলে চরণদাদু দাঁড়িয়ে রইল, নির্বাক দৃষ্টি, কোথায় যায় এখন, কে করবে এ-অবলা জীবটাকে উদ্ধার!

মানুষের এক ফোঁটা দাম নেই, পশুর কথা ভাববে এ-জমানায় এমন পাগল কে আছে!

প্যাঁ পোঁ প্যাঁ, আবারও রিক্সাটা পাশ কাটাতে গিয়ে ধাক্কা মারে। চরণদাদু বোঝবার চেষ্টা করে যে আগের লোকগুলো আর এখনকার লোকগুলোর সঙ্গে অদ্ভুত মিল!

লোকগুলো ধাক্কা মেরে দৌড়ে চলে যায়।

চরণদাদু স্যাণ্ডেল পায়ে দৌড়য়, দু'পাশের লোক চোখা পাকিয়ে তাকায়।

মানুষের কাছে মানুষের এ-পরাজয় মেনে নেবার নয়।

চরণদাদু জোরে পা চালায়, লেভেল ক্রসিংটা পেরিয়ে গিয়েও তার শান্তি হয় না। দু'চারটে শব্দ যেন এসে ভেতর থেকে ধাক্কা মারে, শব্দগুলো বাক্য হয়ে উঠতে চায়, বাক্যগুলো মিলেমিশে কত রকমের খেলা খেলে সেই জানে।

কীভাবে আজিজুল বনানীর মুখোমুখি হবে, দূরকে সরিয়ে দেবে, আড়ালকে মুছে দেবে। চরণদাদু গুটি সাজাতে থাকে। আজিজুলকে অপদস্থ করার জন্য যে যে পদ্ধতিগুলো ওরা অবলম্বন করেছে ঠিক সেই পদ্ধতিতে ওদের প্যাঁচে ফেলবে।

এই যে নয়ন, একটা কথার জবাব দাও দেখি, আজিজুল সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি— স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, এপাশ থেকে ওপাশে সবটাই জলের মতো পরিষ্কার।

ঠিক সময়ে আসল কথাটা বলতে পারবে তো!

এ-বান্দা যখনই ডাকবে হাজির।

ঠিক করে, কোথায় কখন আজিজুলকে ফাঁসাবার ছক কষেছে, সুবোধ চৌধুরী।

আজিজুল-এর যে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি আছে তাতে আঘাত করলেই আজিজুল চাপে পড়ে যাবে এবং বলয় সৃষ্টির খেলায় ও সুড়সুড় করে শত্রুর খোঁজ করবে।

কিন্তু একটা আশঙ্কা ছিল এই চক্রান্তের নায়কদের। আজিজুল -এর ঘাড় সোজা, যদি একবার বেঁকে বসে তাহলে বাগে আনা সহজ কাজ হবে না, পুরো ঝাড় শুদ্ধ উপড়ে নিয়ে ফেলবে একেবারে গঙ্গার পাড়ের শ্মশানে। ছাই ভষ্ম কুড়িয়ে জল ফেলে হবে শান্তি।

চরণদাদু ঠিক কোন জায়গা থেকে ওদের কাঁধে বন্দুক রেখে প্রথমে শূন্যে গুলি ছুঁড়বে, ভয়ের বাতাবরণটা তৈরি করে দিতে পারবে, এটাই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। পুলটা নড়বড়ে, একটু বেশি ভারি বোঝা নিয়ে চড়লেই গাড়ি শুদ্ধ হবে সলিল সমাধি!

চরণদাদু গলায় গামছাটা সামলে নিয়ে এস.টি.ডি. বুথের কাছাকাছি আসে। হলুদ রং ক্যাটকেটে, এরা অন্য কোন রং-এর খোঁজ রাখে না, সঙ্গে আবার কয়েন ফোনের ছোট্ট বাক্স, চরণদাস স্মৃতিকে আর একবার ঝাঁকিয়ে নেয়। শূন্য ময়দান, শূন্য রাস্তা, লোকের উৎসাহ দেখে চরণদাদু চমকে ওঠে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের প্রবল ইচ্ছাকে কাজে লাগিয়ে তো ব্যবসা।

তাই তো!

এ-তো এক বিরাট কৌশল, আজিজুলকে ট্র্যাপে ফেলার মতো। মানুষকে নানা কাজের খাঁচায় বন্দী করে ফেলা। হ্যাঁ বন্দী, কোন পরিত্রাণ নেই, হাঁসফাস করে চিৎকার চেঁচামেচি করলেও কেউই কারও কথা শুনতে আসবে না। চারপাশে অনেক মুখ, অনেক কথা, অনেক গল্পের জঞ্জাল, সকলের আসা-যাওয়া, ধাক্কাধাক্কি, সকলেই হয়ত চেনা, দৌড় যখন শুরু করা, সকলের অলক্ষ্যে চোখ ধাঁধানো, অন্য কারও নির্দেশনায় পথ চলা, সকল নির্দেশ এসে অন্যকে অশ্রুত করে দিচ্ছে, এখন থেকেই শুরু হচ্ছে জয়-পরাজয়ের অঙ্ক।

চরণদাদুর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে গেছে। জেনে ফেলেছে কেন মানুষ এত বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ব্যবহার শিখেছে!

মেয়েটা তাই তো মোবাইলকে প্রতি সেকেণ্ডে কানের কাছে এবং মুখের কাছে নিয়ে এসে নির্বিকার। কোথায় যাবে? কোন উত্তর নেই, জড়তা নেই, গতি আছে, পা ফেলাটা সমান তালে, মুখে অনর্গল বুলি, ঝড় না তুলবে! বন্ধু-বান্ধবী হবে, ঈশ্বরীতলার হাঁটাপথে ফিনান্সিয়াল ক্যাপিটেলের আন্দেরি কিংবা জুহু বিচে বসে আরব সাগরের জলের হিল্লোলের দিকে তাকিয়ে থাকা বন্ধুর সঙ্গে মিনিটের পর মিনিট কাটিয়ে দেওয়া।

চরণদাদু বুঝে নেয় সময়ই মানুষের আসল শত্রু, সম্পর্কের ভাঙনের কারিগর! আর সময়ের নিয়ন্ত্রক সেই মানুষই, তার তৈরি বিশ্বে, বৃহৎ বিশ্বে মানুষ আবার তার হাতের পুতুল।

হ্যাঁ তাহলে নয়নকে প্রশ্ন করতেই পারে—এত যে বড়াই কর কি করার ক্ষমতা আছে তোমার, ছিটকে যাবে কোথায়!

নয়ন বোকা বনে যায়, লোকটা কি সব অবোল তাবোল বকে। মাথা খারাপ আছে,

মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের মিলাতে গিয়ে লোকটা যত গণ্ডগোল পাকাচ্ছে।

আরে না গো নয়ন।

ষোল আনা শোলক জান! সেই কবে আকাশে চাঁদ নয় গো, রাতের বেলা অন্য একটা ফুটকির মতো কি যেন ফুটেছিল, এত লাল লাল আলো, তোমার চক্ষু স্থির হয়ে এলে ফুড়ুত করে আলোর ফাঁক দিয়ে টান মারবে লাল রং। পৃথিবীর দিকে চোখ মেললে দেখা যাবে পুকুরের ভরা জলে মাছ লাল রং-এর বুজকুড়ি কাটছে, এমনটা হলে তো কেমন হয়?

চলো না আমরা একবার অন্য গ্রহে চলে যাই, আরে চুপচাপ দেখছ কি! গ্রহ বোঝ না, কত রকমের তারা তাকে ঘিরে আছে, আব কত ফুটকি, এবার বুঝেছ তো!

হ্যাঁ ফুটকি, ফুটকি তো ঝিলিক মারে।

গল্পটা বলতে গিয়ে কোন দিকে ঘুরে গেল! তোমাকে বোঝাচ্ছি। ফুটকির আলো আমার ঠাক্‌মার রং চেহারা এমন পাল্টে দিল, দাদু এসে বলল, 'ঐ ক্ষান্ত বুড়ি দিদি শাশুড়ী পালা, পালা'।

আরে কত কি হলো! সারা সুপুরি নারকেল গাছের পাতার রং, নারকেল থেকে ছিট্‌কে আসা রং পুরো বাড়ির চৌহদ্দী এমন পাল্টে দিল, সেই দাদু সাত চক্কর খেয়েও নিজের বাড়ি খুঁজে পেল না।

কী হলো তারপর!

শেষে নয়ানজুলির ধারে খেজুর গাছের নিচে দাদু ভাগ্যিস উবুর হয়ে ছিল। তাইতে না সবাই চিনতে পারল!

ফুটকিটা কি এখনও আছে চরণদাদু?

ওতো সময়ে সময়ে আসে, আবার কবে আসবে, কে বলতে পারে!

টায়ারটা ঝুলছে দেখে নয়ন বলল, দেখেছ লোকের কারবার!

কেন্ন কি হয়েছে?

ভালো কারবার চলতেছে, তো বঝলুম।

চরণদাদু হেসে বলল, 'পারোও বটে।'

টায়ারের কারবারটা নতুন গজিয়েছে কিনা। সাইকেল দেখছ না, সব স্কুলের ছেলেমেয়েদের, ছ'খানা বাংলা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। সামনে কোলে বসিয়ে ক্রিং ক্রিং আওয়াজ করে সকাল সকাল—আরে তুমি তো বলেই খালাস, দিদিমণির গাল তো শোন নি, দুদিনের বেশি হলে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। সাইকেলের চাহিদা দেখলে, কাল যদি দেখ, আরো দু'একটা সাইকেল-বাইকের দোকান গজিয়ে গেছে, অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

সাইকেল নিয়ে তুমি তো গপ্পো ফাঁদলে, এখন মোটর সাইকেল-এর কথা বল। কাঁচা পয়সা ওস্তাগারদের, ছেলেরা তো মেয়েগুলোকে সামনে বসিয়ে দেয় হাঁক—এক একটা যেন হিন্দী ছবির অ্যাকশন হিরো। সোঁ সোঁ-ফুড়ুত, চুলের ভাঁজ দুলছে পাহাড়ি নদীর ঢেউয়ের মতো গোত্তা খেয়ে, মেয়েটা দু'হাতে কোমড় জড়িয়ে কি সুখ যে পায়—বিলিতি

সুখ, এমন সুখ তোমার আমার কালে ছিল না।

সেটা বলছ নয়ন ভালো কথা। উন্নতি কি হয়েছে বলে তুমি মনে কর! একবার তো তাকিয়ে দেখ, চারধারে রাস্তায় কুকুরের মতো জঙ্গল সব পাখনা মেলে আছে, ধরতে যাও, ধরতে পারবে না, কোন কাজেও আসবে না, মশা মাছি রাতদুপুরের বন বন করে, বাজে তো বাজতেই থাকে বেসুরো আওয়াজ।

কী করবে চরণদাদু, কার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবে, বল?

কৈফিয়ৎ এর কথায় গুলি মার, আমাদের নিজেদের একটু বিবেক বুদ্ধি নেই। দেখলে তো গতবছরের জলে তোমার আমার ঘর ডুবল। চেঁচাল। মানুষ অনেক করে চেঁচাল, শেষে কি হ'ল, মোড়ের মাথায় কার্ত্তিকদের চায়ের দোকানের নিচে ড্রেনের খোঁদলে যে জমা হয়েছে খুরি আর প্লাস্টিকের পিরামিড, ঐ ছাইভস্ম জঞ্জাল সরাতেই তো নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হবার জোগাড়। তাহলে কী বলবে! কারও খেয়াল আছে, ঐ কালো জল কীভাবে সাদা হবে? জলের উপর মাচা করে তো আছে, আর ঐ গু-ফেলছে দিনরাত, সেটা শুঁকে শুঁকেই শরীরে মরচে ধরছে, এমন জং যতই তারপিন দিয়ে ঘষ, জীবনে উঠবে না।

চোদ্দ

চলুক এবার গড়গড়িয়ে

জল চুঁয়ে পড়ছে টিনের চালায়, গড়িয়ে পায়ের কাছে, রোদ একটু মাঝে মাঝে, হাসতে হাসতে মেঘের আড়ালে খেলছে লুকোচুরি। খেলছে খেলুক, ব্যাঙ মোতা জল তো থামে নি—ঘ্যাঙর ঘ্যাং।

এ-আর সত্যি হয় না। শালার ব্যাঙগুলো ডাকে যখন সবই একসঙ্গে জান ফুলিয়ে ডাকে। কারও দরদ বোঝে! শালা-মাষ্টার যে কত কড়া ওরা কি বোঝে, অমিতা থেমেই আবার কী বোর্ডে হাত রাখে—ঝটাঝট্, স্যাটাস্যাট্, টাইপের গতি সময়কে তুড়ি মেরে বলতে যায়, কিন্তু কে কার কথা শোনে; মন আর শব্দ আর আঙুলের ভাব ভালোবাসা তুঙ্গে উঠলে তবে তো জমবে, মনের কথার ফাতনা নড়বে।

বুঝলে চরণদাদু, ব্যাঙগুলোকে পেলে জিব টেনে ছিঁড়ে দিতুম।

শুধু ছিঁড়বি কেন, ভোজ খাবি।

ওয়াক থু।

চিনারা ব্যাঙ খায়, অন্যের খাওয়া নিয়ে এমন নিন্দে।

ওরা তো সাপও খায়।

আমরাও তো কুঁচো খাই, ও নির্বিষ সাপ ছাড়া আর কি?

ঠিক আছে বাবা বলে ঘাট হয়েছে।

অমিতা টাইপ মেশিনটা ঝক্কাশ শব্দ করে এপাশ থেকে ওপাশে নেয়।

শুধু ব্যাঙের দোষ দিয়ে কি হবে, শর্টহ্যান্ড মাষ্টারটা কি করছে।

কেন কি হয়েছে?

এই বেলা তোমার কানে তালা লাগে না, এ্যাঁ...... চ্যাঁ...... গ্যাঁ...... ব্যাঁ শব্দের বান ছুঁড়ছে, কানের ভিতর দিয়ে যেন মরমে পৌঁছে দেবে, মুগুর ভাজবে সে-ও ভালো।

লোকটার চেষ্টা আছে চরণদাদু, কত লোকই তো করে কর্মে খাচ্ছে।

অমিতা আবারও একটা হ্যাঁচকাটান মারে ডানদিক থেকে বাঁদিকে আবার শর্টকাটে পিয়ানো বাজানোর মতো শব্দের ঝড় ওঠায়। চরণদাদু কাগজের বান্ডেলটা থলে থেকে নিয়ে টেবিলের উপর রাখে, ডিকটেশান দেয়।

মাননীয় রাষ্ট্রপতি,

সমস্যার গতিমুখ নানা দিকে মুখ বের করেছে, যে পত্রটা আগে লিখেছিলাম, সবকথা সঠিকভাবে বলা সম্ভব হয় নি নানা কারণে, আমার অনুভবে যেভাবে ব্যক্ত করতে চেয়েছিলাম, সেভাবে বলা হয়ে ওঠে নি। এখন আমি প্রস্তুত, সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করে।

ভারতবর্ষের হাজার হাজার সাধারণ গ্রাম্য স্কুলের মতোই শত ছিন্ন চেহারার খুবই নিম্নবিত্ত পরিবারের ছাত্রীদের নিয়ে গড়া এক আধা সরকারি স্কুলের শিক্ষক আজিজুল। মিশ্র ধর্মের একই ভাষার ছাত্রীদের অনুশীলনে কোন খামতি নেই। প্রসঙ্গতঃ প্রথম প্রজন্মের মুসলিম পরিবারের ছাত্রীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় স্কুলটা যেন এক নতুন আনন্দের তীর্থভূমি। এমন একটা স্কুল যাকে ঘিরে প্রস্রবণের মতোই নতুন নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের জন্ম নিয়ে চলেছে। অনেক প্রচেষ্টার পরেও এই স্কুলকে অসাধু রাজনৈতিক বাতাবরণ থেকে মুক্ত করা যায় নি। যে রাজনীতির কথা আমি বলতে চাইছি তার অন্য একটা রং আছে, যা তথাকথিত রাজনৈতিক রং থেকে আলাদা। এ রং-এর স্বরূপ সন্ধান এখনও আমার পক্ষে করা সম্ভব হয় নি। আপনার মনেও আমার কথা শুনে নানা প্রশ্নের জন্ম নিচ্ছে আমার অস্তিত্ব নিয়ে, এ আমার স্থির বিশ্বাস। আমার যদিও অন্য একটা নথিভুক্ত নাম আছে কিন্তু আমার আসল পরিচয়, হ্যাঁ এটাই আমার একমাত্র পরিচয়, যে পরিচয়ে আমি বাঁচার আনন্দ অনুভব করি—চরণদাদু, মানুষের ভালোবাসার ছোট্ট ছোট্ট স্বর দিয়ে গড়া এই নাম এখন আর আমার নিজের নয়, প্রকৃতই অন্য মানুষের। এই অঞ্চলের শত শত মানুষের কাছে আমার অস্তিত্ব এইভাবেই ধরা পড়েছে। আমি নিশ্চিত যে আমি ওদের এই ভালোবাসার নামের অপব্যবহার কখনও করিনি, করবও না। আমার সমস্যা নিরসনের খিদেটা এই ভালোবাসায় শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

পূর্বেও এই ভূমিকায় আমি নানা পত্র আপনার অবগতির জন্য পাঠিয়েছি, তার হালকা ও সদর্থক একটামাত্র পত্রের ছোট জবাব পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি, সমস্যাকীর্ণ আমার অঞ্চলের মানুষও আপনার দৃষ্টির উজ্জ্বল আলোয় ধরা পড়েছে। কেন জানি না, এই জানানোর প্রয়োজনটা বোধ হয় এই কারণে যে এই আপাত নিরীহ মানুষগুলো এখন জাতীয় ভাবের মাত্রায় জায়গা পায় নি। আপনার বিশ্বাসের মাত্রা অন্যরকম হতে পারে।

সমস্যার সমাধানের উপায় ও আপনার আলোকপাত আমাকে সমস্যার গভীরে যেতে সাহায্য করবে বলেই এই পত্র। পত্রের সঙ্গে মানুষের কথাই জানালাম, এটা আমার শ্রদ্ধার্ঘ জানবেন।

ধন্যবাদান্তে
আপনার একান্ত বিশ্বাস ভাজন,
চরণদাদু

ও, এইখানেই তো চরণদাদু।

কে তোমরা?

কে যেন ওদের চিনিয়ে দিয়ে চলে গেল, ওরা ভেবেছিল চরণদাদু তাতে ব্যাক গিয়ার মারবে:

কি হে জাবেদ, ওদের চেন? চিনি না কিন্তু ওরা ওই জামড়িতলায় এসে কদ্দিন ধরে ঘোরাঘুরি করছে, চমকাচ্ছে। চমকানোটাই ওদের পেশা, ওরা মাসোহারা পায়। ওদের কেউ এসে পছন্দ করে যায়, মোটা টাকার লেনদেন চলে, কেতাবী নাম প্রাইভেট কনসালটেন্ট। কখন কিভাবে হুজ্জতি করতে হবে, গোলমাল পাকাতে হবে, কঁ্যাচাল করতে হবে, ওরা ওই ব্যাপারে ষোল আনা বিশেষজ্ঞ।

চরণদাদু নিজেকে ওদের উল্টোপিঠে বসিয়ে দেয়, আর হোঃ হোঃ করে হাসে।

হাসলেন যে বড় চরণদাদু।

অত কথা তুমি বুঝবে না জাবেদ। আসলে তোমার আমার এক জায়গায় মিল আছে। সমাজে কিছু কিছু মানুষ আছে যারা কিছু করবে বলেই নিজেদের জড়িয়ে ফেলে।

ঠিকই বলেছেন চরণদাদু।

বাড়ি ছিল আমার দক্ষিণ দিনাজপুর। মা-বাবাকে ছেড়ে এসে এখানে থিতু হয়ে ভাবলাম, কি আর করব। শেষে ডাক্তার দিদিই বলল, জাবেদ লেগে পড়।

কেমন লাগছে, তোমার নার্সিংহোম?

এখন যেন একটু আধুটু পেশাদার, পেশাদার লাগে।

কাজকর্ম শিখে ফেলেছ বুঝি।

হ্যাঁ প্রথমে লোকে ডাক্তার ডাক্তার বললে লজ্জা লাগত, ভাবতাম কিছু না জেনে ফেলে ডাক্তার সম্বোধন শোনাটা বেসুরো লাগে।

কি শিখলে এখন?

শুনলে তাজ্জব বনে যাবেন। মা-বোনদের ডেলিভারিতে হাত বাটানো থেকে শুরু করে কেথিটার পরানো আর খোলা, সেলাইন পুশ করা, ইঞ্জেকশান, ব্লাড টানা এসব এখন আমার কাছে জলভাত। তবে একটু অসুবিধার কথা বলি চরণদাদু, মাঝে মাঝে নিজের সমাজের লোকদের কাছ থেকে নানা কথা শুনতে হয়, বলে মুসলমানের ছাওয়াল হয়ে এসব কাজে হাত লাগাচ্ছো, এ-তো ভালো কথা নয়।

তাহলে ভারি মুস্কিলে পড়েছ বলো জাবেদ।

না। বুঝিয়ে বলি, 'দেখেছ এসব করলি তোমাদের বিপদের দিনে তো কাজে নাগতি পারব।'

চরণদাদু চেয়ারটা টেনে দিয়ে বলে, 'বসো জাবেদ। না, এখন তো তোমাদের বর্ণের মেয়েরা স্কুলে আসছে, এ-তো ভালো লক্ষণ।'

হ্যাঁ চরণদাদু, আমার বউই তো বি.এ. পাশ, রং কালো দেখে প্রথমে কিন্তু কিন্তু লেগেছিল, পরে পরে ওর গুণই ওকে নতুন করে চিনতে শেখাল। আমার মেয়েকেও নার্সারিতে ভর্তি করে দিয়েছি। আমাকে বলে, 'আব্বু, বলতো এ.বি.সি.ডি.ই.', বড্ড ছটফটে হয়েছে। বকাঝকা করলে খিলখিলিয়ে হাসে। পুঁটি মাছের মতো খলবলিয়ে ওঠে। ভাবখানা এমন, বকাঝকা আবার করবে কি!

তোমার মেয়ে তো ভারি মিষ্টি দুষ্টু।

জাবেদ-এর মুখটা মেয়ের প্রশংসায় খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে।

আমাদের সমাজের মেয়েদের তো আবার এত স্বাধীনতা নেই।

মোল্লা মৌলবীদের বলি, 'আরে বাপজানেরা এখন তো সমাজটা পাল্টেছে, সময়ও পাল্টেছে, গোঁড়ামিটা এবার কিছু কিছু ছাড়ান দাও দিখিনি।'

তক্ষুনি ওরা কটমটিয়ে তাকা। বলে, 'ও হিন্দু পাড়ায় দু'দিন যাতায়াত করে বেশি শিখে ফেইলেছিস, সেদিনের ছাওয়াল, বাপের সামনে মুরুব্বিদের জ্ঞান দিতে নেইগেছো। আরে এই নিয়ম কি মোরা বাইনেছি, পিঁড়ির পর পিঁড়ি চইলে আসতেছে অমনি অমনি।'

'তাহলে তোমরা যুক্তি খুঁজবে না!'

'বড় যুক্তি মাড়াস না তো আর, ধর্মের সঙ্গে আবেগের যোগ আছে, সেটা মানিস তো; আবেগ আবার যুক্তি মানে!'

কথা শুনে থ মেরে যাই। 'সমাজের যা-তা ক্ষতি করবে, আর এভাবে আবেগ বলে চালাবে, যুক্তি মানবে নি! সকলের মত নিয়েই তো মত!'

তুই এত কথা শিখলি কেমন করে জাবেদ!

জাবেদ বিদ্যার প্রশংসায় হাসে। পকেট থেকে চিরুনিটা বের করে আঁচড়ে নেয়, আজকাল আবার চুলে কালী মেহেন্দি করে, কালো কুচকুচে লাগে।

জাবেদ কথা বলাবলি করতে ভালোবাসে। যদি প্রশ্ন করা হয়, জাবেদ তুই এত বকিস কেন রে?

আরে চরণদাদু, চল্লিশের ধাক্কা, মোর বাপও বকতি বকতি মরে গেল, দরবেশ গোছের লোক ছিল, কোন অন্যায় কখনও করে নি। ঠিক আজিজুল ভাই-এর মতো।

চরণদাদু বলতে গিয়েও ঢোক গেলে।

শুনেছি, স্কুল কমিটির লোকজন আজিজুলের পেছনে লেগেছে শুধুমুধু, বদনাম ছড়াচ্ছে, এ-কাজটা ওরা ভালো করতেছে না। ফল ভুগতি হবে।

চরণদাদু জাবেদ-এর কথায় ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়। পথ যেন খুঁজে বের করতেই হবে, এ যেন পথের বুক চিড়ে হনুমানের বিশল্যকরণী পর্বত তুলে নিয়ে আসা।

তাও যদি আজিজুলকে ওদের খপ্পর থেকে বাঁচানো যায়!

না, চরণদাদু কারও সাহায্য নেবে না, নিজের মগজটাকে ব্যবহার করেই ও সকল বাঁধা দূর করে দেবে। আলোর রেখা ছায়া কামড়ে কমার্শিয়াল স্কুলের বরান্দায় এসে ঢুকতে চায়, চরণদাদুর পায়ের কাছে ঘোরাফেরা করে। চরণদাদু চিঠিখানা ভালো করে আরও দু'তিনবার দেখে নেয়।

এই দুটো বানান ভুল আছে।

দিলি তো মাটি করে, ভাবলাম রাষ্ট্রপতিকে নির্ভুল চিঠি পাঠাবো।

ঠিক আছে আমি আবার টাইপ করে দিচ্ছি।

আমার খুতখুতুনির জন্য তুই আবার......।

তোমার নিজের বলে কিছু আছে চরণদাদু, তুমি তো আমাদের হয়েই কথা বলছ আর আমি এইটুকুনি কষ্ট করতে পারব না!

জাবেদ তার হাত ব্যাগটা খুলে কি যেন বের করে।

কী হবে পাসপোর্ট দিয়ে জাবেদ।

একবার ভাবছি ওপার বাংলায় যাবো, দেশটা দেখার আমার বড় সখ। দু'দুটো বাংলা, অন্যটা না দেখলে দেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে না।

ঠিক ঠিক, তাহলে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাস।

জাবেদ মাথা নাড়ে, বাতাসের দোলায় ডালটা নড়েচড়ে উঠলে গন্ধরাজ ফুলগুলো মুহূর্তেই নেচে নেচে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে ফুলের বিছানা তৈরি করে। জাবেদ ফুলের গন্ধে বিবশ হয়ে ওখানেই বসে পড়ে। জোহরের নামাজ মসজিদের অঙ্গন টপকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে ফুলের মতোই বিবশ করে দেয়। মোয়াজ্জেন এর গলার স্বর আজানেরই উল্টো পিঠ যেন।

পনের

পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন

চরণদাদু লাঠিটা নামিয়ে আমগাছের নিচে চাতালে পা ছড়িয়ে বসে। অনেকটা পথ উড়ে ক্লান্ত পাখিটা জলে ঠোঁট ভিজিয়ে নিতে বিলের পাড়ে এসে বসে যেমনি করে, চরণদাদু জিবটা চেটে নিয়ে জিবের জলেই তৃষ্ণা মেটায়।

রাম রাম চরণদাদু।

কি হে নগেন ঠাকুর, আজ কটা বাড়ি পূজো করলে। বয়সের ভারে আর পেরে উঠছি না।

ছেলে যখন চাকরি বাকরি করছে, এখন এসব পূজো আচ্চা ছেড়ে দিলেই তো পার, নিয়মরক্ষায় দেবতা পূজো বই তো নয়, অন্যের হয়ে দক্ষিণা নিয়ে আর কতই-বা নিজে ডাকবে!

পারি, ঐ এক অভ্যাস; তবুও তো দৌড়ঝাঁপ হচ্ছে, বসে পড়লে যে শরীরটাতেও ধ্বস নামবে, চাকরিওয়ালা বাবুলোকদের রিটায়ার করে ঘরে বসে গেলে যেমনটা হয়। তাছাড়া সবাই কি আপনার মতো চরণদাদু, দিনরাত দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন, পারেনও বটে, তো আজ কোনদিকে।

আজ একটু গণিপুর গেছিলাম। মানুষগুলোর সঙ্গে কথা না বললে পেটের ভাত হজম হয় না।

বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছেন, ঘরে গিন্নি নেই।

চরণদাদু কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে যায়।

সুজাতা যে এমন করে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরবে, ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেন নি। ভেবেছিলেন মেয়ে বৌ চলে যাবার পর মানুষের সেবাতেই কাটিয়ে দেবেন. কিন্তু কোথাও যেন অতৃপ্তি, কারও প্রতি একটু আধটু চোরাটান, নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিতেও মনে হয় অন্য কেউ একটু আধটু অধিকারের দাবি নিয়ে হাত বাড়িয়ে আছে, যদিও চরণদাদু নিজে জানে এই শরীর আর মন ওর একান্তই নিজের, নিজের মতো করে গড়েপিঠে নিতে পারলেই কোন সিদ্ধান্তে গড়মিল হয় না, না হলে যে প্রতি পদে ভয়, উৎকণ্ঠা আর বিপদ।

আপনি সাধুসজ্জন মানুষ, তাই এরকমটা হয়।

নগেনঠাকুর, তুমি করো পুজো-আচ্চা আর আমি হলেম গিয়ে সাধু, এ যে দেখছি, একেবারে উল্টোপুরাণ।

মন্ত্র পড়লেই কি আসল মানুষ হয় চরণদাদু!

না, নগেনঠাকুর, জীবনে কত ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, সে-তো দিনরাত জ্বালাতন করে মারে, বেরোতে পারলে তো ভালোই।

পারবেন, বলছি তো আপনি পারবেন, আপনার আধারটা যে সোনায় মোড়ান।

চরণদাদু এবার সত্যি সত্যি লজ্জায় পড়ে গেলেন।

দূর-অ মশাই পাপ পুণ্যটা তো চলতে চলতে শেখা, শিখতে শিখতে শুদ্ধ হওয়া, পাল্লায় ওজন করে মিলিয়ে নিন, ভার কোনটা, তাহলে বুঝবেন, জিতে গেছেন না হেরে গেছেন।

নগেনঠাকুর, তুমি এত সহজ করে এমন কঠিন কথা বললে, আমার যে কতদিনের চাপা ভারটা সরে গেল কী বলব!

লেগে পড়ুন, লেগে পড়ুন, আরও বেশি করে ডুব দিন, দেখবেন সব ধুয়ে মুছে গেছে, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, নিজেকেও পুষছেন, অন্যকেও মাথায় চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

নগেনঠাকুর, তোমার উপলব্ধির সত্যি সত্যি তারিফ করতে হয়, মন্ত্রই পড় নি শুধু, জীবনটাকে নিয়েও নাড়াচাড়া করেছ।

চরণদাদুর মনে খটকা লাগে, তবে কি একটা মানুষ নিজের বিশ্বাসের প্রতি স্থিত থাকলেই কিংবা যে কোন সত্যকে আঁকড়ে ধরলেই জীবনের অনেক রহস্যের কিনারা

করে দিতে পারে, করে দিতে পারে অনায়াসে অনেক ধাঁধার সমাধান।

নগেনঠাকুরের দীপ্তোজ্জ্বল মুখমন্ডলই কি সেই সাক্ষ্য বহন করে, তার নরম মন আর দৃঢ় ব্যক্তিত্বের মেলবন্ধনই কি চিনিয়ে দেয় অজানা রহস্যকে! তাহলে এত ছুটে বেড়ানোই-বা কেন? সরাসরি জিজ্ঞাসার পাতা উল্টে দিলেই তো হয়।

হৃদয় যেমন তালে তালে নাচে, সেই ড্রিম ড্রিম শব্দ যখন অন্য কারও বুকে বাজে, সেইখানেই কি শেষ হয় যাবতীয় উত্তর খোঁজা—নগেনঠাকুর কি বলে!

নগেন ঠাকুরকে যে এত কঠিন কঠিন প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে হবে তা আগে জানলে কি এই রাস্তা মাড়াতো!

নগেনঠাকুর চালকলা আর বাকি সব দক্ষিণার উপকরণ নিয়ে ব্যাগটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নেয়, এমন করে মাথার মাঝখানে রাখে, হোঁচট খেলেও ছিটকে না যায়।

এতটা পথ এই ঘাম ঝরা শরীরে যাবে কি করে! আজকাল পথ চলা ভার, কে কখন ছিনতাই করে নেবে, তখন সারাদিনের রোজগারপাতি না নিয়ে কী করে মুখ দেখাবে উপোষী মানুষগুলোকে!

চরণদাদু হতে তো পারলাম না, তাই ছা-পোষা সংসারী হয়েই সংসারের দায় মিঠাই।

সংসার যে কি করে চলে কে জানে! তবে যেটুকু দেওয়ার এই বয়সে; শেষ বেলায় ঝরে যাওয়ার আগে যতটুকু ছায়া ফেলা যায়, বয়ে যেন আনে বেঁচে থাকার নিশ্চিত আশ্বাস। ছেলেটা একটা প্লাস্টিকের কারখানায় হিসেব লেখার কাজ করে, রোজ আসে রোজ যায়, পয়সার বেলায় যত বায়নাক্কা। সরকার এখন আইন করে প্লাস্টিক বাতিল করেছে, বেকারের জ্বালা নিয়ে আবার নতুন চাকরি খোঁজা, শহরের অলিতে গলিতে যেখানে যেটুকু পরিচিতি ব্যবহার করে ধর্না দেওয়া, দাঁত বের করে, মুখ ছিটকায়, এ-মাগ্গিগণ্ডার বাজারে কে দেবে একটা সুযোগ, গলির মুখে এসে থমকে যায়, মনে হয় অন্য গলিটা ভারি অন্ধকার!

নগেনঠাকুর ছেলেটার চেহারায় এক ভয়ঙ্কর হতাশা দেখতে পেয়েছিল; দেখেশুনে বাড়িয়ে দিয়েছিল যজমান সংখ্যা, দুটো একটা করে আজ সারাদিনের চাকরিই বলা যায়, দক্ষিণাও মন্দ নয়, এক মাড়োয়ারি বাড়ির গৃহদেবতার রোজকার পুজো সেরে আসা।

পণ্ডিত রামশঙ্কর ছিল নগেন ঠাকুরের গুরু। শুনিয়েছিল নানা গল্প। শ্যামবাজারে-এর গোপেশ্বর চক্রবর্তী মারা যাবার সময় তার মন্দিরের পূজারি ব্রাহ্মণকেই সর্বস্ব দান করে গেছিলেন, সোনাগয়না, কাঁস-পিতল কি নেই সেখানে, সব যেন রাতারাতি রাজা সেজে বসা, উজির সান্ত্রী শুধুই নেই, পায়ের উপর পা তুলে সুখের বাজনা বাজা, কে বলবি আয়, কোথায় ই আয়। সে ছুটবে যেখানে, দুনিয়া ছুটবে সেখানে।

নগেন কুরের চোখে একটা ঝিলিক মেরেছিল, কেউ বলেছিল খোঁজ, খুঁজলেই তো পাবে, না হলে ঘরে বসে বসে কলা চোষ।

ভাবনাটা গেঁড়ে বসেছিল, ছেলেকে কত সাধ্য সাধনা—চল্ বাপ ঐ লোমের চাকরি ছেড়ে পুরোহিতগিরীতে লেগে পড়, ভাগ্য খুলে যাবে।

রাজি হ'ল না, মাথায় শালগ্রাম শীলা আর পুটলি নিয়ে দোরে দোরে ঘোরা। বলে কিনা ওসব বস্তাপচা পুরনো মানুষ ঠকানোর রাস্তায় যাওয়ার আগে গলায় দড়ি দেব।

চরণদাদু বলেন তো সত্যি করে, এর মধ্যে মানুষ ঠকানোর কী আছে! মালিকের হয়ে প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানানো, বংশপরম্পরায় এ-আমাদের অধিকার, তাই তো মঙ্গলদীপ জ্বালানো, বিনিময়ে দু'চার পয়সা প্রাপ্তির ভাণ্ডারে। আজকালকার ছেলে, কথায় কথায় গোসসা, বললুম তুই না হয় জিনস্ প্যান্ট পরে যাবি, পুজোয় বসার আগে ধুতিটা গায়ে চড়িয়ে নিলেই তো হ'ল।

স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়, স্বপ্ন-বাস্তবের ধরাচূড়া থেকে অনেক অনেক দূরে গিয়ে লুকোচুরি খেলে। টিনের শেডে প্রবল বেগে জল পড়ে, সেই শব্দে নগেনঠাকুর স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে দিগ্‌ভ্রম হয়। এত যে কারখানা, এত যে জমি, কোথায় গেল সব সুযোগের সুলুক সন্ধান!

নগেনঠাকুর স্বপ্নে-দুঃস্বপ্নে ঘুরে ফিরে আসে—দু'টুকরো জমি, দু'কামরার ঘর, খাটা জয়েন্ট পায়খানা, কত মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানী, কত তার প্রোডাক্ট আর প্রোডাক্ট-এর রহস্য। এ-সব মিলেমিশে সন্তানের ভবিষ্যৎ-এর বীজ বুনে চলে।

চরণদাদু লোকটার চাওয়া-পাওয়া ধরে ফেলে। এত উদাসীন পথে পথে চলেও কোথাও জীবনের মায়াকে ছাড়তে না পারা। ছেলে নাকি একপ্রস্ত লাফও দিয়েছিল। মাদার ডেয়ারী থেকে মেট্রো ডেয়ারীর এজেন্টও হয়েছে। কত টাকা পয়সা যে নাড়ে-চাড়ে, আর পিছন ফিরে তাকানো নয়। এই কমিশনের টাকায় সংসার চালিয়ে, আরও কিছু একটা করে জাঁকিয়ে বসা।

বন্দোবস্ত করে ফেলেছি বাবা, ডান দিকে রত্নদীপ কমপ্লেক্স-এর একশ স্কোয়ার নেট জায়গাটা কিনেছিল এক বন্ধু, সেই সামান্য ভাড়ায় আপাতত ছেড়ে দেবে। আর কে পায়, এবার পৌঁছে যাবে সোনার কেল্লায়—জেরক্স মেশিন, এস.টি.ডি. বুথ, মোবাইল ফোন টেলি কনফারেন্স। স্বপ্নের তো কোন ছাদ প্রয়োজন হয় না, পাশাপাশি সেনবাবুর ছেলেরা দুধের কারবার করায় পুঁজিতে ডাহা ফ্লপ, দাঁত কামড়ে মাথা চুলকে, চুল খাড়া করে বাজারের এ-পাশ আর-ওপাশ। স্বপ্নটা আসতে না আসতেই মিলিয়ে যায়।

আর ব্যবসার লাইনে যাব না।

তাহলে!

সুইসাইড! রেলে গলা দেব।

শুকিয়ে যায় শুকনো লঙ্কার মতো নগেনঠাকুরের হৃদয়ের খাঁচাটা, এমন কথা ভুলেও ভাববে না বাপ। আমি তো আছি, আরও চার পাঁচটা যজমান ধরব। তুমি না বলেছিলে ঐরকমই যজমান ধরবে, টেঁসে যাওয়ার আগে, সব আমায় ঢেলে দিয়ে যাবে।

বাপ, ওটা গল্প বলেছিলাম, গল্প কি সবসময় সত্যি হয়।

ঐ চেষ্টাই কর।

চরণদাদু, হিংসে হয়, খুনের অভিলাষ জন্মায় আবার তত্ত্বকথাও মনের এ-প্রান্তে আসে, ওপ্রান্তে চলে যায়।

চরণদাদু নগেনঠাকুরকে খারাপ ভাবছিল, অসহায়তা ওকে যে পঙ্গু করে দিয়েছে, তারপর অন্য কিছু আশা করা বাড়তি চাওয়াই হবে।

এক্ষুনি বোধ হয় বৃষ্টি নামবে, মেঘ গুড়গুড়, ঝলকে ঝলকে আলোর দেউলিয়াপনা, হঠাৎ করে অনেক দূরের মেঘলা আঁধারকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া।

চরণদাদু আপনাকে নিয়ে লোকের চিন্তার অন্ত নেই।

কেন বাপু আমি আবার কি করলাম।

কি করলেন না! দুনিয়াদারি সব পাল্টে যাচ্ছে, আপনি কেন পাল্টাচ্ছেন না।

বেনামে গোডাউন বানাবে বলে জায়গা দখল নিয়েছে অমৃতসূদন সেন। বিধবা নিঃসন্তান বৃহস্পতি'র জায়গাটি ছিল শেষ অবলম্বন। বৃহস্পতি গলায় দড়ি দিয়েছে। অমৃতসূদন-এর লোকজন গা জ্বালা ধরানো হুমকি দিয়েছে, মাথা নোয়ায়নি বৃহস্পতি। স্বামীর ভিটে আঁকড়ে ভদ্রমহিলা বাঁচতে চেয়েছিল। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, কারও মুখে রা পর্যন্ত ছিল না।

চরণদাদু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

সর্বনাশ! আপনি এত খবর জানালেন কি করে?

আরে, আমার যজমান বাড়ির বউ ছিলেন ভদ্রমহিলা। বড্ড দয়ার শরীর ছিল মায়ের। স্বামী চলে যাওয়ার পর ছেলের শোকে শ্বশুরটাও চলে গেল। তারপর তো একা যুবতী মেয়ে থাকলে যা হয় তাই, ঘরে বাইরে সাবধানে পা ফেলা, পা ফসকে যাওয়ার জন্য সকল রকমের প্রতিষেধকই নিয়েছিল মা আমার, কিন্তু শেষরক্ষা হয় নি।

হ্যাঁ বেনামে গোডাউনের-এর কথা অল্পবিস্তর কানে এসেছে, কিন্তু এর সঙ্গে বিধবার যোগাযোগ জানতুম না।

জগা গুণ্ডাকে ফিট করেছিল অমৃতসূদন, ভেবেছিল ওখানেই খতম করে দেবে। পাড়ার লোকেরা টের পাওয়াতে ধ্বস্তাধস্তি'র মাঝে আর মেশিন বের করার সাহস দেখাল না।

কার জমি কে ভোগ করে! কে হয় কার ঘাতক!

এত অনাসৃষ্টি কাণ্ড ধর্মে সইবে না, চরণদাদু।

ধর্মকর্ম বুঝি না, নগেনঠাকুর, মানুষ রুখে না দাঁড়াতে পারলে ভগবানও পালিয়ে যাবে। নিজের ছেলেকে দিয়ে বুঝলেন না।

চরণদাদুর কথায় নগেন ঠাকুরের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগলেও মানুষের সোচ্চার হওয়ার কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় থাকল না। মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণার জবাব দেবে বলেই চরণদাদু তটস্থ থাকে, কিন্তু রক্তকণিকা এত দূষিত হলে তাতে যে বিষে বিষক্ষয় ছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই।

বৃহস্পতি'র হাতের কাছে বিষ চড়িয়ে দেবার মতো ব্যবস্থা ছিল না, স্নায়ুগুলো প্রতি

সময়ের বিন্দুতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছিল এমন করে, পুরো প্রক্রিয়াকেই বিনষ্ট করে মনের বিয়োগ ঘটিয়ে দেওয়াকেই সঠিক সিদ্ধান্ত মনে করেছিল। একটা সংসার শেষ হয়ে গেল চরণদাদু, আপনি অন্তত বৃহস্পতি'র আত্মার শান্তির জন্য কিছু একটা করুন।

ফতুয়ার পকেট থেকে কলমটা বের করে খচখচ করে কাগজের বান্ডিলটা থেকে সাদা একটা পৃষ্ঠা নিয়ে তারিখ অনুসারে খবরের শিরোনামের মতো হেডিং করে লিখল— বৃহস্পতির আত্মহত্যা—অমৃতসূদনের চক্রান্ত বনাম জগা গুণ্ডা।

নগেনঠাকুর লেখার বীজ বপন করে, ভারাক্রান্ত মনের মধ্যে আরও দুঃখকষ্টের বীজ বপন করে মধ্যগগনের সূর্যকে মাথায় করে চলতে শুরু করে।

সকল যন্ত্রণার ভার বয়ে চরণদাদু এখন নিজেই ক্লান্ত। মুক্তির উপায় ওর ক্ষমতার প্রাচীরের বাহিরে ঘোরাফেরা করে, তবুও ধরে ফেলতে চায়। ধরলে যদি মুক্তি মেলে।

নগেনঠাকুর থপথপিয়ে চলে গিয়ে রোদ খাওয়ার অভ্যাসটা রপ্ত করে। শরীরে নাকি মিলেছে তার অমৃতের স্বাদ। অমৃতের গুণে দূর, অনেক দূর দেখে ফেলে, ক্ষমতার এক অলৌকিক স্বাদ ওকে আলাদা করে দেয়। নগেন ঠাকুর মানুষকে টপকে গিয়ে দেবতার ছোঁয়ায় উদ্বেল হয়। তৃপ্তির ঢেকুর গলায় এসে আটকা পড়ে যায়, না হয় কত কিছুই না তুড়ি মেরে সমাধান.... বৃহস্পতি তো নস্যি।

আজিজুলকে নিয়ে চরণদাদুর চিন্তার অন্ত নেই। ওরকম তেজিয়ান লোকটা ঘটনার তাণ্ডবে মাটিতে মিশে গেল। এতগুলো লোকের চক্রান্ত সামাল দেওয়া কি চাট্টিখানি কথা, কথা যখন বাতাসে ভাসে, ফুরফুর করে সেই হাওয়া ভাইরাসের মতো রোমকূপে এসে ধাক্কা মারে, তিন সাগরের হাওয়া এসে সে জ্বালা জুড়োতে পারে না।

লোকগুলো এসেই যেন লুকিয়ে পড়ে। চরণদাদুর মনের খবর জানতে চায়। চরণদাদু লাঠিটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে খপ করে ধরে। এ-ও যেন এক পরোক্ষ সাবধানী সংকেত। পালিয়ে বাঁচলে তো ওদের রক্ষা নেই, রহস্যটা খুঁজে বের করবে বলেই তো এত আসা-যাওয়া, এত বাঁচা-মরার আবদার।

ষোল

সবে ত কলির সন্ধ্যে

চরণদাদু আর কেন?- এবার তো নিশানা ঠিক করে নাও। কাগজের বান্ডিলগুলো বাড়তেই থাকে। ভাঙা টেবিলটার উপর স্তূপাকৃতি রাবার ব্যান্ড, পেন স্ট্যান্ড, ডানপাশে সাজানো কতগুলো আইনসংক্রান্ত বই।

চরণদাদু কি গণপতিকে বেমালুম ভুলে গেল! সে-তো ভুলতেই চায়। ভুলে যাওয়াতেই তো নিজেকে নতুন করে চিনে নেওয়া। নতুন মানুষগুলোকে হৃদয়ের এক কোণে জায়গা করে দেওয়া।

গোঁ গোঁ, গাঁ গাঁ, ভোঁ ভোঁ সকল শব্দের জোরালো মিশেল চরণদাদু'র মনোনিবেশকে

ছিনিয়ে নেওয়ার যাবতীয় চক্রান্ত করে। নতুন কারখানার ভিত পুজো হয়েছে দুপুরবেলা, আনন্দের জের চলছে আরো অনেক সময় ধরে। নিজের খেলাতেই যেন ওদের আনন্দ, ওরা নিজের পৃথিবীতে রাজা, মন্ত্রী, সান্ত্রী, বিবাদী, বাদী, সাক্ষী, আসামী, নিজেরাই রায় দিয়ে জেতার আনন্দে লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি।

চরণদাদু কানে আঙুল দেয়, বাধ মানে, তুলো দিয়ে কলম ধরে, মনের মতো শব্দগুলো বুদ্বুদের মতো ওঠে, আবার হারিয়ে যায়, মনের মতো কথা, যন্ত্রণার আকার। রং রূপে মিলিয়ে দিতে গেলে কতটা নিংড়ে দিতে হয়, বুঝবে না কেউই।

কে রে? দৌড়চ্ছে সুজাতা?

তোমার কানে বাজে বুঝি!

বাজবে তো বটেই। বাজনাটা যখন সকল পাড়া জাগিয়ে মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে আতঙ্কের বোমা ফাটিয়ে যায়।

ওঃ তাও তুমি টের পেয়ে গেলে।

ভাবছিলাম, দরজা জানালা বন্ধ রয়েছে, পৌছবে না তোমার কানে। শাড়ির আঁচলটা বুকের কাছ থেকে ভাঁজ করে পেছনে ফেলে দেয়। হাতের সোনালি হারটা একটু দুলে ওঠে, ও বিছানা এদিক-ওদিক টেনে দেওয়ার তালে তাল মেলায়। বিধবার তো সিঁদুর পরতে নেই। সখ তো হয় আবার সিঁথির মাঝখানে সিঁদুরের রেখা টেনে দিতে। ফর্সা টান টান গালে কোন ভেষজের কিংবা কেমিক্যাল কসমেটিক্স-এর ছোঁয়া লাগে নি; রূপের হাঁটে আগুন জ্বালানোর চেয়ে নিবিয়ে রাখলেই শতগুণ ভালো, দেখার লোকের নজর যখন নেই, তখন এসবের সাধ করে কি লাভ!

চরণদাদুর চোখ পড়েও যেন পড়ে না—তোর কপাল খারাপ রে সুজাতা, বরটা তোর তাড়াতাড়ি টিকিট কাটল, থাকলে বোধ হয় ভাগ্য খুলে যেত।

সুজাতা অনিরুদ্ধকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসে সংসার করতে চেয়েছিল, কথায় কথায় বলত, ধর কোনদিন যদি আমি পালিয়ে যাই।

সুজাতা ভাবত নেহাতই কথার কথা—হেঁয়ালি করেই উত্তর দিত—পালাবে আর কোথায়, একবার যখন গাঁটছড়া বেঁধেছ, চিরজনমের মতো বাঁধা পড়ে গেছ।

অনিরুদ্ধ হেসে বলত—বাপরে বাপ, এতটা বিশ্বাস তোমার মনে, আমার যদি এর সিকিভাগও থাকত।

সুজাতা মৃদু অভিমান করে মুখ ঘুরিয়ে রাখে—না গো না, তোমার মতো সুন্দরী বউ ঘরে রেখে কেউ কি পালাতে পারে!

এটা কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

এরকম খুনসুটি, ঠাট্টা ইর্য়াকি দুটিতে মিলে খুব জমত। এ-নিয়ে সুজাতা'র বন্ধুদের মধ্যেও একটা রেষারেষি চলত।

নিজের অগোছালো চুল কখনো সামনের দিকে টেনে নেয়, বালিশে ওয়াড় পরাতে গিয়ে বলে—শরীরের যা ধর্ম সে তো তা করবেই, সেখানে মানুষের আর হাত কি,

ভগবানের এখানে হস্তক্ষেপ চলে না, তা তার নিজের ধর্ম মেনেই দক্ষিণের বায়ুর মতোই তৈরি হয়ে আসে, কারও কথা সে শোনে না।

কি শোনে না সুজাতা?

কিছু না।

আরে কিছু একটা বলছ, বটে। তুমি এমন হয়েছ না চরণদাদু, না শুনে কিছুতেই ছাড়বে না।

এ তো আমার স্বভাব রে!

তবে শোন, শরীরটা গোলমাল পাকাচ্ছে।

কেন তোর আবার শরীর খারাপ করল কবে?

আচ্ছা তোমার লজ্জা করে না, এ-কথা বলছ, দূর সম্পর্কের হলেও তো আত্মীয়!

হাসালি সুজাতা, তোব সঙ্গে কবে আবার আমি এই আত্মীয়তা খেলেছি।

মানলে ভালো করতে, নানা জনে নানা কথা বলে।

লোকের মুখ কি করে চাপা দিতে হয়, সে তো তোর ভালোই জানা আছে।

গিয়ে ঝামা ঘসে দিয়ে আসব ঐ অলপ্পেয়েদের মুখে।

এসব কথা থাক, একটা সত্যি কথা বলবে, আমাদের সম্পর্কটা ঠিক কি!

জানি না।

কিছু একটা তো বটে।

এই দু'জন মানুষ একে অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে চলা। তোর দিদি চলে গেল, তুই স্বামী হারালি, দু'জন দুর্ভাগা মানুষের সম্পর্ক যা হয় তাই।

পরিষ্কার করে কিছু বললে না তো, বলতে তোমাকে হবেই একদিন। কিসের শব্দ!

শব্দটা কিছুক্ষণ থেমে গিয়ে উত্তরের বাঁশবন ফেলে দক্ষিণের নন্দদের লজেন্স কারখানার দিকে চলে যাচ্ছে।

মনে হয় গুলির শব্দ, সঙ্গে বোম বৃষ্টি।

এই বোমা কিসের জন্য, মতাদর্শের লড়াই!

ক্ষেপেছিস, তাহলে তো দেশে আমরা বিশ্বে এক নম্বর হতাম।

আখের গোছাবার লড়াই। ওরা রাস্তায় নেমে করছে আর ভদ্রলোকেরা মুখোশের আড়ালে করে, টেবিলের নিচে কাজ কারবার চলে, কোনাকুনিতে ফন্দি আঁটে। কি ঠিক বলি নি!

আবার একটা গুলির শব্দ হল।

বুঝলে চরণদাদু এতক্ষণে বোধ হয় আর একটা লাশ পড়ে গেল। একটা বোমার শব্দ হ'ল, সামনের বাস স্ট্যান্ডের কাছেই। বিকেলেই দেখেছি কিছু ছেলে হাতে গলায় অনুকুল ঠাকুরের ছবি ঝুলিয়ে রোয়াব দেখিয়ে একে ওকে শাসাচ্ছিল। আমি চোখ রাঙানোয় ক্ষণেক গজর গজর করে বলল, 'চরণদাদু, এটা কিন্তু ঠিক হ'ল না, দেখে নেব।' সেই হিসেব কিতেব চুকাতেই কি এতটা হুজ্জতি করা।

কে একজন দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল—চরণদাদু, মন্টুর দোকানের সামনের একজন মার্ডার হয়ে গেছে।

কে সে?

ঐ নন্দদের কর্মচারী।

কেন সরিয়ে দিল!

হিসেব তো সোজা, ভাগ-বাটোয়ারার গোলমাল।

সে তো দু'দল অ্যান্টি-সোস্যাল-এর লড়াই, বিষ্ণু সামন্তে'র ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী।

ঐ বিষ্ণু সামন্তের সঙ্গে নন্দদের কর্মচারীর কি সম্পর্ক!

কার সঙ্গে যে কার কোন্ সম্বন্ধ জুড়ে আছে, কে বলতে পারে! এ যে পি.সি. সরকার-এর যাদুর চেয়েও মজাদার সাসপেন্সে ভরা।

দেখ দেখি, ব্যাপারটা কোথায় থেকে কোথায় গড়িয়ে গেল।

বিষ্ণু সামন্তদের সঙ্গে সুবোধ চৌধুরীদের রয়েছে চোরা আঁতাত।

সেই শক্তিতেই ওরা ঈশ্বরীতলা, গণিপুর, রায়দিঘির কোনে কোনে এক রাতের অন্ধকারে অ্যাকশান চালায়।

কিন্তু চরণদাদু, কি মনে করে ওরা আমাদের বাড়ির দিকে তাক করল। সেই রহস্য তো আমার কাছে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে! অ্যাসিড টেস্ট করা যায়। যদিও একশ পার্সেন্ট সুযোগ রয়েছে জিতে যাওয়ার।

বোমাটা এবার ঠিক চরণদাদুর ঘরের কাছেই এসে পড়ল। চরণদাদু নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়।

তুই এতটুকু ঘাবড়াসনা সুজাতা, এদের শায়েস্তা করার মন্ত্র আমার জানা।

চরণদাদু ওর লাইসেন্সড রিভলবার নিয়ে বাইরে এসে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে।

এতক্ষণ যাদের হম্বিতম্বি, গালাগাল শোনা যাচ্ছিল, সকলে যেন চুপ মেরে গেল। চারদিকে অসম্ভব এক ভয়াল নিস্তব্ধতা।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চরণদাদু নিজের লেখার টেবিলে এসে বসে। মাথায় এখন অনেক দুশ্চিন্তা যেন চেপে বসেছে। এই আক্রমণের কারণটা অনুমান করলেও পুরো ঘটনার জন্য একটা লোক এসে এক-পাও এগোবে না।

একেই বলে প্রতিবেশী! একেই বলে সভ্যতা!

সুজাতা চরণদাদুর কথার আমল দেয় না। ও জানে এমনটাই ঘটে। এমনটাই ঘটবে, এর ব্যতিক্রম হওয়াই অস্বাভাবিক ও অবাস্তব চিন্তা!

সুজাতা নিজের ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে মাথায় হাত রাখে।

ওহে সমাজসেবক সব চিন্তা একসঙ্গে করলে কি চলবে, সারা রাত যে পড়ে রইল, চল খাবে চল।

বাধ্য শিশুর মতো চরণদাদু খাবার টেবিলে গিয়ে বসে, বাইরে তখন দু'একটা চামচিকে লাফালাফি, দাপাদাপি, সঙ্গে দু'চার পিস আরশোলা আর টিকটিকির চোর-পুলিশ খেলা।

'আর একটু ভাত দিই'. চরণদাদু কথাটা শুনেই সুজাতা'র মুখের দিকে চেয়ে রইল, যেন বৃষ্টি এসে কখন গোপনে বাসা বেঁধেছে—রিমঝিম রিমঝিম।

সতের

অবাক হয়ে ভাব নারে মন

লোক লস্কর নেই, যন্ত্রপাতি নেই, দু'খানি বড় বড় উনুন কতক্ষণ যে নিবে রয়েছে, কালো কালো ছাই এসে ঘিরে আছে গতকালের কালো দাগ। আম গাছের ডাল এসে ছুঁয়েছে টিনের চালের ঘর-খচ্ খচ্। আমে-দুধে গলাগলি, দুলালের মা এসে চুপচাপ বসে গেছে, কিছুক্ষণ বাদেই আবার সোচ্চার হচ্ছে, বুক ফাটা কান্নায়, বুক চাপড়ে মাথা নিচু করে ঠুকছে খোয়ার স্তূপে। চরণদাদু এসে দুলালের মায়ের পিঠে হাত রাখে।

সময় থাকতে সাবধান হলে না দিদি, ছেলে না হলে অসময়ে...... চরণদাদু'র কথা আধো আধো মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে।

বাবু ছেলে আমার কথা দিয়েছিল, দলে ভিড়বে না।

ছেলের চেহারাটা কল্পনায় ভাসিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে—এত সুন্দর ছেলের আমার কে অমন সব্বনাশ করল, সুখে থাকবে না ঐ ওলাওঠো, বংশ নিব্বংশ হবে, ভেদবমি হয়ে মরবে।

লোকজন যারা এমন একটা ঘটনায় দুঃখে আহাঃ উহুঃ করতে এসেছিল, তারা এসে টিপ্পনি কাটে— ঢ্যামনা মাগী—এমন ছাওয়াল পয়দা করে এখন নাকি কান্না কাঁদছে।

মাটি চাপড়ায় মেয়েটি— কি করেছে ছেলেটি আমার। ভগবান, তুমি কেন তুলে নিলে গো, আমাকে একটু দেখতে দিলে না, কালকেই তো ফোন করে আমাকে বলেছিল—মা আমাদের আর কোন দুঃখ থাকবে নি, ভেবেছিলুম এই ছেলে আমার সেয়ানা হয়েছে, লাইন ধরে নিয়েছে. দু'পয়সার এবার মুখ দেখেছে, তাই এত কথার নিশ্চিন্তি। মুখে কালসিটে দাগ পড়েছে মনোরমার।

মোটর বাইকে চড়ে দু-তিনটে ছেলে জড়াজড়ি করে এইমাত্র বেরিয়ে গেল, যাবার আগে ভিড়ের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে গেল থুথুর দলা।

কাসেম আজ বয়ামভর্তি করে লজেন্স নিয়ে গণিপুরে দু'নম্বর ওয়ার্ডে বিক্রি করবে বলে সকাল সকাল এসে হাজির হয়েছিল। কাল বিকেলেই তো দুলাল হাওড়া হাট থেকে চিনি রং আদা কিনে নিয়ে এসেছিল, আদা লজেন্স দশটা একটায় খুব খাচ্ছে।

ভিড় সরিয়ে পুলিশ এসে কাসিম আর নবকুমারকে শাসালো। জেরায় জেরবার করেও কোন কথা বের করতে না পারায় দু'চারবার লাঠিটা দিয়ে মাটি সরিয়ে সরিয়ে ব্যর্থতার ক্ষতিপূরণ করল। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলল—স্যার এভাবে হবে না, কান টানলে মাথা আসবে।

আচমকাই সবিতা খোয়াগুলো মুঠো মুঠো করে ভিড়ের দিকে ছুঁড়তে শুরু করে।

দু'এক পাক ঘুরে গিয়ে ওসি'র পা দুটো জড়িয়ে ধরে—সাহেব, আপনার পায়ে পড়ি, ছেলেকে একবারটি আমায় দেখতে দিন, মুখটা দেখে প্রাণ জুড়োই।

ওসি বনমালি একটু বিব্রত হয়ে হাত দুটো ছাড়াবার চেষ্টা করলো—ছাড়ুন দিদি, পা ছাড়ুন, দেখছি কি করা যায়।

চরণদাদু নিজের কান্নাটা হজম করার অভ্যাস রপ্ত করেছে বটে, কিন্তু অপরের রোদন শুনলে অস্থির হয়ে একবার এদিক দৌড়য় তো আর একবার ওদিক।

ওসি সাহেব কিছু একটা করুন, দোষীকে পরে বিচার করবেন, আগে ঐ মাকে ছেলের মুখটা একবার দেখিয়ে দিন, এই তো হবে তার শেষ দেখা। কথাটা শুনে সবিতা ডুকরে কাঁদে—বাবা গো, তোমরা আমার ছেলেকে কোথায় নিয়ে গেলে গো।

দুলালকে বাস স্ট্যান্ড থেকে কালী মোল্লার মোড় পর্যন্ত কে না চেনে। লজেন্স বিক্রি করার আগে ওর নানা ছড়াকাটা আর লজেন্সের গুণের ব্যাখ্যা বাবুলোকদের চমকে দেয়।

এই দুলাল, আজ কি এনেছিস বাবা।

ছেলেদের জন্য নবেঞ্চুস এনেছি, বৌমাদের জন্য ট্রফি, খেলে হবে চাঙ্গা, চার ছেলের বাপ, আর না খেলে বৌমাদের খিস্তি। এই বলে চারপাঁচটা লজেন্স হাতের মুঠোয় নিয়ে কিংবা একটা থালায় ঢেলে দেয়—বলেন দেখি কোকিল কোথায় ডিম পাড়ে, বললে একটা লজেন্স দিব। কেউ কেউ মাথা চুলকায়। এ প্রসঙ্গ ঘুরে গিয়ে প্রশ্ন করে, এখান থেকে যে কোন একটা লজেন্স তুলে নিন—যদি বৌদির ছবি খুঁজে পান, তবে এই থালার সব লজেন্স দিব।

এই বৌদি কে রে! দুলাল হেসে জবাব দেয়। শ্রীদেবী!

যদি কেউ পেয়ে যায়।

পাগল হয়েছ, কোথায় পাবে!

নেই বুঝি।

আছে, এটাই তো যাদু।

চরণদাদুও জানে। দুলাল ক্রিমিনাল!

ওসি সাহেব, কোথায় ভুল হচ্ছে না তো।

ভুল! ওর নামে পেটানো, হুজ্জতি আর দুটো চুরির দায়ে এফ. আই. আর. করা হয়েছে।

বলেন কি!

দুলাল-এর মাকে কি বলে যে সান্ত্বনা দেব!

বিষ্ণু সামন্তকে চেনেন?

ক্রিমিনালদের গুরু, দুলাল-এর এই ডিগ্রি পাওয়ার জন্যে ওর অবদান কোন অংশে কম নয়।

ভূপেশ বাবুদের পেছনে জঙ্গলে ঘেরা বাড়িটাই ওদের ডেরা। আঁধার নামলেই কালো কালো রাক্ষসগুলো দাপিয়ে বেড়ায়, হঠাৎই নারকেল, বাতাবি, জামরুল গাছটা পাগলের

মতো দুলতে শুরু করে। দিনের ছা-পোষা মানুষগুলো রাতের দৈত্য-দানো, ভাগাভাগি হাঁকাহাঁকি, কার গুদাম ফাঁকা করবে, জিব লকলক করে, রক্ত চলাচলের মাত্রা বেড়ে যায়—গুরু, টিকটিকিদের কাছে নাকি খবর আছে!

কোন ছুঁচোর বাচ্চা বলেছে, বল দেখি, এক গুলিতেই মাথার খুলি উড়িয়ে দেব, খরচা হয়ে যাবে, বাপের নামও ভুলে যাবে।

দুলাল আমতা আমতা করে, গুরু সুবোধ-এর লোকেরাই কাঠি নাড়ছে, ওদেরও নাকি টার্গেট ছিল।

বিষ্ণু দুলালের কানটা মূলে দেয়। এই কথাটা এখন বলা হচ্ছে। বেআদব, ছোট লোকের বাচ্চা, উল্লুক কোথাকার, বেল্লিক।

হাসান কাঁচুমাচু করে বলে, গুরু কালকের অ্যাকশানটা পিছিয়ে দাও।

না, কোনমতেই না, মালমশলা, প্ল্যান-প্রোগ্রাম সব তৈরি, ঐ গুদাম খালাস করে সে মাল কখন যাবে?

সে-সব ডায়মন্ডহারবার হয়ে চলে যাবে কাকদ্বীপ।

দুলালকেই আজকের অ্যাকশান-এর দায়িত্ব নিতে হবে।

ভয়ে ঠকঠক করে কেঁপে ওঠে দুলাল, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়।

গুরু, মা ছাড়া আমার কেউ নেই। মা কিছু জানে না। মুখ দেখাতে পারবে না।

সে দায়িত্ব আমার, তোর মার গায়ে কোন আঁচড় লাগবে না।

ওসি দুলাল-এর এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাওয়া নিথর শরীরটা'র কাছে সবিতাকে নিয়ে যায়।

ওসি সাহেব, এ-আমার ছেলের বডি নয়। তবে!

এই কে আছিস, সার্চ কর, আর কোন লাশ পড়ে আছে কিনা!

হ্যাঁ স্যার, আর একটা বডি দিঘির জলে ভেসে উঠেছে।

যাও, এক্ষুনি যাও, ওঠাবার ব্যবস্থা কর।

এতটা মিল হলো কি করে! অন্য গ্রুপে কারা কারা ছিল।

সুবোধ চৌধুরীও ঐ এল. পি. জি. গুদাম টার্গেট করেছিল, একই দিনে একই সময়ে দু'দলে।

তোমরা কি আঙুল চুষেছ? আমাদের ইনফর্মার-এর কাছে কোন খবর ছিল না! এই-ত এলাকা, এইটুকুনি কভার করতে তোমাদের কালঘাম ছুটে যাচ্ছে, অকম্মার ঢেঁকি, যত্তসব অকেজো লোকজন দিয়ে কাজ কারবার। এই জন্যই পুলিশ ডিপার্টমেন্ট নিয়ে এত লোকের এত অভিযোগ আর অবিশ্বাস।

চরণদাদু ঘটনার আকস্মিকতায় কোনও বিচলিত হয় না। সময়ের অন্তরে এখন শুরু হয়েছে নানা বাতাস, নানা গন্ধ। এই যে শুরু, তার শেষ কোথায়!

লোকজন নন্দকেই দায়ী করে।

কারখানাটা ঝিম মেরে পড়ে থাকে। এমনিতেই অনৈতিকভাবে এলাকার মাঝখানে কারখানা হওয়াতে লোকেরা ক্ষোভ ফেটে পড়তে চাইছিল, কোন উপযুক্ত ভূমির অভাবেই জড়সড় হয়ে যাচ্ছিল। এমন যে ঘটনা লোকের মনটাকে নাড়িয়ে দিল।

কী নন্দবাবু, এবার জবাব দিন, আপনার কর্মচারী এমন একটা কাজে জড়িয়ে পড়েছে আর আপনি ধোয়া তুলসি পাতা, এটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে!

নন্দবাবু কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে গিয়ে বলে, এই সময় কোথায় আপনারা ছেলেটার মাকে.......।

কথাটা শেষ না হতেই আওয়াজ উঠল, আহাঃ দরদ যেন উথলে উঠছে দেখছি, বোকা পেয়েছেন, এমনিতেই বেআইনি কাজ করেছেন, এ-যে দেখছি ভূতের মুখে রামনাম।

কলি কলি, ঘোরকলি, নন্দকেই এর জবাব দিতে হবে, খোঁজ নিয়ে দেখ, ওর হাত কত লম্বা।

পা-টা বাড়াতে গিয়েও কেন যে নড়তে চাইছে না, দু'একটা হনুমান এ-গাছ থেকে ও-গাছ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। রামভক্ত হনুমান ফিক করে দাঁত বের করে লাগোয়া একটা বাড়ির ছাদে চলে যায়।

ও হনুমান, কলা খাবি, জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি।

হনুমানটা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, লেজটা উঁচিয়ে ধরে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে দেয়। আনন্দ না উচ্ছ্বাস, না রাগ কোনটাই যেন বোঝা যায় না। ছানাটাকে বগলে চেপে ধরে চিঁ চিঁ চিৎকার করে।

আঠার

চোখের জলে বুক ভাসে

চরণদাদু মাঝে মাঝেই চোখের জল ফেলে, নোনা জলটা চোখের পাতা টপকে গড়গড়িয়ে পড়ে, পাতা দুটো ভিজে চৌসা আমের মতো হলে উনি নিজের চোখের জলের ফোঁটা হাতে নিয়ে ভাবতে থাকেন এ-বয়সে এ-ও সম্ভব!

সম্ভবকে অসম্ভব করার যে যাদু চরণদাদু রপ্ত করেছেন দক্ষ যাদুকরের মতো সে কল্পনা ঘুরে ফিরে বেড়ায় আপন খেয়ালে, বলে চরণদাদু, যত খুশি তুমি কাঁদ, সে ভার তোমার, কেঁদে কেটে হালকা হলে সকলের কথা ভাবার ভারটা নিজের কাঁধে তুলে নিতে ভুলো না।

কী-সব হযবরল ভাবনা, এতকাল ধরে তোমার সঙ্গ করলাম এই তুমি চিনলে।

চেনাচেনি দিয়ে কি হবে, মস্ত বড় ভাল্লুক এসে তোমার ঘরের সামনে মুখ নাড়ালে তাজা মানুষ ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে! মানুষের এ-দুর্মতিতে, মানুষের এ-দুর্দিনে চরণদাদু সামলে দিতে কসুর করে না।

লোকগুলো এমন কেন হয় বলতো সুজাতা, ভালোমন্দের হিসেব নিকেশ করতে

গিয়েও খেই হারিয়ে ফেলে।

সুজাতা একবার সোজাসুজি দেয়ালের গায়ে দৃষ্টি ফেলে যেখানে একটা রসালো ছায়া অনবরত নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে ; চরণদাদু মুখ বাড়ালে সুজাতা চমকে যায়—ও তুমি এখানে, আমি ভাবলাম কোন ছায়া গোপনে আমাদের কথা গিলে নিয়ে অনাসৃষ্টি কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে।

সুজাতা কি যেন বলতে গিয়েও থমকে গেল!

এমন ঘটনার রূপকার মানুষই ভেঙে চুরচুর করে দেয় তার গড়নকে।

সুজাতা এক পলক তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়, তাতে চরণদাদু'র কি এলো গেলো, গড়নের ধাঁচায় ফিরলে লোকজন এভাবে বুঁদ হয়ে থাকে।

বইয়ের ফাঁক ফোকরে ধুলোয় পড়েছিল যে ছবি দুটোয় সে-ও নামিয়ে দেখল। আসলে হৃদয়ের খাঁচায় এইভাবেই মাঝে মাঝে আগুন লাগে, কাছের মানুষের। সেই উত্তাপের আঁচে পুড়ে যাবার ভয়ে আড়ালে চলে আসে। সুযোগ পেয়ে বাকিরা পুড়ে শুদ্ধ হতে থাকে, এখনও অনেক অন্তর মোহিনীর মতো ঘুরে ঘুরে মরে।

চরণদাদু লাঠিটা উঁচিয়ে ধরে, কাগজের বাণ্ডিলটা গাডার দিয়ে মুড়িয়ে চুমু খায়। মরে যাওয়া, তিন মিনিটের কিংবা দেড় মিনিটের কিংবা আরও কমের খেলা, বেঁচে থাকার উপদ্রবকে সইতে না পেরে বলে—টা টা।

ঘরের বারান্দা টপকে নামতেই কুকুরটা লেজ দুলিয়ে গা-চাটে! চরণদাদু হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে মারার ভান করতেই কুকুরটা মুখ গলা বাঁকিয়ে পেছনে চলে আসে। শরীরটাকে ষোল আনা শ্বাসমুক্ত করে সামনে চলে এসে বলে, 'ঘেউ ঘেউ'।

সুজাতা ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, 'ও চরণদাদু যাবে না!'

বেশ তো যাবে না, তার জন্য এত কাণ্ড, গন্ধ শুঁকে শুঁকে কি বিপদের আঁচ পেয়ে এত দেউলিয়াপনা। মালিককে রক্ষা করার দায় তোর কাঁধে কেন? কুকুরটা আবারও ঘেউ ঘেউ করে।

ও মালিক বাঁচলে তুই বাঁচবি বলে।

ঘেউ ঘেউ!

ওরে বেটা, আবার বাঁদরামি....... মানুষকে বাঁচাবে বলে, মালিকের তোর এত কদর।

হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোতে কলম না ধরে তো উপায় নেই, আঁধার ঘিরে ধরেছে, কখন যে কারেন্ট গেছে, এখনও....... লোডশেডিং-এর মাঝে মাঝে এমন উপদ্রব। তা হবে নাই-বা কেন, চারপাশে যে ভাবে মানুষের ঢল নামছে, কত দামিদামি জিনিস—টি.ভি., ফ্রিজ, সি.ডি. মাইক্রোওভেন, টেপ রেকর্ডার, সুইচ মারলেই তো গপগপ করে কারেন্ট খায়, কে কার ঘরে যায়, এসব না থাকলে জীবন চলে! না-ছুটতে পারলে জীবনের কী বা দাম! দরকার যখন পড়বে, কেউ কি আর পেছন ফেরে তাকাবে, না তাকাতে চাইবে, যার যার তার তার, উচ্ছন্নে যাবে, হেগে মুতে মরবে, তবে না এ-সমাজের মুখ চুনকালি।

চরণদাদু টুলটা নেড়েচেড়ে একটা নরম তুলতুলে চ্যাপ্টা বালিশ চেয়ারের উপর পেতে দেয়।

সুজাতা এসে লাইটটা নিভিয়ে দেওয়ার ভান করে—দিলাম কিন্তু নিভিয়ে। আচ্ছা, বিধবা মেয়েমানুষ হয়েছি তো কি সখ-আহ্লাদ ছেড়ে দেব, এ-আবার কেমন কথা। এ-বাপু মানতে পারলুম না। কথাবার্তা বলবে না তো, বাঁচি কেমন করে। তোমার খালি ভয়, যদি কথার যাদুতে পড়ে মনের গতি অন্য দিকে গড়ায়।

কেনে, তোর মধ্যে প্রেম নেই।

প্রেম তো আছে, প্রেম আছে বলেই না.....

তাহলে বল, আমি খুব একটা ভুল বলি না।

এই যে এত লোকের চরণদাদু সেজে বসে আছ সে আবার কোন শোকে?

সুজাতা, তুই আর বুঝবি কেমন করে, মানুষের ভালোবাসার টান মেয়েমানুষের টানের চেয়ে ক্ষমতা অনেক বেশি;এ তো খাল বিল নয়, একেবারে নদীর উথাল পাতাল ছেড়ে শান্ত সমুদ্রের গভীরে গিয়ে ঢেলে দেয়, তল খুঁজে পেতে গেলে মাথা খুঁড়ে মরতে হয়। তুই এক্ষুনি বলবি, তোমার অত কথার মারপ্যাঁচ বাপু বুঝে কাজ নেই, পারো যদি এক ফোঁটা চোখের জলের দাম দিও।

সুজাতা বসে বসে চোখ কচলায়। কার কাছে বলে ওর চাওয়া পাওয়ার কথা, কখনই-বা বলে, নাওয়া খাওয়া ছেড়ে ঘরদোর উঠোন বাড়ি সাফসুতরো করা, বাউণ্ডুলে চরণদাদুকে ছিটকে যাওয়ার আগে বেঁধে রাখা, এমন ঘর বিমুখ মানুষকে বন্দী করা সুজাতা'র কম্ম না।

এটি একশ কথার এক কথা, যাও যা লিখছিলে, লেখ গিয়া, শুধু একটুখানি পরাণটারে দিও এ-আভাগী রে!

চরণদাদু ওর ঠোঁট দুটো ধরে নাড়িয়ে দেয়—ভারী সুন্দর লাগছে রে তোরে। একটু মস্করাও করে—কচি খুঁকি, দেখিস অন্য কারও মাথা চিবিয়ে খাস না।

ওমা তোমার দেখছি সেই সব দিকে নজর আছে, এমনিতে তো ভাজা মাছটি উল্টে খেতে পার না। এই নাও কাগজ, এই নাও কলম, মেয়ে মানুষকে ভালোবাসা তোমার কম্ম না, হাটে-ঘাটে-বাটে যাদের নিয়ে তোমার সংসার, তাদের নিয়েই ভাব, লোকগুলোর কাজে লাগবে।

....

তোমার চলে কেমন করে, সেই কথাও একবার ভেবে দেখ।

সে ভাবনার ভার তো তোকে দিলুম।

অত ছাড় দেওয়ার আগে একটু ভেবেচিন্তে দেখ, যদি বিনিময়ে দাবি করে বসে কিছু, তখন কিন্তু পিছুপা হয়ো না।

কিই-বা আমার আছে যে নিবি।

আছে, আছে, অনেক কিছু আছে, একবার নিজের দিকে তাকাও, তবে না.....।

চরণদাদু রঙ্গরসিকতা ছেড়ে এবার ঐ বিধবা মেয়েটার পোড়া কপালের কথা ভাবে। মেয়েটিকে নষ্ট প্রমাণ করার জন্য কত রং ঢং, কত সাজগোজ, কত গল্পস্বল্প, কত আনাগোনা, আর ঐ দুলাল-এর মা, সে তো কোন অপরাধ করে নি, যেটুকুনি চাওয়া পাওয়া সন্তানকে ঘিরে, প্রতিদানটা এইভাবেই পেতে হল।

কী অদ্ভুত মিল! জীবনের লড়াই-এ কখনও একা আর কখনও সন্তানের কাঁধে ভর দিয়ে চলা। আবারও কাগজ কলম নিয়ে বসে।

মাননীয় রাষ্ট্রপতি,

আমার চিঠির ভার আপনি আর কত সইবেন! কবে থেকেই তো লেখা আর মোছা, আসলে নাছোরবান্দা আমি, আপনার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিয়ে নিজের তাড়নাটাকেই প্রশ্রয় দিই। জানি না বোঝাতে পারলাম কিনা। এরা কেঁদে বুক ভাসায়, আমি জানব তো বটেই, ফল লাভ কি হ'ল যদি ইঞ্জিনটার চেসিসটা পাল্টাতে হয়, শুধু চেসিস কেন, গিয়ার বক্স, বক্স, ব্রেক আর কিছুই যেন বশে নেই কারও, দাওয়াইটা কেমন যেন বিধবার গলায় দড়ি আর ছেলেটার গুলি খাওয়া! ইচ্ছা মৃত্যু আর বলি হওয়া...... সমাজের যুপকাষ্ঠে...... কে দায়ী, কেন দায়ী, এ প্রশ্ন কেবল আপনাকেই করা যায়, বোধ হয় আপনি হাসছেন, এ ছোকরার কেরামতি! আজিজুল-এর কথা আপনার মনে আছে। এত উদ্‌ঘাটন, এত আমন্ত্রণ আর নিমন্ত্রণ, এ ক্ষুদ্র কাহিনী মনে থাকবে না ধরে নিয়েই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা, দেখুন না, কোথাও যদি মিলিয়ে দেওয়া যায়।

ধন্যবাদান্তে
আপনার একান্ত অনুগত,
চকাদাদু

উনিশ

মাটি খুঁড়ে রত্ন খোঁজা

মেয়েটি কোন কথা বলে না, বলবে না বলেই হয়ত বলে না, নিষেধ আছে কারও কারও এমনও হতে পারে। চরণদাদুর মনে হয় কোথাও প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এসে মেয়েটি জট পাকিয়ে ফেলছে। কেন তার হঠাৎই বোবা হয়ে যাওয়া, ওর মা-বাবার কাছে এর কোন সদুত্তর আছে কিনা! মেয়েটির চুলগুলো এলোমেলো, চোখগুলো ঘোলাটে, মুখের আশপাশে কালো কালো দাগ।

বরাহনগর থেকে দুদিনের জন্য বাপের বাড়ি বেড়াতে এসেছে অনিন্দিতা, বাংলা কাগজের সম্পাদক। এরকম একটা ঘটনা, দুর্ঘটনা বলা যাবে কিনা, ওকে যেন নাড়িয়ে দিয়ে গেল বনানী। এ অপমান শরীর মনে আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে। মুহূর্তেই ওর মনের আকাশে একটা কালো মেঘ এসে জড়ো হয়েছে, একে কিছুতেই সরানো যাচ্ছে না।

অনিন্দিতা হাঁটতে হাঁটতে লোকমুখে সংবাদ পেয়ে চলে আসে এক পেল্লাই বাড়ির গেইটের সামনে।

সামনেই ডান পাশে একটি লোহার খাঁচা, খাঁচার ভেতরে এক বাঘের বাচ্চা গোঁফে তা দিয়ে চোখ পাকিয়ে দেখছে অনিন্দিতাকে, ভাবখানা এমন কাঁচা গিলে খাবে। সুবোধ চৌধুরী'র পোষা জন্তু। এই পোষ মানানো কি নেহাতই খেয়াল! শত্রু শিবিরে শোরগোল তুলে দেওয়া অনিন্দিতা সোজা গিয়ে খাঁচার সামনে দাঁড়ায়, বাঘের চোখে চোখ রেখে ওর মতলব বোঝার চেষ্টা করে। বাঘটা লাফিয়ে লাফিয়ে খাঁচার এপাশ ওপাশ করে গজরায়।

সুবোধ চৌধুরী দোতলায় যাবার ইশারা করে, বাঘটা শান্ত জুবুথুবু হয়ে বসে পড়ে. বারে বাঃ এরকম চঞ্চল প্রাণীটা কীসের জোরে নেতিয়ে পড়ল! সুবোধ চৌধুরী কোন সম্মোহনী বিদ্যা জানেন কী! বলা যায় না, মানুষের ব্রেইন ওয়াশ করার কৌশল রপ্ত করেই ওরা এক পা দু'পা করে এগোয়।

আসুন, আসুন অনিন্দিতা দেবী, আপনার পথ চেয়েই বসে আছি।

লোকটার এলেম আছে, এই লম্বা উঁচু প্রাচীর তোলা কাঁচের ঘর থেকেই অ্যাকশানধর্মী কাজের রিহার্সাল করে। বারান্দা অব্দি পৌঁছতেই অনিন্দিতা দু'দুবার হোঁচট খেল, সারা উঠোনটা মার্বেল পাথর দিয়ে মোড়ান, তবুও কেন এত বিপত্তি! অভ্যাস মানুষের দাস।

অনিন্দিতা'র বাড়িতে বাঘের মাসি বিড়ালের মাছ, আর টুকরো টাকরা ইটের খোঁচা মারা দাগ নিয়ে সেজেগুজে..... এখানে এরকম এলাহি কারবার, গোঁফওয়ালা লোকটা অর্থময় হাসি হাসে। বাঘটা ইশারার মোহ কাটিয়ে এবার গোঁ গোঁ করে ওঠে আর বাহাদুরের মতো লোম খাড়া করে, তা হযবরল শব্দ করতে করতে আগন্তুকদের জয় সূচক ভঙ্গি করে।

দেখুন ভণিতা না করে আপনাকে সরাসরি প্রশ্ন করি।

একটা সোজাসুজি উত্তর দিন।

বলুন কি জানতে চান। সুবোধ চৌধুরী সুবোধ বালকের মতোই দু'হাত বুকের কাছে নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

আমাদের কাছে খবর আছে, মেয়েটি একসময় খলখলিয়ে কথা বলত, হঠাৎই মেয়েটি বোবা হয়ে গেছে, আপনার মনে হয় এর পেছনে কি কারণ?

এ-তো আপনার ভারি অন্যায়! ডাক্তারের কাছে না গিয়ে আমার কাছে এসেছেন।

সে আপনি হয়ত ঠিকই বলেছেন।

সুবোধ চৌধুরী'র দৃষ্টির রুক্ষতা আর নষ্টামি বাড়তে থাকে।

তবে!

সব রোগ তো আর ঔষধ দিয়ে সারানো যায় না, তাছাড়া রোগের আগের অবস্থাটা ঠিকমতো জানতে না পারলে ডাক্তারই-বা কী করবেন!

সে-তো ওর বাড়ির লোককে জিজ্ঞেস করুন।

বাড়ির লোকের কাছ থেকে যা জানবার তা জানা হয়ে গেছে। দেখুন, আমি নানা

সামাজিক ও সেবামূলক কাজে ব্যস্ত থাকি, আমার কাজ সমষ্টিদের নিয়ে, ব্যক্তির সমস্যা নিয়ে কাটাছেঁড়া করা আমার কাজ নয়। তা-ছাড়া কারও মনের উপর তো আমার হাত নেই। আচ্ছা ধরুন, আমার মনের উপর তো আপনার হাত নেই, এখন আমি যদি এমন কিছু করে বসি, আপনি কোথায় যাবেন!

আপনার বাড়ির লোক কিন্তু সব দেখছে, আমার লোকজনের জোড়া জোড়া চোখ নজর রাখছে।

সুবোধ চৌধুরী এবার একটু ভীত হয়ে হাত দুটো বুকের কাছ থেকে নিচে নামিয়ে উরুর উপর রাখে।

এবার বলুন তো মেয়েটার বোবা হয়ে যাওয়ার কারণ কি! আমি বলতে চাইছি, ধীরে ধীরে মেয়েটার বাকশক্তি লোপ পাওয়ার জন্য দায়ী কে?

সুবোধ চৌধুরী এবার অনিন্দিতা'র প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়ে একটু নিচুস্বরে জবাব দেয়—এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি!

নিশ্চয়ই পারেন, আর সেইজন্যই তো আপনার কাছে আসা।

সুবোধ চৌধুরী'র মুখটা পাংশু হয়ে যায়, জীবনে এমন কঠিন একটা অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে কল্পনায়ও আনে নি কখনও।

চৌধুরী বাবু, একটু ভাবতে থাকুন, কখনও আপনি এমন কোন নষ্টামি করেছিলেন কিনা।

....

ঠিক আছে, আপনার এত ভাববার দরকার পড়বে না।

বলুন তো, আখতার মহম্মদ কে?

চমকে উঠলেন চৌধুরীবাবু, বুঝতে পারলেন আর পালাবার পথ নেই। মেয়েটা আটঘাট বেঁধেই নেমেছে, কোন চালাকি চলবে না।

হ্যাঁ, আখতার মহম্মদকে আমি চিনি।

কবে থেকে চেনেন?

যখন থেকে আখতার কেরোসিন-এর ডিলারশিপ পেয়েছে।

সালটা ১৯৮২। ও আমার কাছে অনুরোধ করতেই এসেছিল, আমি যাতে ওকে ডিলারশিপ-এর ব্যবস্থা করে দিই।

কত টাকা নিয়েছিলেন?

লোকের উপকার করে আবার কেউ টাকা নেয় নাকি!

আমি যদি বলি, গুণে গুণে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছেন।

কি চুপ করে আছেন কেন? আমি যা বলছি সব সত্যি তো!

হ্যাঁ নিয়েছিলাম।

পার পাবেন না, সেই প্রমাণও আমার কাছে আছে, সেদিন আখতার যে চেক নাম্বার দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলেছিল আর যে নাম্বার-এর চেক জমা করেছিল, সব তথ্যপ্রমাণ আমার কাছে আছে।

এবার সত্যি সত্যি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না সুবোধ চৌধুরী।

মিসেস অনিন্দিতা, আপনি আমাকে বাঁচান।

আপনার বেনামি ডিলারশিপ বেঁচে যেতে পারে যদি আমি যাহা বলি, আপনি তাই তাই করেন।

অনিন্দিতা এবার একটু গলার স্বর নিচু করে সুবোধবাবুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। সুবোধবাবু যে ভুল জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছেন এই কথা ভেবে হাত কামড়াচ্ছেন।

বুঝলে আখতার আমার এতদিনের সাধের সাম্রাজ্য বোধ হয় এবার গুড়িয়ে যাবে নিজের চোখের সামনে, নিজের ভুলের এমন যে খেসারত দিতে হবে কল্পনাও করি নি, ঐটুকুনি হাঁটুর বয়সী মেয়ে আমার জীবনে শিখণ্ডী হয়ে এল, কোথায় যাই।

অনিন্দিতা যাবার আগে বলে গেলো, চরণদাদুকে চেনেন তো! না চিনলে চিনে রাখবেন, তাহলে হয়ত আপনার শাস্তির বহর কিছুটা হলেও কমতে পারে।

বিশ

বিষের জ্বালা, বড় জ্বালা

ও চরণদাদু! কি এমন ক্ষমতা!

আশ্চর্য ক্ষমতা, যে দিকে তাকায় ম্যাজিকের মতো কাজ করে।

লোকটার যে এত ক্ষমতা, কেই-বা জানত। ঐ তো কাঠের স্যান্ডেল পরে ঠকাস ঠকাস করে হাঁটে, গলায় একটা শান্তিপুরি গামছা, ফতুয়া আর ধুতি পরা বাঙালি ভদ্দরলোকের যে অত লম্বা হাত, সত্যিই বুঝতে পারি নি। চল আখতার, অনন্ত, ভাস্কর আর মঈদুলকে নিয়ে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নি।

চলুন তাহলে।

তোমার লজ্জা করবে না আখতার!

আরে সুবোধদা, সত্যি কি মন থেকে চাইছি, শুধু ধরা পড়ে কত অভিনয় তো করেছ, আর একবার না হয় গদগদ হয়ে পায়ে পড়ে যাবে! কিন্তু লোকটা যে ভারি চতুর, আসল নকল যে ভালোই বোঝে, একটু এদিক ওদিক হলে রক্ষে নেই।

বনানী এসবের কোন খবরই রাখে না। মাষ্টার মশাইকে নিয়ে এতবড় বদনাম ওকে এতটাই শকড় করেছে, এত সহজে কথা ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে না। কথা বলতে গেলে চিঁ চিঁ করে গলার আওয়াজ বের হয়। দোষী কি নির্দোষ-এর সীমারেখা কেবল ওই জানে, কারা যে ওর গলার শব্দ না ওঠানোর হুমকি দিয়েছে। এর চেয়ে ভালো ছিল গলা টিপে মেরে ফেলা।

বনানী গান পাগল মেয়ে, সুর আর নেই, কে যে এলো না এগিয়ে, চৌকাঠ পার হলেই যে মুখগুলো দেখে। বেচারি! হিংস্র, পাশবিক মুখ, ওর বিরুদ্ধে তর্জনী তোলে। কেন আগে বলিস নি?

বনানী ইশারায় বুঝিয়ে দেয়, নিজের সঙ্গে এ-লড়াইটা নিজেই লড়তে চেয়েছিল।

বনানী'র বাবা মুখ খোলে—মা আমি বুঝতে পারি নি।

কথা কম, চারবার প্রশ্ন করলে একবার উত্তর, হবে হয়ত বা বয়সের ধর্ম।

মুখে কুলুপ আঁটা, ও কি করে বুঝবে, বাবা-মায়ের কথায় কতটা শক্‌ড। প্রথমে জিজ্ঞেস করলে বলত—কিচ্ছু হয় নি মা।

বনানী'র মা ওর বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলত, আমার মেয়েকে একটা মনোরোগীর কাছে নিয়ে চল।

কেন মেয়ে আমার পাগল নাকি?

পাগলেরাই বুঝি মনোরোগীর কাছে যায়!

চুলগুলো একপ্রস্ত চিরুনি দিয়ে জট ছাড়ায় না দেখে কদিন শ্যাম্পু করে দিয়েছিল—এত বড় মেয়ে সে যদি নিজে না করে, কত আর সম্ভব হবে। মেয়েটার চোখ দুটো লাল—গোপনে কাঁদত বুঝি, নতুন এক অভ্যাসের দাস হয়েছে—পেছন ফেরে দেখা, কোন শব্দ হলেই আরো বেশি করে ভয়াল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা—কোন দাঁড়াশ সাপ বুঝি মুখ ফুলিয়ে ফোঁস ফোঁস করে জানালার ফাঁক দিয়ে গলে যাচ্ছে। রাস্তার মোড়ে আরও বেশি একটু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাওয়া, কেউ বাহির থেকে ডাকলে দু'চার কথা।

কাঁধে বই কখানা ঝুলিয়ে নিঃশ্বাস নেয়, বনানি বেঁকে যায়। শোধ করবে কি করে ঋণ, ধার-এর সুদেই দিন কাটে, কত আর সবার জ্ঞান শুষবে, এমনিতেই তো বেড় দিয়ে রাখা।

বনানী শালোয়ার কামিজই পরেছিল, ফর্সা টুকটুকে রং, দু'আঙুলের ফাঁকে জুতো গলে কুটুস করে কামড়াল কি—তেতুলে বিছে সাংঘাতিক, চুন লাগিয়ে দিয়েছিল পানের দোকান থেকে নিয়ে, বিষের দংশনে জর্জরিত হয়ে এক পা দু'পা করে স্কুল বাড়ির মিনিট দশেক দূরে।

চরণদাদু বনানীকেই তাক করেছিল।

সত্যি করে বলত, কে রটালো এমন মিথ্যে সর্বনাশের কথা। বোবা আওয়াজ বেরিয়ে আসে—বুঝতে হয়—মিথ্যে নয় গো এমনই এক সত্যি, কি করে বাদ দেব নিজেকে।

চরণদাদু, ওর কথা সামান্যই টের পায়,

কত রকমভাবে আমাকে শেষ করেছে।

শেষ করা কাকে বলে সে মানে জানে!

কেমন কাটছে?

অন্ধকার, এত ঘোর কালো, কেউ তো দেয়নি মুক্তির সন্ধান!

বনানী এমন নিস্পৃহ হয়ে তাকালো, একটুখানি সান্ত্বনা, তারও দাম কম কি!

তুমি সত্যি বলবে কেমন?

কোথায় আর!

যখন যেভাবে তোমায় জিজ্ঞেস করে।

সত্যিই তো শরীর নষ্ট হয়েছে!

কারা করল?

চুপ করে রইলো বনানী।

চরণদাদু জানে, আজিজুল মিথ্যে বলেনি।

কীসের জন্য তাকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?

আজিজুল সত্যিই কি বনানীর সর্বনাশের জন্য দায়ী ছিল না!

চরণদাদুকে বলেছিল—কি করে বলি আমার দায় ছিল না।

হ্যাঁ ও ওদের কথামতো কাউকে ভোটের জন্য প্রভাবিত করতে চায় নি।

এর পরিণাম যে ভয়ঙ্কর হতে পারে!

স্রেফ একটা গদি, স্রেফ একটা চেয়ার, আর তার ক্ষমতা।

ক্ষমতার আকাঙ্খা!

কেন ক্ষমতার লিপ্সা জন্মায় অজিজুল?

জনগণ নাচিয়ে রাজা বানিয়ে দিতে চায়, জনগণ কাউকে রাজা করতে চায় বলে।

জনগণের এতে এক অসাধারণ তৃপ্তি!

তুমি কি জনগণকেই শত্রু বলছ।

জানি না।

মেয়েটির সম্মান, মেয়েটির শ্লীলতাহানি, মেয়েটিকে বেআব্রু করে শরীর খাবলানো হয়েছে, শরীরকে মাংস ছাড়া আর কোন মূল্য দেয় নি। বনানী সে জ্বালাতেই জ্বলে পুড়ে মরে। বনানী জানিয়েছিল—ওর মনে দাগা দেওয়া হয়েছে।

আজিজুল বলেছে—সেই দাগা ওরা দিয়েছিল, ও নিজে কথা রাখেনি বলে। আজিজুলের কষ্টের জ্বালা সাপের দংশনের চেয়েও আরো যদি দংশন কিছু থাকে, তাই মনে হয়েছিল, ভেবেছিল মেয়েটির জন্য ও ফেঁসেছে, কিন্তু ভাবনাটা যখন অন্য দিকে মোড় নিল, বনানী'র ইশারাই কাহিনী হয়ে উঠল, তখন মনে হল বনানীকে ব্যবহার করা হয়েছে।

চরণদাদু এত সহজভাবে হাল ছাড়তে রাজি হয় নি, মনে হয় নি যে একটি মেয়ের শরীর অচ্ছুৎ হয়েছে, ধুয়ে মুছলে চলে যাবে কিন্তু শরীর এমন যে একসঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তার দাম দেবে কে? আইনের রক্ষাকবচের হাতও একটু পথ চলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বা বলে, অনেক হয়েছে, এবার ক্ষেমা দে।

একুশ

মানুষ যদি নদী হত

নদীর বুকটা নাচতে নাচতে বনানীর পায়ের কাছে চলে এসেছে, না জানি ওর মনে কি এমন আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণ ঘটছে, মুখ খোলে, জ্যান্ত হয়, ঘুম ভেঙে লাভা স্রোত

ছোটায়, বনানী উষ্ণতায় ভাসতে চাইলেও নিজের আগুনে অন্যকেও পোড়াবে, এই ভাবনায় আগুনটাকে নিয়ে নিজেই ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়, ছিনিমিনি খেলে।

ঐ মেয়ে করছটা কি, মরবে যে, মহিলাটি এক জোরে ধমক মারল।

ধমক খেয়ে ও তথৈবচ।

মরতেই তো চাই, এ-জীবন আর রাখব না, সবকিছু যে নষ্ট করে দিয়েছে ওরা।

কি নষ্ট করেছে।

নষ্ট হওয়া কি এত সোজা মা, কতগুলো লম্পট কামাতুর লোক এসে শরীর খাবলেছে, শরীর কি তাদেরও নষ্ট হয়নি, কেবল তোমার একার হয়েছে, হ্যাঁ একথা সত্যি যে ওরা তোমার উপর বলপ্রয়োগ করেছে।

আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পাচ্ছি না যে!

এই নদী দেখেছ, কেমন গজরাচ্ছে, কেন জান?

মহিলাটি এক আজলা জল নিতে খাবলে খাওয়া মাটির ধাপে ধাপে নেমে জল ছুঁয়ে ফেলে, জলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে তলিয়ে যাওয়ার আর্তনাদ, তবু নদী কেন কথা বলে না, কোলে নিয়ে সাঁতরাতে থাকে। মহিলাটির আঁচল বাতাসের তালে তালে উড়ে, শরীরের ভাঁজগুলো স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়, কত কালের কত ঘটনার দাগ শরীরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, সেই ঘন কালো দাগ রগড়ানো সাবান কিংবা মাখো মাখো বনৌষধিতে যায় নি। যে দাগ আজীবনের জন্য ফেলে দেওয়া, সে দাগ বড় তিতকুটে, বিষের জ্বালা নিয়ে কথা বলে।

বনানী তাকিয়ে তো থাকে, শরীরের যে এত সুক্ষ্ম রেখা ও-তো তলানীতেও আনতে পারে না, মহিলাটি ওকে দেখবে বলেই শরীর ছেড়ে দেয়। আজলা ভরা জল একটুখানি জিবে ঠেকিয়ে তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা'র সঙ্গে বুড়ো আঙুল জুড়ে নিয়ে জল ছিটায় সারা অঙ্গে, থপথপ করে উঠে চলে আসে মাটির ধাপ টপকে, পায়ের গোড়ালিতে, বুড়ো আঙুলের ফাঁকে কাদা মাটি পুটলি মেখে আছে। আর এক আজলা জল কি মনে করে জলটাকে সরিয়ে সরিয়ে ভরে নেয়। জলটা ফোঁটা ফোঁটা পড়তে থাকে। তবুও যেটুকুনি বাঁচে, এনে ওর শরীরময় ছড়িয়ে দেয়।

ও মেয়ে মরতে এসেছিস কেন? ভালো লোকের মেয়ে, পড়ালেখা করে রোজগেরে হবে, সুখে ঘরকন্না করবে, এই তোমার মনে ছিল...............

দেখি মেয়ে, কি হয়েছে মুখ তোল।

এই শরীরটা কি তোমার তৈরি মা, ওনার কৃপায় কেউ কিছু ছুঁয়ে দিলেই সব গেল গেল, এমন ভাবিস না মেয়ে। সুযোগ পেলে থেঁতলে দিবি। প্রতিশোধ না নিয়েই চলে যাবি। কোথায় যাবি!

মহিলাটি বনানীকে শাড়ির আঁচলে মুড়িয়ে নেয়।

পাড়ের এক চাঙর ধপাস করে জলের তলায় চলে যায়।

কতগুলো মেয়ে ছেলে স্নানে আসে, ঝুপঝুপ করে জলের বুকে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে বলে,

মানুষ আর নদীর এত মধুর আত্মীয়তা জীবনেই শুরু, মৃত্যুতেই শেষ।

মেয়ে, তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।

এ-তো মাসি তুমি কি বললে, কবে বাড়বে, ততদিনে আমার জীবন শেষ।

শ্মশানের ধোঁয়া কাঠের চুল্লীর বিছানা ছেড়ে শূন্যে উঠছে। এত গন্ধ, এত মরা শরীর, জ্যান্ত হওয়ার বাসনাকে উল্টেপাল্টে দিচ্ছে, বয়স্ক নারী আর কিশোরীর জীবন মৃত্যুর চিন্তাকে যার যার মতো হিসেব করে নেবার কথা বলে।

চল মা, তোকে ঘরে রেখে আসি।

না আমি ঐ মন্দিরে যাব। শান্তি পাব।

মন্দিরে কি আছে, চার দুয়ার বন্ধ, মঞ্চে দেবীর শরীর জুড়ে অলংকারের ছটা আর মুণ্ডু দিয়ে লজ্জা নিবারণ। তবে কি চাও! কে এই অভিনব চিন্তায় ঘর বন্দী করছে, দেবতাকে গৃহী করেছে, চিন্তার উপঢৌকন নিয়ে আরতি করে নেব—এত সুখ কেন, এত নিশ্চিন্তি কেন? নিজেকে মিশিয়ে দিতে এত অনীহা কেন?

উদোম গায়ে মেছুনিরা গলায় কাঁধে ঘূর্ণি জাল ঝুলিয়ে খালুই ভর্তি কুচো, খলসে নিয়ে ছুটতে ছুটতে, জোরে পা চালিয়ে কাঁচা রাস্তা বরাবর হেঁটে চলে যায়।

কি গো মেয়ে এখনও মরবে!

বনানী ওর ভেতরের বিশ্বাসটা টেনে এনে চাড়িয়ে দেয়। মহিলাটি দেখতে পায় কালো মেঘটা পাতলা হচ্ছে, ঠোঁট দুটো উজ্জ্বল হচ্ছে, রোমকূপগুলো থেকে আতঙ্কের সর্পিল ছায়াটা সরে যাচ্ছে।

বাঃ রে মেয়ে বাঃ এই তো চাই, নদী তোকে জীবন ফিরিয়ে দিল।

আর কি চাই, মাকে গড় কর।

মহিলাটি ভেজা শাড়িটা গাছের আড়াল হয়ে পাল্টে নেয়। মেয়েটি নির্বিকার হয়ে শরীর দেখে, উলঙ্গ শরীর, মাই দুটো ঝুলে আছে, ফুল হয়ে চোখ দুটো নিচে নামতে থাকে। নাভিকুণ্ডলীর কাছে যে আটকে যেতে চায়, নিতম্বের ঘামের মতো বিন্দু বিন্দু জল, নদী থেকে উঠে এসে শরীরে মিশেছে, অদ্ভুত এ-নারী। বনানী'র এমন খোলা আকাশের নিচে অন্য নারী শরীরের অভিজ্ঞতা। এ-নারীর গর্ভটা লুকিয়ে রেখেছে যত্ন করে। আহাঃ ভেজা চুল দুপাশে সরিয়ে দিলে জেগে ওঠে গলাব দু'পাশে সাদাকালো দাগ আর কালো তিল, বড় বড় জড়ুল, চুলের গোছার বিপরীতে সহাবস্থান। চুলগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে দিয়ে জলে নামানোর নেশায় বনানী'র চোখ ধরে যায়। চেনা আভরণে অচেনা রঙ, শরীরকে চেনানোর তাঁর এক স্বভাব।

মহিলাটি গুটি গুটি পায়ে চলে আসে।

কি দেখলে মেয়ে?

বানানী লজ্জা পেয়ে যায়। এরকমটা হয়, না-চেনার জ্বালা, ছেলেরা দলবেঁধে নদীর ঘাটে ঝাঁপিয়ে পড়লে জলের নাচন থোকা থোকা ফুলের মতো ঘাসের শরীরে জাঁকিয়ে বসে। ঘাসের ওড়ানো শিষ সে জল ধরে রাখে। মেয়েটার গায়ে এসেও সে জল ছিটকে

চলে আসে।

ও মেয়ে, মাঝদরিয়া দেখ।

মহিলাটি তাঁতের শাড়িতে আটপৌরে ঢঙে, মাথায় আলতো করে খোঁপা বেঁধে বনানীর পাশে এসে দাঁড়ায়, খালি পিঠে সূর্যের উত্তাপ ছলনা করে, জঙ্ঘা আর পিঠের সন্ধিস্থলে কত যে স্বপ্নের চোরাবালি।

বনানী দু'হাতের থাবায় চোখ দুটো-ঢেকে ফেলে। নিজের শরীরকে ভালো করে চিনে নিতে চায়। মহিলাটি গাছের আড়ালে গেলে টুপ করে ডুব মারে জলে।

সময় নেয়, কি জানি জলের ভেতরে সাঁতরে সাঁতরে শরীর দেখে কিনা। জলের ছোঁয়ায় নিজের শরীরটাকে এভাবে অচেনা করে দিতে মন্দ লাগে না।

মহিলাটি নিঃশ্বাস ছাড়ে, নিঃশ্বাস নেয়, কত বার করে নামায় আর ওঠায়। মেয়েটি তখনও ওঠে না, তবে কি ওর শরীর চেনানোর ছক বৃথা গেল।

মুখ বাড়ায় বানানী।

নিজের বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার আনন্দে মেয়েটি লাফিয়ে উঠল।

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা গরুটি জোয়ারের আনন্দে খুঁটি উঠিয়ে দৌড়তে শুরু করে।

মহিলাটি এবার ভয়ে সত্যি সত্যি আঁতকে ওঠে। জোয়ারের জল ছুটতে থাকে। বনানীকে দু-হাতে আগলে নেবে। এ-যেন বেনিয়মের জোয়ার, অসময়ের জোয়ার।

মেয়েটিকে হাত দুটো বাড়িয়ে জোরে হ্যাঁচকা টানে পাড়ে নিয়ে আসতে চায়। বনানীর পা দুটো কিছুতেই সরাতে পারে না। বনানী চিৎকার করে, 'মাসি আমাকে বাঁচাও, আমি বাঁচতে চাই।' মহিলাটি বনানীর কব্জীটা চেপে ধরে, জলের তোড় এসে রাক্ষুসির মতো ওকে টেনে নিতে চায়।

বনানীর পুরো শরীরে বালি আর বালি, ঠোঁট দুটো পাড়ের মাটি ছুঁয়ে গেলে বুঝতে পারে আর নিস্তার নেই। শরীরের উল্টোদিকে উপছানো নদীর ঢেউ-এর খেলা, মনের সুখে উথাল পাতাল।

ঠান্ডা শরীরটা আর কথা বলতে চায় না।

মহিলাটি সর্বশক্তি দুটো হাতে জড় করে নিয়ে মেয়েটাকে বলে, 'বেঁচে থাকাটাই লড়াই, হেরে যাওয়াটা মরা নয়, মৃত্যুকে ডেকে আনা।'

মেয়েটি মাটি কামড়ে ধরে, ঘাসের চাঙরে বুক পেতে দেয়, দু'একটা ঘুঙুর পোকা ওর শরীরে কিলবিল করে ওঠে।

মেয়েটি চিৎকার করে—আজিজুল মাস্টার আপনি কোন দোষ করেন নি,........

ওরা আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে.....

এ নিয়ে ক'বার স্বীকার করলে।

নিজের কাছে বার বার, ওদের কাছে জানি না।

হালকা লাগছে বুঝি এবার, শরীরটা এবার পাড়ে এসে পড়ে, মহিলাটির ভেজা কাপড় দুলতে থাকে, শরীরের এক মিষ্টি গন্ধ জলে বাতাসে নাড়া খেয়ে শরীরে ফুটতে চায়।

মেয়েটি সেই গন্ধ গায়ে মেখে শরীর আর শাড়ির বন্ধন ছিঁড়ে মাটি কামড়ে কামড়ে হাটে। বনানী, তুমি ঠিক আছ তো! জবাবে এক বালিহাসের হাসি ডানা নাড়ে।

বাইশ

যত খুশি খুঁজে মর

মাননীয় রাষ্ট্রপতি,

অনেক কথাই আমি বলার এবং জানানোর জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু বিনা প্রস্তুতিতে যে কথাগুলো বেরিয়ে এল সেটুকু নিবেদন করে আমি নিশ্চিত হতে চাইছি। বনানীর যা গেল, সে-তো আর এ-জীবনে ফেরত পারে না, অনিন্দিতা'র সাক্ষ্য গ্রহণের আর বিচারের প্রহসনও চলবে। আমার বলার কথা কিন্তু তা নয়, আমি শুধু এইটুকু জানাতে চাই, এই মেয়েটিকে নিয়ে আপনার ভাবনা কি! সামাজিক রীতিনিতি আর সম্পর্কের তুলিতে মেয়েটি কি রঙ মাখাবে! পুরো জীবনটা কি আলাদা করে চিনতে পারবে! কিন্তু এই মেয়েটি এত বছর ধরে যে জীবনটা সাজিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছিল, তার কী হবে? যে মানুষগুলোকে দেখে সে যে অভ্যাসের বীজ বপন করেছিল, সে আর কেমন করে দেখবে, মানুষের কাছে এ পরাজয়ের জবাব তার কাছে নেই। ঐ-বিশ্বাসের জন্ম দেওয়া, বিশ্বাস কেড়ে নেওয়া আমার কাজ নয়, কিন্তু যে দিন বুঝলাম, মেয়েটার জন্য শুধু এক ফোঁটা চোখের জল ফেললেও আমার দায় শেষ হবে না, কারণ তার কষ্টটা তার অনুভূতির জোয়ার আমাকে আঘাত করেছে; সে মৃত্যু চেয়েছিল সত্যি, তার চাওয়ার মধ্যে যতটা না ঘৃণা ছিল, জীবনকে প্রত্যাখান করে নিজে জিতে যাওয়ার আনন্দেই সে হয়েছিল দৃঢ়, বিভ্রান্তি এসে তাকে আবার জাপটে ধরল, জীবনের টানকে সে অস্বীকার করতে পারে নি। মেয়েটি যদি জীবনকে সত্যি বলে মেনে নেয় তার শরীর নষ্ট করা পতঙ্গগুলোর ডানা ছেটে দিতে হবে সত্বর। কিন্তু বিচার ব্যবস্থার সাক্ষ্য প্রমাণ তারিখ, পদ্ধতি মেয়েটির সে সিদ্ধান্তে কাঁটা হয়ে দাঁড়াল, একথা জোর দিয়ে জানাতে চাই। একটা সাধারণ মেয়ে, আপনারই দেশের মেয়ে, যে দেশের প্রধান নাগরিক হিসেবে আপনার ভাবনা অন্য খাতে বইতে পারে, আপনি মেয়েটাকে তুলে এনে প্রশ্ন করতে পারেন আপনার যাবতীয়, জ্ঞান, বীক্ষা, দরদ, অনুভূতির নির্যাস নিয়ে প্রত্যেক বিন্দুতে আলাদা আলাদা রেখা টেনে জ্যামিতিক সত্যেও পৌঁছতে পারেন। আপনি যদি মনে করে থাকেন, এই মেয়েটির যন্ত্রণাকে আপনি জ্ঞানের অন্য কোন শাখাতে ফেলে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবেন, সে-কেবল আপনিই করতে পারেন। মেয়েটিকে আপনি আলাদা কোন উপদেশ, নির্দেশ মতামত জানাতে পারেন। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, মেয়েটি তার শরীরের উচ্ছিষ্ট করা শরীরগুলোকে প্রত্যক্ষ করে ঘৃণার নদী এনে থুথু ছিটাতে চায় কিংবা চেনা মুখগুলোকে অন্য কোন ভাবে পাল্টে দিতে চায়। শুধু এটাই আপনি ভাববেন মেয়েটার অভিলাষকে কিভাবে প্রশ্রয় দেওয়া যায়, ইচ্ছাপূরণের গল্পটা আমি শুধু আপনাকে ভাবতে

অনুরোধ করব।

মেয়েটিকে আমি দিনের পর দিন উপোষ করে থাকতে দেখেছি, এক ফোঁটা জলেও ও গলা ভেজায় নি। এতে করে আপনি কি ভাবছেন? মেয়েটার নীরবতার আর প্রতিবাদের ভাষার অভাবই মূল কারণ! তাহলে আপনি একটা উপায় বাতলে দেন, এই অবস্থাকে মুছে ফেলার পদ্ধতি কি! বয়সটার সন্ধিক্ষণে যে ভয় আর লজ্জার সংমিশ্রণ ঘটে, কল্পনার মিশেল ঘটিয়ে জীবনের সিঁড়িতে প্রথম পা রাখার জন্য প্রস্তুত হয়, ঠিক এই সময় যারা ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে চায়, কালি ছিঁটাতে তাদের কতটুকু স্বাধীনতা দেওয়া উচিত? শুধু কি তারা, যারা পরোক্ষভাবে এই ধারণাকে প্রশ্রয় দেয়, কিশোরীকে দাবার গুটি বানিয়ে দাবার চাল চালে, তাদের কথাও আপনার চিন্তার রেখায় আঁকতে অনুরোধ করি।

মেয়েটির অবস্থানটা যদিও পাতা ফাঁদে মুখ্য, তবু অনেক পার্শ্ব চরিত্ররাও মুখ্য চরিত্র হয়ে ওঠে। এটা ভাবলে হয়ত ভালো হলেও হতে পারে, এই পার্শ্ব চরিত্রগুলো সমাজের যে যে প্রান্ত থেকে উঠে আসছে, তাদের আর্থ-সামাজিক কিংবা জৈব অবস্থানটাও আপনার বিবেচনায় থাকবে। মেয়েটিকে যতদূর জানি, সে কিন্তু চায় যারা তার শুভাকাঙ্খী কিংবা অমঙ্গলকারী, প্রত্যেকের প্রতি এই ঘটনার পরম্পরায় সমান গুরুত্ব আরোপ করা হোক। মেয়েটি বুঝে ফেলেছে, যেহেতু এইসব অনিষ্টকারী মানুষরাই সহজেই গোটা বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, তাদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটা সামগ্রিক সিদ্ধান্ত ও বোধ হয় জরুরি। সন্দেহ দানা বাঁধলে ও ঘটনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করলে ঘটনার গতিপ্রকৃতিও পাল্টে যেতে পারে। এটা আপনাকে জানাতে দ্বিধা থাকায় কথা নয়, মেয়েটি এখন বড় বেশি নদীর বন্ধু হয়েছে, নদীর জলকে নিজের অশ্রুর সঙ্গে মিশিয়ে দেখতে বিকেল হলেই, সূর্য যখন বিদায় নিয়ে রাঙিয়ে দিতে চায় আদিগন্ত, মেয়েটি তার ভাবনাকে ঐ মুহূর্তে গুটিয়ে নেয়, মানুষের সঙ্গে কথা বলার বিন্দুমাত্র স্পৃহা হয় না তার, মেয়েটি একাই বেরিয়ে যেতে পছন্দ করে। ওর নিরাপত্তার খাতিরে স্বজনরা কেউ কেউ তার ছায়াকেই অনুসরণ করে তার অজান্তে। এটাই লক্ষণীয় বিষয়, হঠাৎই নির্ভীক হয়ে যাওয়া, কোন কিছু তোয়াক্কা না করা, সবাইকে বুড়ো আঙুল দেখানো তার অস্তিত্বকে খুঁজে বেড়ানোর সামিল কিনা, কিংবা পরোক্ষে এক গভীর চক্রান্তের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করা কিনা! মেয়েটির দৃষ্টিতে মাঝে মাঝেই শত্রু মিত্র সব একাকার হয়ে যায়, শত্রুকে চিহ্নিত করে ভাবতে থাকে 'আমি পেরেছি', আর মিত্রকে কাছে টেনে মনে করে এর গায়েও অন্য রকমের গন্ধ, সবাই সময়ের সুযোগ নিতে চাইছে, আসলে ওর পায়ের শেকলটাকে ও টানতে চাইছে, টেনে ফালা ফালা করতে চাইছে, এইটুকুনি তো মেয়ে, কিন্তু মগজটা বড় তীক্ষ্ণ। মেয়েটা হয়ত এভাবেই বলতে চায়, সকলে মিলে তাকে মেয়ে করবে প্রকৃতির দোহাই দিয়ে রং চং মাখিয়ে, লম্বা চুল রাখার সৌন্দর্যের প্রশংসা করে, কাজলটানা চোখের আকর্ষণে দুলে ওঠে, আলাদা আসনে বসিয়ে তাকে চালান করে, সমাজের বুকে এটা কতটা অভিপ্রেত? সে দিনে দিনে এখন উপলব্ধি করতে পারছে যে, সে আগামী সময় পুরোপুরি দ্রব্যের বাজারে হাজির হয়ে যাবে, তার জন্য নাকি আলাদা

একটা গোডউন দরকার, আর সেই গোডাউনের নিরাপত্তার জন্য একটা বড় তালা দরকার, একটা কিংবা দুটো নিরাপত্তা রক্ষী প্রয়োজন, যদি তারাও ওর ভক্ষক হয়ে ওঠে! তখন সেই কারণেই তারই বয়সের কোন মেয়ে এত সাজগোজ করলে কিংবা সাজগোজের অনুমান করলে মনে হয় ঐ কসমেটিকস্ আসলে তাকেই সাজগোজের এমন দ্রব্যে পরিণত করতে চাইছে, যাতে করে সে অলংকার হয়ে সেজে উঠতে পারে। তার কথায়, মেয়েরাও নাকি ওর অস্তিত্বকে নিয়ে হায়, হায়, হাহুতাশ, তিরস্কার করে, তার শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করেছে বলে নয়, তার শুচিতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করাতেই পিছনের সারির নারী বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। শরীরকে ব্যবহার করবে, শরীর অন্যকে আনন্দের জন্যই ছড়িয়ে দেবে, সবাই দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে, তবে না! পরামর্শ দেয় সেই নারীরা, তার জন্য মোটা অঙ্কের টাকা দাবি কর, দেশের প্রথম নাগরিক-এর এসব নিয়ে মাথা ঘামানো'র সময় কোথায়! মেয়েটা এ-ও বিশ্বাস করে, এমন কেউ নিশ্চয়ই এই দেশে রয়েছেন যিনি ব্যাপারটাকে এত তুচ্ছ ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেবেন না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, তবু বলা আমাদের অর্থাৎ নাগরিকের যে সম্পর্কের সমীকরণ আস্তে আস্তে যে নতুন মাত্রা পেতে চলেছে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার হাত ধরে, একজন সাধারণ মফঃস্বল অঞ্চলের মেয়ের জীবনে কি প্রভাব ফেলবে, সামাজিক অনিবার্য পরিবর্তনে তার মত করে মানিয়ে নেবে, না স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে জোর গলায় বলবে—চুপ কর যত পণ্ডিতের দল। দ্রব্য বিক্রি করাকে আধুনিক হয়ে ওঠার নামান্তর কিংবা দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষমতা, আগ্রহ ও রুচিকে আধুনিকতার তকমা পরিয়ে দেওয়া কোনটা ঠিক! মেয়েটি তার শরীর এঁটো হওয়ার পর বুঝতে পেরেছে নারীর শরীরের শুচিতা বলতে আসলে কি—সমাজের শক্তিশালী অংশের অর্থাৎ পুরুষতন্ত্রের এক চাপিয়ে দেওয়া বোঝা, তাকে বইতে হবে গাধার মতো, না-হলে চাবুক খেতে হবে। চাবুক খাওয়া কাকে বলে নিশ্চয়ই আপনি জানেন, মেয়েটি দিনে রাতে চাবুক খাচ্ছে, যার প্রেক্ষিতে আপনি সমগ্র ব্যবস্থাটা বুঝে নিতে পারেন। মেয়েটি এখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। ওর ঘরের পেছনে এক অলক্ষুণে পাখি নাকি বাসা বেঁধেছে, তার সে কি ডাক, অনামুখো, দিনমান দোরে দোরে ঘুরে ঘুরে শেষে তার ঘরের পেছনে। তার এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন দেখে এটা অনুমান করতে একেবারেই অসুবিধা হয় না, হয়ত পরিবর্ত্তনটাই জরুরি, অবশ্যম্ভাবী!

আমি জানাতে কোন সঙ্কোচ করছি না, মেয়েটি সত্যিই একদিন শারীরিক ইচ্ছাগুলো নিয়ে ভাবনা শুরু করে দিল, সে না চাইলেও হল। কেউ একটুও জায়গা দিল না, তার কথা শুনল না, তার কোন বন্ধু জুটল না, বন্ধুহীন এ-সংসারে টিকে থাকা যায়! সংসার সুখের হয় নাকি রমণীর গুণে, যে রমণীকে সমাজ নষ্ট করে আঁস্তাকুড়ে ফেলে বলে, 'তোর ঠাঁই হবে না মেয়ে, এবারে তুই তোর পথ দেখ।' পথ কি দেখবে, গলায় দড়ি দেওয়া! দড়ি হাতের কাছে না থাকলেও কেউ না কেউ এগিয়ে দেবে, তাকে বাঁচার পথ দেখানোর মতো অশুভ কাজটি কেউ করতে যদি রাজি না হয়। এ প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর থাকলেও মানুষ তাকে জটিল করে নিয়ে চেনাতে ভালোবাসে, সেই কারণেই

সমাজগর্বে গর্বিত সামাজিক মানুষগুলোর কাছে সমাধানের রাস্তা খুঁজে পাওয়া সোনার পাথর বাটি। সমাজবদ্ধ জীবের সমস্যার অন্ত নেই, সমাজে আবদ্ধ হওয়ার গোড়ার কথাগুলো ওরা হালকা চালে উড়িয়ে দিয়ে গোটা কয়েক বাড়িঘর করে বসবাস করাকে সমাজ বলে চিহ্নিত করছে, আর এই সমাজের বিধি বিধান নিজেরাই খুশি মতো বানিয়ে নিয়ে পেশ করছে যার যার মতো করে, তাতে কে মরল, কে বাঁচল, কারও কি এসে যায়! কারও শৈশবে ঘুনপোকা ধরুক, অত ভাবনা ওদের নেই যতটা ধর্মের ধ্বজা বইতে ওরা সিদ্ধ হস্ত। প্রয়োজন হলে, চুরি করা বাঁশ বাগানের খুঁটিতে ধ্বজা বইবে, কিংবা সরু কাঠি বানিয়ে নিয়ে, রং-এর কাজ সারবে, তারপরেও এদের বড্ড দেরি করে ঘুম ভাঙবে, ততদিনে নতুন ঘটনার প্রয়োজনে নিশপিশ করবে। ওদের কানে মন্ত্র দিলেও চিন্তার প্রবাহ থামিয়ে দেবে না।

অন্ধকার নামলেই ধর্মের বাসনা জেগে ওঠে, মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টা বাজে, মগরিবএর নামাজ শুরু হয়, প্রার্থনা সঙ্গীত গায়, কিন্তু কেন জানি না মনে হয় এ-সুকুমার বৃত্তিটা সাময়িক, মনের ভাঙচুর ঘটছে অহরহ, কারও কোনও কথা বলার হিসেব নেই, এই মুহূর্তের সত্য কথাটা, রাত পোহালেই অন্য অর্থ নিয়ে আসছে, বলছে সত্য কথাটা বলেছিলাম বটে, এর মধ্যে একটা দুটো কিন্তু তো ছিলই। মানুষের এ-দুর্বুদ্ধি আর সুবুদ্ধির ব্যবধান এতটাই, মেয়েটা ঠিক ভরসা করার মতো অবস্থায় ছিল না। বলছে, যা বাপু, মনের সুখে দিন কাটাগে, মেয়েদের পরের হাতে সঁপে দিলেই লাথি ঝাঁটা খেয়ে হিল্লে একটা হবেই, এ-নিয়ে তত্ত্ব বানিয়ে লাভ নেই, এরা হ'ল ভোগের বস্তু, ভোগ শেষ হলে ছিবড়ে করে ছুঁড়ে ফেলে দাও, আর একজনকে নতুন জায়গায় বসিয়ে দাও। উলু বনে মুক্তো ছড়ানো আমাদের সামাজিক অভ্যাস, এটাতে পূর্ণচ্ছেদ টানার জন্য তদবির করা, কথাবার্তায় মাদল দোলায় দুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেওয়া, এটাও যেন অপ্রতিরোধ্য ব্যাধি। মেয়েটা তাই বিশ্বাসের হাত বাড়াতে গিয়েও তুলে নেয়, মনে করিয়ে দেয়, এই অনিয়মিত সমাজের খোল নলচে পাল্টাতে না পারলে তাকে আবারও ধর্ষিত হতে হবে এবং নিরুপায়, নিরীহ সৎ আজিজুলকে তার দায় বহন করতে হবে। মেয়েটা এটার বিহিত চেয়েই আসলে সমাজের মুখ চেয়ে বসেছিল। মেয়েটির কথা আপনাকে আর বেশি বলে বিব্রত করতে চাই না, শুধু কারামুক্তির আনন্দে সাজাগ্রস্ত আসামী'র মতো আপনার মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকব প্রকৃত দোষী যাতে কারারুদ্ধ হয়, না হয় নাম-কা-ওয়াস্তে সংশোধনাগার আবার পাগলের হাসপাতাল হয়ে উঠবে। দেশের প্রথম নাগরিককে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এইটুকুই নিবেদন—

আপনার সহনাগরিক চরণদাদু

তেইশ

নষ্ট নারীর কত রূপ

প্রশ্ন তুলে বিব্রত করবেন না এই যদি কথা হয়, তাহলে শুরুতেই বলতে হয়, সভার কাজ ইতি টেনে মেয়েটাকে ডাকা হোক।

মেয়েটা কাঁচুমাচু হয়ে বসে থাকে। বিচার ব্যবস্থা পাকা করার অজুহাত যে সময়ের হাতে, গোটা ব্যাপারটাকে বন্দী করে ফেলা সে কি জানে!

এবার যে মেয়েটাকে ডেকে এনে মধ্যমণি করে ফেলেছে সে স্বগতোক্তি করে— সত্যি সত্যি আমার কত কিছুই না বলার আছে, আপনারাও শোনার জন্য একটু ধৈর্য ধরুন। ঘটনা ঘটার পর আমার শরীরের জ্বালা কতটা জুড়োল সেটা অবান্তর, সেই জ্বালা যে দগদগে ঘা-এর মতো কিংবা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি'র মতো মুখ খুলবে, কে বলতে পারে!

ঠিক আছে, এবার বিচার সভার কাজ শুরু করা যাক।

ক্লাব ঘরের বারান্দায় সভা বসেছে। লোকাল কমিটির দু'জন প্রভাবশালী মেম্বার, স্কুলের প্রাক্তন হেডমাস্টার, পাড়ায় দু'চারজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, শতরঞ্চি'র উপরে কেউ পদ্মাসনে, কেউ-বা হাঁটু ভাঁজ করে সোজা হয়ে হাতের উপর ভর করে, কেউ দেয়ালে হেলান দিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ইতি টানবে বলে গম্ভীর টান টান। চোরা স্রোত, মতামতের সুগন্ধি নিয়ে বসেছে, প্রয়োজনমত ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে নিজেও শুদ্ধ হবে, অন্যদেরও শুদ্ধ করবে। জ্ঞানের ভাঁড়ার উপদেশের সঙ্গে পাঞ্চ করলে কত যে অমৃত কখন বেরিয়ে আসে, সে কেবল সময়মত চালাচালি করলেই বোঝা যায়। হঠাৎই অনাহূত একটা মানুষের পায়ের শব্দে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। সেই একই ঠকাস ঠকাস শব্দ এক ছন্দোবদ্ধ তালে পা ফেলে ফেলে আসে। এ-মানুষটা আর কেউ হতে পারে না—'চরণদাদু'।

লোকটার প্রতি উপস্থিত সভ্যদের কারও ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা, কারও বা বিদ্রূপ, কারও-বা নিন্দা, এ-সব কিছুই তাদের চেতনার নিরিখে ঝরে পরে।

চরণদাদু সকলকে নমস্কার জানিয়ে স্যান্ডেলটা বুড়ো আঙুলের ফাঁক থেকে খুলে শতরঞ্চি'র দু'হাত দূরে একপাশে সরিয়ে রাখে। দু'একজন চোখ নামিয়ে দেখে—আরে এ-যে চরণদাদু'র 'পাদুকা' একটু গড় করে নে। চরণদাদু ওদের এই মিশ্র ভাবনাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়।

বনানী মধ্যমণি হয়ে বসলে সবার উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। আট-মাসের গর্ভিণী নারীর এমন ঔদ্ধত্য এলাকার মাথাওয়ালা লোকেরা মেনে নেবে না এটাই স্বাভাবিক। ওরা ভেবেছিল অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে ঐ মেয়েটি চোখ ভিজিয়ে নিয়ে বার বার কান্নার রোল ওঠাবে আর এই দেখে সব মাতব্বররা আহাঃ উহুঃ করে বলবে, 'মা, যা হওয়ার হয়ে গেছে, ব্যাপারটা আমরা দেখছি, মা তুমি এখন ভালয় ভালয় আপদটাকে বিদেয় কর।' কথা তো ফুটবেই না, বরঞ্চ...........

মেয়েটি মাথা উঁচু করে অত্যন্ত দৃঢ়ভঙ্গিতে সকলকে হতবাক করে জবাব দিল—আমি জানি ভদ্রমহোদয়গণ আপনারা আমার শ্লীলতাহানির জন্য অপরাধীকে খুঁজে বের করার সাহস করবেন না। কারণ সেই ক্ষমতা বা ইচ্ছে কোনটাই এই সভার সুধীবৃন্দদের নেই।

এইটুকুনি মেয়ের এমন বেপরোয়া গোছানো কথাবার্তায় ওরা ফিসফাস করা শুরু করে, এটা নিশ্চয়ই কারো শেখানো বুলি। এক কোণে গালে হাত দিয়ে বসে থাকা চরণদাদু'র

দিকে সবার নজর গেল। হয়ত ঐ লোকটাই এটুকুনি মেয়েকে সামনে রেখে ওর কথাটাই বলছে, না-হলে এ জোশ পেল কেমন করে!

রিটায়ার্ড হেডমাস্টার প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা মা, বলতো, তোমাকে কে কুপ্রস্তাব দিয়েছিল!

প্রশ্নটা শুনে বনানী'র চক্ষু চড়কগাছ, উত্তরটা জানা না থাকায় গুছিয়ে নিতে একটু সময় নিল।

ওরা ভাবলো, আচ্ছা কুপোকাত হ'ল মেয়েটি।

আমিই কুপ্রস্তাব দিয়েছিলাম। উত্তরটা শুনে তো ওরা লুফে নিয়েছিল প্রায়। চরণদাদু'র এই সভায় উত্তর দেওয়ার অধিকার না থাকায় হাত কামড়াল। মনে মনে ভাবল মেয়েটা এমন একটা কাঁচা উত্তর দিয়ে দিল শেষে, পুরো কেইসটাও ঘুরে গেল অন্য দিকে।

সভার সভ্যদের অবাক করে দিয়ে বনানী এবার ভ্রূ কুঁচকে ঠোঁট বেঁকিয়ে বাঁকা স্বরে জবাব দিল—একটি মেয়েকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে পেট করে দিল, আর আপনারা বলছেন 'প্রস্তাব', আমি কি খানকি মাগী যে লোক ডেকে এনে দিন দুপুরে.....।

কলকলিয়ে ওঠা পুরো সভা মুহূর্তে থ বনে গেল। কাঁচা শব্দ বললেও মুখের উপর জবাব হয়েছে এই তৃপ্তিতে চরণদাদু বনানী'র দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়াল।

পুরো সভাটা বন্ধ দরজার মধ্যে হলেও বাহিরের লোকজন ক্লাবঘরের বারান্দায় জড় হয়েছিল। বনানীর বিচারের রসালো সওয়াল-জবাব শোনার আগ্রহটা তাই পৌঁছেছিল তুঙ্গে। লোকাল কমিটি'র প্রভাবশালী নেতা উপদেশ দিল—শোন মা, তুমি একটু মিষ্টি ভাষায় জবাব দাও। এখানে সব শিক্ষিত সভ্য মানুষজন রয়েছেন। বনানী চোখ দুটো বড় বড় করে নিজের তলপেটে হাত দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ আপনারা সকলে শিক্ষিত আর আমি মূর্খ কিনা, তাই আপনাদের মতো শিক্ষিত লোকেরা আমার এই হাল করেছে।'

তুমি এই রকম করে বলছ কেন, দোষী প্রমাণিত হলে তার শাস্তি হবেই হবে, এ ব্যাপারে তুমি আমাদের বিশ্বাস করতে পার একশভাগ।

আপনারা তার টিকিটাও ছুঁতে পারবে না, যদি পারতেন, তাহলে এক ঘর লোকের সামনে ঐ কামুক লোকদের না ডেকে আমাকে নিয়ে বিচারসভা বসাতেন না!

পাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একজন বলল, 'তুমি উত্তেজিত হয়ো না মা, দোষী যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্ছে, ওদের অনুমানসাপেক্ষ ডাকা যায় না।'

ওঃ তাই বুঝি আমার জবানবন্দি চাইছেন। দেখুন আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি এই জমায়েতেও সেই শয়তানগুলোর চর আছে। কিন্তু আমি দেখিয়ে দিলে তো আপনারা বলবেন শুন্যে ঢিল ছোঁড়া হচ্ছে।

আজিজুল মাস্টার এই সভায় উপস্থিত আছেন, তুমি কি সেই দিকেই ইঙ্গিত করছ। বনানীর চোখ ঘুরতে থাকে পাগল লাট্টুর মতো। কতদিন যে মাষ্টার মশাইয়ের মুখোমুখি হয় নি। কতভাবেই না কত কথা বলতে চেয়েছে, দু'হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে নিতে চেয়েছে, সাহস হয় নি। বলতে চয়েছে, 'মাস্টার মশাই' 'আমার জন্যই আপনার মুখে

চারপাড়ার লোকজন চুনকালি দিয়েছে. ভাবী'র কাছে আপনার মতো ভালো মানুষের মাথা নত হয়ে গেছে।' একদিনের জন্যও মুখোমুখি হওয়ার সাহস দেখাতে পারে নি বনানী. শুধু চরণদাদুকে চিঠির উত্তরে জানিয়েছে, 'আজিজুল মাস্টার নির্দোষ'।

ঘটনার পরের দিন হতচকিত হয়ে বনানী কোন কথা বলতে পারে নি, শরীরের যন্ত্রণায় চুপ মেরে গেছিল। কোনও শব্দই যেন কদিন খুঁজে পায় নি. যা নিয়ে পুরো ঘটনার বিবরণ দেওয়া যায়। সব সাংবাদিকরা পর্যন্ত নিরাশ হয়ে ফিরে গেছিল, মানুষের উপর পুরো বিশ্বাসটাই যেন তলানিতে ঠেকেছিল। কিন্তু ঐ একটি লোক, যার স্নেহ মাখানো বরাভয়—ডান হাতের মায়াময় আঙুল ছোঁয়াতেই শরীরের ঘুমিয়ে যাওয়া স্নায়ুতন্ত্র যেন সাড়া দিতে শুরু করেছিল. বুঝেছিল বনানী, ও নিজেকে আস্তে আস্তে খুঁজে পাচ্ছে।

ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। আজিজুল মাস্টারের গুষ্টির তুষ্টি করে ছেড়েছে মাতব্বররা, কেউ কেউ এমন মাতব্বরি কথা বলতেও ছাড়ে নি—হিন্দুর মেয়ে দেখে বুঝি লোভ সামলাতে পারে নি। স্কুলের অন্য মেয়েদেরও বলেছে এই মাষ্টারের ক্লাসে না যেতে কিন্তু যারা আজিজুল মাস্টারকে তার দৃঢ়তা ও সততার জন্য ভালোবাসত, তারা পিছপা হয় নি, ওই গার্জিয়ানদের কথা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, 'এমন কাজ আজিজুল মাষ্টারের দ্বারা হতে পারে না।'

আজিজুল মাস্টারও মরমে মরে যাচ্ছিল, ঘরে তার এই বয়সের একটি মেয়ে রয়েছে, একই স্কুলে পড়ে। তার মনের অবস্থা যে কি দাঁড়াবে সেই ভেবেও অস্থির হয়েছিল। শবনম, বনানী'রও গলায় গলায় বন্ধু, সেও কদিন স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছে. বাবার এই অপমানের জবাব দেওয়ার জন্য ফুঁসেছে, কিন্তু বাঁধ সেধেছিল বনানীর স্বরের গোলমাল হয়ে যাওয়া। বনানীও ভেবেছিল রাতদিন, শবনম-এর কাছে মুখ দেখাবে কী করে!

ভিড়ের সামনে আজিজুলকে পেয়ে আজ আর নিজের ভেতরের আবেগ বনানী সংবরণ করতে পারে নি। গলার শব্দ নয় তো যেন বাঁধ ভাঙা জলের স্রোত উপচে পড়ে সকলকে মুহূর্তে ধুইয়ে দিল। দৌড়ে গিয়ে স্যারের পায়ের কাছে পড়ল, 'স্যার. আপনার কোন দোষ নেই। আমার জন্যই আপনাকে এমন করে হেনস্থা হতে হচ্ছে, আমাকে ক্ষমা করে দিন।'

আজিজুল কোন কথাই বলতে পারল না: চোখ দিয়ে গড়ানো জলের ফোঁটা ওর হাত দুটো ভিজিয়ে দিল—মা তুই আমার মেয়ের মতো, যারা তোর এমন দশা করল, তাদের কিন্তু আমি কিছুতেই ছাড়বো না।

উপস্থিত দর্শকরা যারা একটা রসালো আলোচনা শোনার জন্য এসেছিল এবং তাতে চটকে আরও নানা মশলা মিশিয়ে চাটনি বানিয়ে নানা গালগল্প বাজারে ছাড়বে বলে প্রস্তুত হচ্ছিল, তারা হতাশই হ'ল। কিন্তু লাভবান হল ঐ টি.ভি. চ্যানেলের লোকজন, এমন একটা লাইভ মুচমুচে নাটকের দৃশ্য হাতের মুঠোয়, এটা ওরা বাড়তি পাওনা হিসেবে পেয়ে খুশি খুশি ভাব ফুটিয়ে বলল, 'দিদি, এদিকে, একটু আমাদের কিছু কথা বলুন।'

সভার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ায়, লাইভ টেলিকাস্টে একটু অসুবিধাও হচ্ছিল—প্রতিনিধি'র কণ্ঠস্বর চওড়া হয়, স্টুডিও থেকে প্রশ্ন করে—হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি এখানে এলাকার

বহু মানুষের সমাবেশ হয়েছে, তাদের মুখে একটাই প্রশ্ন দোষীদের কি শাস্তি হবে, আমাদের নগরপাল বলেছেন...... শুনতে পাচ্ছ! যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

হেডমাষ্টার মহাশয় আবার মেয়েটাকে যথাস্থানে বসতে বললেন—বনানী..... মা, আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি......... তোমার কিছুতেই এই বাচ্চাটাকে জন্ম দেওয়া চলবে না।

আবার প্রতিনিধিদের শোরগোল—এইমাত্র সভার সিদ্ধান্ত হয়েছে বনানীর গর্ভনষ্ট করা হবে....... তোমার কাছে পরে আসছি, থানার ওসিকে........ টি.ভি.-এর পর্দায় ভেসে উঠল নানা তথ্য।

বনানী এবার সরাসরি চোখাচোখা উত্তর দিল—আমি আমার বাচ্চাকে রাখব কি রাখব না, এটা সম্পূর্ণ আমার নিজের ফয়সালা, এ-ব্যাপারে আমি আপনাদের কথা মানতে বাধ্য নই।

সভার মধ্যে মুসলিম-হিন্দু সভ্যরা উভয়ই কিন্তু এককাট্টা, এটা অবৈধ, নাজায়েজ আওলাদ, একে কিছুতেই পৃথিবীর আলো দেখানো চলবে না।

এই সিদ্ধান্তের জবাবে বনানী'র জোর সওয়াল—শরীর আমার, রক্তও আমার, কোষও আমার, গর্ভও আমার, সেটা আপন নিয়মেই বাড়বে। ও আবারও আদরে হাত বুলিয়ে জবাব দিয়ে চলল—এই সন্তানকে আমি নষ্ট করতে পারব না, আমি মা হওয়ার স্বাদ, আনন্দ প্রথম এই বাচ্চাকে পেটে নিয়েই উপলব্ধি করছি, মা হওয়ার স্বাদ থেকে আমাকে বঞ্চিত করা যাবে না।

কিন্তু এর পিতৃ পরিচয়!

তিন তিনটে লোক আমাকে ধর্ষণ করেছে, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই এর বাবা হবে।

সেটাও তো তোমার কথা, এটাও প্রমাণ সাপেক্ষ, আমাদের এলাকার লোকের উপর এমন কলঙ্ক তুমি চাপিয়ে দিতে পার না।

বুঝলাম, আপনাদের উপর মরণের খড়গ ঝুলিয়ে রেখেছে কেউ, এতই যদি ভীতু হন, তাহলে শুধু শুধু এই সভা ডেকে সকলকে অপমান করলেন কেন?

আজিজুল-এর বিচার করবো বলে।

আমি তো বলেছি স্যার নির্দোষ।

কিন্তু ঘটনার দিন কেউ কেউ তোমাদের দু'জনকে অফিসঘরে আপত্তিজনক অবস্থায় দেখেছিল।

সে ছবিও আমাদের কাছে আছে।

কীরকম আপত্তিজনক?

দু'জনের মুখোমুখি ঘন হয়ে বসা ছবি।

তাহলে আর কি, সোনায় সোহাগা,.সবাইকে তো হাতের কাছে পেয়ে গেলেন, ওয়ারেন্ট এনে পুলিশকে বলুন স্যারকে হাতকড়ি পরাতে।...... আপনারা সকলে মন দিয়ে শুনুন, উপস্থিত সভ্যদের দিকে তাকিয়ে বলা শুরু করে বনানী—স্যার, আমাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে অফিসঘরে নিয়ে এসেছিল, দারোয়ানকে দিয়ে অফিসঘরের

তালা খুলিয়েছিল, আমাকে ফাস্ট এইড বক্স খুলে প্রাথমিক ঔষধপত্র দিয়েছিল, আর আপনারা কিনা সকলে ষড়যন্ত্র করেই সেই ভালো মানুষটিকে ফাঁসিয়ে দিচ্ছেন, আপনারা কি মানুষ!

কিন্তু লোকে তো বলছে অন্য কথা।

তোমার সঙ্গে আজিজুল স্যারের গভীর সম্পর্ক আছে!

হ্যাঁ আছে, তবে গভীর কিনা বলতে পারব না, একজন স্নেহপ্রবণ শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রী'র যতটুকু সম্পর্ক থাকা উচিত।

ঠিক আছে, তা আর বলার প্রয়োজন হবে না, ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক তো এখন কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে, সেটা তো আমরা জানি।

তাহলে সবই যখন আপনারা জানেন, দয়া করে মেয়েদের আর স্কুলে পাঠাবেন না, তাহলে আপনাদের ঘরের মেয়েরা তো ধর্ষিতা হয়ে যাবে আমার মতো, তাই না!

তা কেন?

সম্পর্কটার মাধ্যম যখন শিক্ষার বদলে ভোগের, স্নেহের বদলে শরীরের, মেয়েদের ঘরে ঢুকিয়ে রাখুন, কোথাও একটা ঘটনা ঘটেছে বলে সব সুন্দর সম্পর্কে কালি ঢালা যায় না।

রিটায়ার্ড হেডমাস্টার তো তো করেও ঘাড় নাড়তে গেলে কার অঙ্গুলি হেলনে চুপ করে গেলেন। লোকাল লিডাররা শেষে উল্টোদিকে ঘুরে যাচ্ছে দেখে মন্তব্য করলেন, এমনটা কি হতে পারে! সবটা বানানো গপ্পো!

অনেক ঘটনাই তো ঘটে যার কোন সাক্ষ্য প্রমাণ থাকে না, তাই বলে ঘটে যাওয়া ঘটনটি তো মিথ্যে হয়ে যায় না।

চব্বিশ

যেমন খুশি তেমন সাজ

চরণদাদু এ-সমাজ ছেড়ে কোথায় যেতে পারে, এমন একটা চিন্তা ওকে পেয়ে বসে। বনানী'র সাহসে মোড়ান কথার বহর দেখে মনে হ'ল কি ওর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। মেয়েটা এত সহজে জেগে যাবে উনি কল্পনায়ও আনেন নি। বনানী'র ভেতরটার যে তোলপাড় শুরু হয়েছে এই ঘটনার ধাক্কায়, চাল সেদ্ধ হওয়ার পর ফুটতে ফুটতে কখন যে ভাত হয়েছে, সে জবাব নিজের কাছে নিজে পায়।

বনানী'র কথা রুক্ষ সুক্ষ্ম হয়েছে বটে, রুক্ষতাকে পরিপাটি করে এমনভাবে পরিবেশন করা হয়েছে, খোলস ছাড়ালে শাঁসটা পেতে পারে চটজলদি।

দিঘিটা আজ বড় দেখাচ্ছে কেন? পদ্ম ফুল ফুটে আছে, চারধারে লাল-সবুজ রং ছড়িয়ে গোলগোল পাতা, পাতার উপরে নাচে জলপোকা, ঢেউ-এর দোলায় ফুরুত করে

পালিয়ে যায়। মানুষগুলোই বা এক একটা পোকা ছাড়া আর কি। একটুখানি নড়াচড়া খেলেই পালিয়ে বাঁচে। নুরুল এসে প্রায় ধমকের সুরেই বলে গেল—বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে না চরণদাদু, সময়টা কিন্তু পাল্টে গেছে, এখন তুমি ইচ্ছে করলেই সব কিছু করতে পার না, আমাদের একটা অনুমতি তো চাই, মনের উপর একটু বিড়ালের থাবা বসাও, আখেরে সবার লাভ হবে।

চরণদাদু যেন মুশকিল আসানের পথ খুঁজবে বলে তৈরি, নিজেকে একটা যন্ত্র বই তো কিছু মনে হয় না, আবার পরক্ষণেই মনে হতে থাকে যন্ত্রের মধ্যেই জমে আছে স্নেহের বিন্দু বিন্দু ঘাম, যা তাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

চরণদাদু কি সমস্যাই খুঁজে বেড়ায়, না সমস্যাই পরোক্ষে ওকে চালনা করে!

চরণদাদু নিজেকেই এমন কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যে নিজেও সেইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না, এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছে যায়, যেখানে হাজারো প্রশ্ন করেও উত্তরের আশা করা জলে আগুন তাড়া করার মতোই অবাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের মতো সবটার মধ্যেই বাস্তবতার নিরিখে উত্তর খুঁজতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে, কারণ সমস্যার অন্তহীন যাত্রায় বাস্তব আর অবাস্তবের পরিমাপ বোধ হয় এভাবে করা যায় না। বাস্তবতার মধ্যেই যে অবাস্তবতার মুখ লুকিয়ে আছে—এ-কথা চরণদাদু স্বীকার করার ঔদ্ধত্যও পোষণ করে, আর সেই অতল জলে হাতড়ে মরে কত কথা।

সুজাতা'র তাৎক্ষণিক অভিযোগকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে খুলে ফেলে এক একটা দরজা। কত যে আলোর বিকিরণ, কত যে অন্ধকার, সেই অবসর কোথায় ভাগাভাগি করার, নিজের ছন্দেই চোখ মেলে চরণদাদু দেখতে চায়—পথ চলতে পারবে তো! সুজাতা দৃপ্ত ভঙ্গিতে আঙুল নাড়িয়ে বুঝিয়ে দেয়, ভেতরে যার উপছে পড়া আলো, সেই আলো ধার নিয়ে চলতে গেলে বাধা কোথায়!

চরণদাদু আওয়াজের তালে তালে মনের খবর যাচাই করে, চলার ছন্দই চিনিয়ে দেয় কতটা পথ পার করে কোথায় গেলে মিলতে পারে সেই ছন্দের ঠাকুরাইনকে। কত কথা মনে আসে, পুকুরটার জলটা যে শুকিয়ে মাটিতে মিশে যাচ্ছে, জলের দাগ যেন খেলা করে মাটির বুকে, মাছেরা মুখ লুকিয়েছে কাদায়, খানা-খোন্দরে, ভুট-ভাট আওয়াজ করে বুজকুড়ি কাটলেও মুখগুলোকে লুকিয়ে রেখেই জানান দেয়, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটে।

বনানীকে এ-পথে ও-পথে আসা যাওয়ায় জলে ডোবা মাছের মতোই লাগে। আজিজুল মাষ্টার নীড়ে বসে এক এক করে খড়কুটো দিয়ে মনের কোনে ভাবনার বসত গড়ে। বনানীকে বাঁচানোর এতটুকু পথ খোলা নেই, থাবা বসিয়েছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে সুবোধ চৌধুরী'র চেলা-চামুন্ডারা। এইটুকুনি মেয়ে যে এমন করে লড়াই দেবে চরণদাদু চিন্তাই করতে পারে নি। কি কি পরিকল্পনা ওর মধ্যে এই সময়টুকুতে জন্ম নিয়েছিল এবং তার যে কতমুখ, বোঝা যাচ্ছে না আগাম।

সুবোধ চৌধুরী এসে যে রং চড়িয়েছিল, চরণদাদু বেশ উত্তেজিত হয়ে জবাব

দিয়েছিল—অবাস্তব, আজিজুলকে এমনটা ভাবতে আমার বিবেকে বাঁধে। মানুষের চেনা-পরিচয়ের গণ্ডিটা এতটা ঠুনকো নয় সুবোধবাবু, যে এত সহজে কোন কিছু ঘটে যেতে পারে, তারও তো একটা সময় চাই।

সুবোধবাবু পাঞ্জাবির পকেট দু'হাতে চেপে জবাব দেয়, আপনি মানুষকে কতটুকু চেনেন চরণদাদু জানি না, তবে আজিজুলকে চিনতে আমি এতটুকু ভুল করি নি, হিন্দুর মেয়ের প্রতি ওর নজর চিরকালের, শুধু শিকারের অপেক্ষায় দিন গুনছিল এতদিন. এ প্রমাণ হাতেনাতে আছে আমার।

চরণদাদু মাটিতে মিশে যায়, ওর চিন্তাগুলো গুলিয়ে যেতে শুরু করে, এ যেন ওর নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই, মানুষের চিন্তাগুলো ওর মাথায় জমিয়ে নিয়ে একটা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান দিতে চেয়েছিল ও, আর তারই কিনা এতটাই অদূরদর্শিতা। সুবোধবাবুর কথার পরে কথার জুতসই জবাব দিতে না পেরে উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকল ক্ষণেক।

সুবোধ চৌধুরী তৃপ্তির সীমানা ছোঁয়ায় একটু আত্মশ্লাঘা অনুভব করল। সেদিন স্কুল কমিটির মিটিং-এ নাজেহাল হওয়ায় একটা মোক্ষম চাল দিয়ে কাত তো করা গেল এমন এক চালু মালকে! 'না, না, আপনি এমনটা ভাববেন না চরণদাদু, পৃথিবীতে এমন অনেক অবাক করার মতো বস্তুই চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, একেবারে অগুণতি, মেলাতে চাইলেন কি মরলেন।'

চরণদাদু ভাবে তাহলে কেন গণপতি চরণদাদু বনে গেল, তবে কি মানুষ নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করতে গিয়ে, বার বার করে খোলস পাল্টাতে গিয়ে নতুন নতুন রং-এ রাঙিয়ে নিচ্ছে। এ যেন নিজের কাছেই নিজের অহেতুক জিজ্ঞাসা।

আবার কি ঝাঁকিয়ে দেখবে নাকি গণপতি বেঁচে আছে কিনা!

এতদিন পর এমন কি প্রয়োজন হ'ল যে গণপতিকে দেখা চাই।

বিশ্বাসে চির ধরলে ভাঙা নৌকোয় জলের ভুডভুড়ি'র মতোই দুশ্চিন্তা'র ভারে শরীর-নাওটা ডুবতে থাকে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে।

আজিজুলকে এ-বিশ্বাসের যাদু থেকে ছাড় দিলেও ছেঁড়া জালে আরও যে কত রুই কাতলা দাপাদাপিতে মুখ দেখাবে, তারও কি ইয়ত্তা আছে!

বিষ্ণু সামন্ত হঠাৎই একদিন বড় মুখ করে চরণদাদু'র সামনাসামনি দু'চার কথা বলে দিয়েছিল, না-ছিল কোন ছিরিছাঁদ, আর না ছিল কোন অর্থ, শুধুই এক অল্পস্বল্প হুঁশিয়ারি, ভদ্রতার আলগোছে মিছরির ছুরি। ছোট্ট করে কানের কাছে—কেন লাগতে যাচ্ছেন বলুন তো, জাগরণী ক্লাব সেক্রেটারি আবির লাল-এর মতো ভালো মানুষের সঙ্গে। আরে মশাই আজ বাদে কাল কিংবা পরশু যখন 'এশিয়ান পেন্টস্', 'স্টার আনন্দ'-এর 'সেরা প্রতিমা আর মন্ডপ'-এর সম্মানটা ছিনিয়ে নিয়ে সকলের নাকের উপর ঝামা ঘষে দেবে, সকলে একে নিয়েই ধ্যাই ধ্যাই করে নাচবে, তখন কি হবে! পাবলিক যাকে মানবে, লুচ্চা-লাফাঙ্গা হলেও, সকলে পাশে বসিয়ে জামাই আদরে তাকে খাতির করবে। যান, বেশি নাক গলাতে আসবেন না, শেষে এই বুড়ো বয়সে নাকটা যাবে, লোকজন জিব ভেংচিয়ে ডাকবে 'নাক-

কাটা চরণদাদুরে'। আপনি ভাবছেন এ তল্লাটে আপনার মতো লোকের কাছা খুলে দেওয়ার লোক কোথায়! আরে ধ্যুৎ! আমার আঙুলের তুড়িতে সবাইকে নাচাতে পারি, বুঝলেন, খালি একবার হুঁ করলেই দিনকে রাত বানিয়ে দেবে, এ-থোবড়া আর চিনতে পারবে না, আপনার চোখের সামনে দিয়ে আবির পাল সকলের কাঁধে চড়ে মঞ্চে উঠবে আর প্রধান অতিথির চওড়া ভাষণ মারবে আর পেছনের ভাঙা চেয়ারে বসে আপনি আর ঐ চেলা আজিজুল চক্ষু ছানাবড়া করে দেখতে থাকবেন, আর এক সময় মড়াৎ করে ভেঙে পড়বেন, লোকে আপনাদের দেখে হো হো করে হাসবে।

চরণদাদু হতভম্বই হয়ে যায়—কী বলবে, ভেবে না পেয়ে বিষ্ণু সামন্তকে নরম গলায় জিজ্ঞেস করে—বিষ্ণু, তোমার মাথা খারাপ হয়ে যায় নি তো!

বিষ্ণু সামন্ত হাসল—জমানা পাল্টে গেছে চরণদাদু, মাথা আমার পুরোপুরি সাফা, আপনার ঘিলোটা বরঞ্চ টেস্ট করিয়ে নিন, কি জানি কোন পোকামাকড় ঢুকে পড়েছে হয়ত বা।

কথাটা বিষ্ণু সামন্ত মিথ্যে বলেনি—চরণদাদু'র মাথায় মাঝে মাঝে কত কিছুই না কিলবিল করে ওঠে।

বিষ্ণু সামন্ত'র ধুরন্ধর মাথা এখানেই ক্লিক করে যায়।

বিষ্ণু সামন্ত'র কথায় চরণদাদু দমে যাওয়ার পাত্র নয়। ও যে বিন্দুমাত্র রাস্তা ছাড়বে না, সেটা চরণদাদু'র অজানা নয়। তবু ভারি ভারি কথা তো, একটু আধটু ধাক্কা না দিলেই যে নয়। ফাঁকা মাঠে গোল করতে আনন্দ নেই ঠিকই, ক্ষণিকের তৃপ্তিও আছে বটে, কিন্তু জবরদস্ত প্রতিপক্ষের অভাবে শক্তির যাচাই হচ্ছে না দেখে ওদের পাখা গজায়, অতি দর্পে হত লঙ্কা, যতক্ষণ না পর্যন্ত মাটিতে এসে লুটোপুটি খায়। আঘাত পেলে ওষুধটাও একটু হালকা করে দিতেই হয়, জিইয়ে রেখে পরে এক সময় সুযোগ বুঝে প্রাণভোমরা টিপে দিলেই চলবে।

চরণদাদু ঘটনার এত যোগসূত্র পেয়েই নিজেই সাবধানে পা ফেলতে শুরু করে। কোন দিক থেকে ঢিল মারলে মৌমাছি বন বন করে বের হতে শুরু করবে, সুযোগ বুঝে মৌ চুরি করে আনবে। এইসব চিন্তায় মাথাটা ভোঁ ভোঁ করে ঘোরে দিনরাত।

বাজারের উল্টো দিক থেকে মাটি আর ইঁট সুরকি মেশানো রাস্তাটা আজ এত বছর বাদে কংক্রিটের রাস্তা তৈরির জন্য মিউনিসিপ্যালিটি অনুমোদন দিয়েছে, কুড়ি ফুট রাস্তা তৈরির জন্য চারপশের বেনামি দোকানঘর, ঝুপরি ভাঙা পড়বে বলে গুঞ্জনও শুরু হয়েছে। কালই থানার ওসি এসে একপ্রস্ত হুঁশিয়ারি দেওয়ায় বিষ্ণুও শাঁসিয়েছে;বিনা মেঘে বজ্রপাতে'র মতোই যেন রাস্তাঘাটে, চায়ের দোকানে, সেলুনে, ক্লাবঘরের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে ওর চামচারা হুমকি দিয়ে গেছে-প্রশাসনকে কেউ এ-ব্যাপারে মদত দিলে ফল ভালো হবে না। ঐ ঝুপরি ঘরগুলোর অন্দরেই রমরমা চলছে সাট্টা আর জুয়ার আড্ডা। এলাকার মানুষের মনে ফলে স্বস্তি হলেও বিষ্ণু সামন্ত'র মতের বিরুদ্ধে কথা বলে এমন সাধ্য কার! যত বেআইনি কাজ ও এতকাল সামলে এসেছে সবই মজিদ খানকে শাগরেদ

করে, ওদের কথায় নাকি প্রশাসন ওঠবস করে, জো হুজুর বলে দায় সামলায়, কিন্তু এতকাল বাদে এবারই একটু ব্যতিক্রম, সোনার সংসার ডুবতে বসেছে।

এলাকার মানুষ ভোরের স্বপ্ন ভাঙার আগেই দেখতে পেল এমনই এক দৃশ্য, যা ওরা স্বপ্নেও দেখার সাহস করে নি। এখানেই নাকি সেলুনের আড়ালে চলছে বকলমে রাতের আঁধারে দেহব্যবসা। পুলিশ রেড করে ধরপাকড় করছে, নানা বয়সের মেয়েরা, কলেজ গার্লসরাও জালে উঠেছে। সাজগোজের পয়সা রোজগারের ধান্দায়, সুন্দরী হওয়ার লোভে ওরা এতটাই বেপরোয়া ছিল, লাজশরমের পর্যন্ত মিথ্যা অভাব-এর দোহাই দিয়ে মাথা খেয়েছে, কেউ-বা শরীরের ডাককেই স্বাগত জানিয়েছে নির্দ্বিধায়।

এই সেলুনের মালিক মাজিদ খান হলেও, ভাড়া দিয়ে ব্যবসা চালায় বিষ্ণু সামন্ত। শোনা যাচ্ছে, শত্রুপক্ষের 'দাদা' বধির মন্ডল নাকি নাটের গুরু এই চক্রান্তে। ওই নাকি আগাম খবর দেওয়ায় পুলিশ সাদা পোশাকে এসে ওৎ পেতে ছিল। পুলিশের খোচরের কাজ করত এই এলাকার রতন ঘোষ। এই রতন ঘোষই বধির মন্ডলের ডান হাত। তাই বিষ্ণু সামন্ত'র প্রথম টার্গেট রতন। সুযোগ বুঝে থ্রি নট থ্রি স্যাটাস্যাট্ চালিয়ে দেওয়ার গোপন নির্দেশও এসে গেছে বিষ্ণু সামন্ত'র দরবার থেকে। দলের লোকদের রক্তচক্ষু এড়িয়ে এখন কোন কাজ করা প্রায় ষাঁড়াষাঁড়ি বান-এ সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার সমান।

এমন একটা গোলমেলে অবস্থায় এখানকার ছা-পোষা লোকগুলো ঘরে ঢুকে গেলেও, চরণদাদুর পায়ের আওয়াজ কিন্তু থেমে থাকে নি। ওসি সমুদ্র গুপ্ত এসে বারবার সাবধান করে দিয়েছে—চরণদাদু, চারপাশের আবহাওয়া কিন্তু সুবিধের ঠেকছে না, আপনি কিন্তু যখন তখন বেরিয়ে পড়বেন না। কিন্তু একটা ঘটনা ঘটে গেলে আমরা কিন্তু দায়ী থাকব না।

চরণদাদু টেবিলের উপর মাথা রেখে ভাবতে বসে। ধীরে ধীরে সমাজটা এভাবে পাল্টাচ্ছে কেন? এর জন্য দায়ী কে? এ-প্রশ্ন ও নিজের কাছে রাখে, কখনও পাগলের মতো শূন্যে ছুঁড়ে মারে, অদ্ভুত এক দ্বন্দ্ব এসে নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। মানুষেরও চাওয়া পাওয়ার সবটাই কি বাঁচার প্রয়োজনে, না কোন নির্দিষ্ট কিছু নিয়মের দাসানুদাস হয়ে সে প্রতিরোধ ছুঁড়ে দিতে থাকে।

সমাজের দুই জন শত্রু একজন অন্যজনের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে, তারা দাবী করছে তাদের অধিকার, যে অধিকার আদপেই কখনও ধোপে টেকে না। তাহলে একজন সাধারণ নাগরিক হয়ে চরণদাদু কি করতে পারে!

চরণদাদু নিজে বিপন্ন বোধ করতে থাকে এ-দমবন্ধ করা, অনিয়মিত নিশ্বাস-প্রশ্বাসে তৈরি হওয়া বাতাসের খামখেয়ালিপনায়।

থানার বড়বাবু যখন চোরকে শাসানোর পরিবর্তে চরণদাদুকে সাবধান হতে বলে, চরণদাদু মেনে নিতে পারে না। সুরক্ষা না দিয়ে আতঙ্কের আবহাওয়া তৈরি করে ফেলা। এ-এক আঁধার কালো কুৎসিত রূপ, চরণদাদুর মনটা ভেঙে পড়তে চায়! কোথায় যাবেন তিনি?

জোনাকি পোকারা দু'একটা মিটমিট করে জ্বলে উঠলে দেখতে পান, আঁধার ফুঁড়ে কারা যেন পালাচ্ছে। কেন পালাচ্ছে? কীসের এত ভয়? কাদের ভয়ে? সত্যিই কি ওরা সস্তায় বাজিমাত করতে চেয়েছিল, জীবনটাকে মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে, সোজা নিরাপদ পলায়নকেই শ্রেষ্ঠ বাঁচার পদ্ধতি ধরে নিয়েছিল।

চরণদাদু পিং পং বলের মতো এপার ওপার করে, যাবার সকল রাস্তা যে রুদ্ধ হয়ে আছে।

পুলিশ এসে প্রশ্ন করে—আপনি কিছু বলুন, চরণদাদু!

আমি তো সবসময়ই বলেই চলেছি, আপনারা শুনছেন, কোথায়! তবে কি আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বলাতে চাইছেন যে অসামাজিক কাজগুলো আমলাদের মদতে এতকাল চলে আসছে, সেটাই সঠিক! আর কেন? জবাব দেবে কে?

চরণদাদুর শরীর কেঁপে ওঠে। এ-বিপন্নতায় সাধারণ মানুষগুলোকে রক্ষা করার দায় আইনের শাসনের, না-কি নিজেও দায় বয়ে নিয়ে বেড়ানো উচিত ছিল, এধার ওধার, ফল যাহা হোক না কেন!

এমন এক প্রশ্নাতীত মুহূর্তে সুজাতা এসে এক মুখ আতঙ্ক ঢেলে দিল--রক্ত, রক্তের ঢল আসছে।

কোথায় দেখলি তুই?

নিম গাছের নিচে।

ভালো করে দেখেছিস তো!

হ্যাঁ, জলজ্যান্ত মানুষ উবুর হয়ে পড়ে আছে।

এত রক্তের ঢল বইছে, অথচ কোন মানুষ দেখলো না।

না, কেউ নেই, কোন নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পাই নি।

দেখছিলে, সারা পাড়ায় কোথাও আলো জ্বলছিল!

তুই কেমন করে টের পেলি!

তাইতো কেমন করে টের পেলাম।

মনে করার চেষ্টা কর।

হ্যাঁ মনে পড়েছে, শব্দ শুনতে পেলাম যে, কেউ যেন টেনে হিঁচড়ে নিম গাছের নিচে কিছু একটা ফেলে গেল।

তুই কি কি আশংকা করে ছিলি?

অত ভাবনার সময় ছিল না যে।

ঠিক দেখেছিস তো?

তুমি একবার চাক্ষুষ করে এস।

চরণদাদু গুটি গুটি পায়ে টেবিল থেকে পা-টা নামিয়ে বেড়িয়ে যায়। আবার কিছুক্ষণ পরে অন্য মানুষটি হয়ে ফিরে আসে।

'আজিজুল! আজিজুলকে ওরা মেরে ফেলেছে।.....

ওরা মোক্ষম জায়গায় আঘাত করে আগাম হুঁশিয়ারি দিয়েছে, আর যেন এক পাও না এগোই। প্রথম অস্ত্রটি ওরা আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে প্রমাণ করতে চাইছে, আমি কতখানি হজম করতে পারছি।

চরণদাদু এবার মনের কোনে ব্যথা অনুভব করে, ইচ্ছে করে এ সংসারকে দুমড়ে-মুচড়ে শেষ করে দেয়।

আজিজুলকে মেরে ওরা কি প্রমাণ দিতে চাইছে-সত্য গোপনে ঘুমিয়ে থাক, তাকে মেলে ধরতে যেও না, ঘাড় মটকে দেব।

আরো কাজে নতুন ইশারা এসে কিলবিল করছে, যাকে উদ্দেশ্য করে এই প্রাণ নেওয়ার খেলা খেলছে, সেই কেবল তা বোঝে।

এখন চরণদাদু কি করে!

গোটা লাশটা যদি ওরা গায়েব করে দেয়, তাহলে ওরা চরণদাদুকে পাগল সাজিয়ে প্রমাণ করতে চাইবে, ও যা বলে বেড়াচ্ছে সব পাগলের প্রলাপ। এমনও তো হতে পারে, চোরা শিকারী আঁধারকে আড়াল করে এই আসা যাওয়ার ভি.ডি.ও. করে রাখছে, চরণদাদুকে উল্টো ফাঁসিয়ে দেওয়ার মতলব যেন—কোন সম্ভাবনাই বাতিল করা যাচ্ছে না।

সুজাতা'র এখনও রক্ত রক্ত চিৎকার থামে নি, গলা কাটা শরীরটা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, আজিজুলের খোলা চোখটা ওর দিকে এখনও যেন জুলজুল করে তাকিয়ে বলছে—চরণদাদু, তুমি হাল ছেড়ো না, আমার এ কলঙ্কের একটা বিহিত তুমি করো।

এত বড় একটা বিরাট চাঁই যারা ওত পেতে রয়েছে চারপাশ, পা রাখতে গিয়েই যত বিপদ, আজ আর আজিজুল নেই, কে ওকে পা ফসকাতে গেলেই এক ঝটকায় টেনে তুলবে।

মৃত্যুর ঘ্রাণ বাতাসে ভাসলেও মাছিদেরও এখনও টেনে আনে নি তো আজিজুল, বিন্দু বিন্দু আলো এসে পড়তে থাকে মরা শরীরের উপর, আবার যেন মিলিয়ে যায়। চরণদাদু চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে মেহগনির আড়ালে। কতগুলো শরীর এসে শবটাকে টেনে তোলার চেষ্টা করে, মরা শরীরটা এখন ওদের কাছে কিছুই নয়, এক কৌশল ফাঁদার মাধ্যম শুধু। ওরা আজিজুলের হাত দুটোকে কটাস শব্দে কেটে দু'টুকরো করে ফেললে, আলো-আঁধারির টুকরো টুকরো ছায়ারা ফিক করে হেসে ফেলে। এবার চোখ দুটোকে উপড়ে নেবে বলে আর একটা ছায়া কোমরে গুঁজে রাখা ধারালো ভোজালিটা বের করে।

চরণদাদুর ফোঁটা ফোঁটা কষ্ট হয়। আহাঃ এ-দুটো চোখ দিয়ে না ও মানুষের কাছে বিচার চেয়ে করুণ চোখে তাকিয়ে থাকত, স্ত্রী-কন্যা'র কাছে নির্দোষ সাজার আকুলতায় আবেগে ভেসে যেতো, চরণদাদু'র চোখে চোখ রেখে বলেছিল—এই দুনিয়াতে আর ভালোমানুষের জায়গা নেই চরণদাদু।

আজিজুল বলতো, 'আচ্ছা চরণদাদু, দুনিয়াটা কেমন করে পাল্টে যায়, সময় কেমন করে সবকিছু গুলিয়ে দেয়, সব নতুন তরতাজা মানুষগুলো পুরনো বাসি হয়ে যায়।

আমরাও বোধ হয় একদিন বাসি ফুলের মতোই নর্দমায় পড়ে থাকব, তাই না।'

চরণদাদু'র এর পরে আরও যে দৃশ্য দেখবে এর জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। ওরা ওর অণ্ডকোষটা দু'ভাগ করে, পুরুষাঙ্গ টেনে ছিঁড়ে ফেলে। এরপর আর কি করবে সেটাও চরণদাদু জানে, শরীরটাকে মাংসের টুকরো বানিয়ে বস্তাবন্দী করে। চরণদাদুও ওদের পদ্ধতিটা অনুসরণ করে। মোবাইলে বন্দী করে ফেলে পুরো নাটকটা।

কে? কে ওখানে?

ছায়ারা কে একজন টের পায়। আবছা আলোতে তিনটে মুখ স্পষ্ট হয়ে যায়—আবির, মজিদ খান, বিষ্ণু সামন্ত। আবিরই মেহগনির আড়ালকে ধরে ফেলেছিল। চরণদাদু মোবাইল সেটটাকে বুকে চেপে ধরে রাখে, যেমন করেই হোক, ও সেই সেটটাকে বাঁচিয়ে রাখবে। ঠিক করে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবে, বধির মন্ডলকে দিয়েই ওদের ফাঁসাবে। শয়তানদের শায়েস্তা করার এই মুহূর্তে আর কোন মতলব ওর মাথায় এলো না।

ছায়ারা অন্য একজন বলল, 'গুরু, সব্বনাশ, কে একজন আমাদের ফলো করেছিল, কোতল করার ছবিটা না তুলে নিয়েছে।

ছাড়তো, এসব কথা পরে ভাবা যাবে, শত্রুকে তো খতম করে দিয়েছি, আমাদের লাইন মেনে না চলার মজাখানা দেখ। এবার, এখন প্রমাণ করা সহজ হবে যে 'ঐ ভালো মানুষের বাচ্চাটাই রেপ করেছে, আমাদের জামানত আমরাই অনুমোদন দিচ্ছি। ঐ মেয়েটাকে এবার আমরাই মনের সুখে ভোগ করব...... যা একখানা মাল মাইরি, কচি মাংসের দলা, চেটেপুটে খাব এবার।

কথাগুলো কানে এলে চরণদাদু আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না।

রতন ঘোষ-এর নাম্বারটা চরণদাদু'র মোবাইলেই ছিল।

পচিশ

জলের তলায় ঘুমিয়ে আছে

আবির পুলিশের জালে ধরা পড়লে ওরা এলাকার একমাত্র খোচর রতন ঘোষকে খাওয়ানোর অছিলায় ডেকে নিয়ে গিয়ে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক গুলি করে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। খবরটা তখনও চরণদাদুর কাছে এসে পৌঁছয় নি। খবরের কাগজটা নিয়ে চোখ বুলাচ্ছিল, স্বাধীনতা দিবসের আগে লম্বা-চওড়া শিরোনাম-ভারতবর্ষের উন্নতির মার্কামারা পরিসংখ্যান..... জন্ম, মৃত্যু, শিক্ষা স্বাস্থ্য'র ডাটা দিয়ে দেখানো হ'ল বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার দৌড়ে আমরা কতটা এগিয়ে, দু'হাজার পঞ্চাশ সালে ভারতই হবে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ। আশায় মরে চাষা, দূরবিন দিয়ে এ-ছবি ধরা যাবে কিনা জানা নেই, কিন্তু চরণদাদু'র এলাকার মানুষদের অসম বিকাশটা ওর কাছে দেশের চেয়েও পরম সত্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সুজাতা দেখেছিস আজকের কাগজ। সবইতো সুন্দর পরিপাটি করে দেখিয়েছে মানুষের প্রবৃত্তির সীমা যে ভোগের হাত ধরে বাড়ছে, সে কথা কে বলবে বল! এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, কেউ এখনও পর্যন্ত একটু খবরও করল না।

কেন তুমি লেখ না! কলম তো রয়েছে। রাষ্ট্রপতিকে নিজের যন্ত্রণার কথা দরদ দিয়ে লেখ।

চরণদাদু কোন উত্তর করে না, গত রাতের বিভীষিকার ঘোরেই, কথার ফাঁকে ফাঁকেই ঝিমিয়ে যায়, সুজাতাকে পড়ে শোনাতে গিয়ে জিব জড়িয়ে যায়। কোন কিছুই আর গুছিয়ে ভাবতে পারছে না। কেন যে এমন হচ্ছে, চরণদাদু নিজেও বুঝে উঠতে পারছে না। চারদিক অন্ধকার লাগে।

এলাকার মানুষ নির্বিকার। গত রাতের এক পৈশাচিক হত্যা কি ওদের মধ্যে কোনও সাড়াই ফেলে নি! নাকি এখনও ভাবনার ওলটপালট ঘটিয়ে বুঝে নিতে পারে নি, কোন দিকে এগোলে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। এটা ঠিক, অন্ধ পৃথিবী যেমন করে জ্যান্ত মানুষ দেখে, চক্ষুষ্মান পৃথিবী বাসি মরাকে তেমন করে দেখে না। জনগণ এখন নির্জীব অথচ চঞ্চল। নিজের কাছে ফিরে আসার অশেষ চেষ্টাও কোন কাজে লাগতে পারছে না। এটা কেন, এ-চিন্তা তাদের বিব্রত করে না! মেনে নেওয়াটা যে মানুষের এখন আদত, মুখ বুজে থাকাটা স্বাভাবিক মানুষের এক বিশেষ গুণ হিসেবে ধরা হয়।

বনানী এ-চিন্তাকে চুরমার করে দিয়ে নিমগাছের নিচে এসে দাঁড়ায়। মেয়েটির শরীরে এখন কুমারী মায়ের সব লক্ষ্মণ ফুটে বেরুচ্ছে, কার এমন কি ক্ষমতা, তাকে রোধ করে। অবাক করা এক তৃষ্ণা নিয়ে চরণদাদু'র হাতটা চেপে ধরে-লড়াইটা এমন করে থামিয়ে দিয়ে আজিজুল স্যার চলে গেল, ঠিক কথাগুলো সঠিক জায়গায় বলার আমাকে একটু সুযোগ দিল না।

আবহাওয়াটা কেমন বুঝছ।

বেসুরো, নোংরা, সব কূপমণ্ডুক।

এর থেকে পরিত্রাণ!

এ-প্রশ্ন আমার মতো এক ছাত্রীকে কেন চরণদাদু, সুবোধ চৌধুরীদের করুন।

তোমার কথাগুলো বড্ড কড়া, লুফে নেওয়ার আগেই তালুতে গনগনে আঁচ লেগে পুড়ে যায়।

এমন ধারণা আপনার। এটা কি আমার জীবনের বিপদের চেয়েও তেতো। হট্ হট্ শব্দ শোনা যায় চরণদাদুর বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোন থেকে, ওদিকে গাছ-গাছালি, ঘন জঙ্গল। কুব কুব শব্দ, গাছের পাতাগুলো দুলে দুলে আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িয়ে গিয়ে ঘন হয়। ঘনত্ব দিনে দিনে বাড়ে, পা-ফেলতে গেলেই মাটির ঢেলাগুলো কঁকিয়ে ওঠে। ওদিক থেকেই যেন কথামালা সেজেগুজে চরণদাদুর বাড়ির ওপারে এসে জলে'র সামনে থেমে যায়। ভাগ্যিস ঐ বেড়াটা ছিল।

চরণদাদুকে বের করে দাও, আজিজুল এর হত্যাকারীকে আমাদের হাতে তুলে দাও।

বনানী জিজ্ঞেস করে—তোমাদের এমন মিষ্টি সুখবরটা কে বিতরণ করল!

কেন মজিদ খানই আমাদের এ-খবর দিয়েছে।

আর অমনি তোমরা বিশ্বাস করে নিলে।

জলের ঢেউগুলো মানুষের কলরবে এলোমেলো হয়ে পাড়ে আছড়ে পড়ে। ওদের কথাগুলোর-ঝাঁঝ আস্তে আস্তে তরল হয়ে উবে যেতে থাকে।

বনানী একবার নিজের তলদেশে হাত রেখে জিজ্ঞেস করে—আমার এ-অবস্থাটা করলো কে, এ-প্রশ্নটা তোমাদের মনে আসে নি। যদি আজিজুল মাস্টারই দায়ী হবে, তাকে এমন করে মরতে হবে কেন? চরণদাদুইবা আজিজুলকে মারতে যাবে কেন?

অত শত বুঝি না।

এত নৃশংস হত্যা কেন হল, কেমন করে হল, সে প্রমাণ আমাদের কাছে আছে।

তা কি প্রমাণ রয়েছে, এক্ষুনি আমাদের দেখাও, না-হলে চরণদাদুকে আমরা পাঁজাকোলে করে নিয়ে যাব।

ও! এই তাহলে তোমাদের শেষ কথা।

বনানী ভাবে, মানুষ আজ এতই বিভ্রান্ত যে সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে পারছে না, নিজের ভালোমন্দ ওরা পুরোপুরি ঠিকঠাক করে নিতে পারছেন না।

আর এক দল লোক সামনের দল থেকে ঝপাং করে সরে গিয়ে সামনের সারিতে এসে শ্লোগান দিতে শুরু করে—'চরণদাদু নিপাত যাক, চরণদাদু'র মুণ্ডু চাই।'

চরণদাদু নিজেকে আর সামলাতে পারছে না। প্রতিবাদ করবে এ কথার, না হেলায় উপেক্ষা করে চুপটি করে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে এ জনরোষ থেকে রক্ষা করবে নিজেকে। কিন্তু এ-পলায়ণবৃত্তি তো চরণদাদু কোন কালেই করে নি। সামনে থেকে লড়াই করাটাই তো জীবনের ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছিল। তাহলে আজ এরকম পরিণতি কেন? সমষ্টি'র ভুল চিন্তার কাছে এমন সহজ পরাজয় নিশ্চত হয়ে গেল কী করে!

কথাটা আবারও কানে বিঁধল—চরণদাদুর মুণ্ডু চাই!

চরণদাদু নিশ্চিত এদের অনেককেই ও ভালোভাবে চেনে। এরা ওর মৃত্যু কামনা করছে এ-স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না। তবে কি মুণ্ডু চাওয়ার পেছনেও ব্যক্তির সিদ্ধান্ত কোনও গুরুত্ব আরোপ করে নি!

সমষ্টি সত্য না ব্যক্তি সত্য! এ-প্রশ্ন মাঝে মাঝেই ওকে বিব্রত করে। ইট বৃষ্টি, মাটির-ঢেলার বৃষ্টি ওর উঠোনে জমা হতে থাকে। চরণদাদু ওর এই ভীত সন্ত্রস্ত মনটাকে সহ্য করতে পারে না। এটা ওর কাছে মনে হতে থাকে কাপুরুষতা, মানুষের পরাজয়। চরণদাদুর শরীরটা কাঁপছে। বনানী এসে চরণদাদু'র হাত দুটো চেপে ধরে থাকে।

সুজাতা বারান্দা ছাড়িয়ে মুখ বাড়ায়—হঠাৎই ওদের হাতে প্ল্যাকার্ড-এর ছবি দেখে চমকে ওঠে। আজিজুলের কাটা মুন্ডুর সামনে এক রাশ অন্ধকার ঘিরে ক্রমশ বাড়ছে

চরণদাদু'র মুখ। চরণদাদুকেই পরিকল্পিতভাবে এভাবে ফাঁসিয়ে দিয়েছে সুবোধ চৌধুরী এন্ড কোং।

সুজাতা কোন কথা বলে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে অবস্থার সুযোগ নিয়ে নিজেকে তৈরি করে নেয়। মনে মনে ঠিক করে নেয় এই জনরোষ থেকে ওকে বাঁচিয়ে তুলতেই হবে। ওদের জীবনের জন্য নয়, আসল কথাটা মানুষের সামনে প্রকাশ করতেই হবে, না হলে চরণদাদু'র এতদিনের প্রচেষ্টা কালিমায় ভরে গেলে পরিণতিতে সমাজেরই অমঙ্গল হবে।

চরণদাদুকে বের করে দাও। এভাবে মেয়েদের এগিয়ে দিয়ে চরণদাদু নিজের মুখ লুকোচ্ছে। ওকে বের করে দাও, ওকে চুনকালি মাখিয়েই আমরা ছেড়ে দেব।

সুজাতা বুঝতে পারে মজিদ খান-এর ষড়যন্ত্র। ওরই দেওয়া পুরস্কার-এর লোভে এমন লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি। ওরা শর্ত আরোপ করে—চরণদাদু না হয় বনানীকে নিয়ে—ওর গর্ভ বে-আইনি, একে খালাস করে ফেলতেই হবে। এ-দুটো মানুষের অস্তিত্ব ওদের ঠিকভাবে বাড়তে দিচ্ছে না: এদের দিক থেকে জনসাধারণ মুখ ঘুরিয়ে না নিলে সুবোধ চৌধুরী'র কপাল পুড়বে পৌরসভা নির্বাচনে। তাই তো ঘটনাটা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া।

মানুষরা খালের ওপারে মাঠের আনাচে কানাচে পিলপিল করে এসে জড়ো হচ্ছে, কতটা রাতারাতি টাকা ছড়ালে কালকের ঝিম মেরে থাকা অবস্থাটা এমন করে পাল্টে যায়। কি আশ্চর্য! মানুষ আজ নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রক সাজতে পারে না, এ যেন এক কলের পুতুলের মেলা, যেমন নাচাবে, তেমনি নাচবে, জেগে যাওয়া, ঘুমিয়ে থাকা যেন এলার্ম বাজিয়ে দেওয়া, অদৃশ্য ভোজবাজিতে আবার এলার্ম থামিয়ে দেওয়ার কৌশল।

মানুষগুলোর জন্য করুণা হয় সুজাতার। প্রকৃতিরও একটা নিয়ম থাকে, ঝড় ঝঞ্ঝা আসে, ডালপালাগুলো হেলেদুলে পড়ে যেতে চায় আবার যেন লড়াই করে জিতে গেলে ঠিক জায়গায় ফিরে আসে। কিন্তু, মানুষ একবার উল্টো গলিতে মাথা গলিয়ে দিলে আর সে মানুষ হয়ে সহজে ফিরতে পারে না, তার সবকিছুই যেন কিনে নেয় মোটা টাকার বিনিময়ে কিংবা বাঁচানোর মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে।

সুজাতা দেখে ঈশান কোণে মেঘ জমেছে। মেঘ কালো, জীবন কালো, রং-এ-রং-এ মিলেমিশে একাকার। ঝমঝমিয়ে বড় বড় ফোঁটা, ভিজিয়ে দেয়, শিল এসে পড়ে এলোপাথাড়ি, মানুষগুলো যেন যাদুবলে গর্তে নিজেদের মুখ গুঁজে দেয়।

আজ বরাত জোরে সকলে প্রাণ ফিরে পেলাম, একথা বলেই সুজাতা কপালে হাত রাখে। কাদের উপর আস্থা রাখবি আর বনানী—এত বড় সর্বনাশ যারা করল, তারাই বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ভয়ে মুখ লুকোচ্ছে মানুষ! চরণদাদু এবার ফোঁস করে ওঠে—এদের জিজ্ঞেস কর, এরা দেশে সুস্থ রাজনীতির কথা বলে, অধিকার নিয়ে পথেঘাটে চেঁচায়, বঞ্চিতের দলে নিজেদের দলাইমালাই করে চোখের জলে বুক ভাসায়। আবার এরাই এখন সমাজের নোংরা মানুষগুলোর হাতের পুতুল হয়ে দিব্যি নেচেকুদে

বেড়াচ্ছে, ভালোমন্দ জ্ঞান হারিয়ে, স্বার্থান্ধ লোকগুলো উপকারীর রক্ত চাইছে। মানুষগুলোকে আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। বনানী বলে—আপনারা পুরুষরা বলেন, নারী চরিত্র বেজায় জটিল, পুরুষরাই এখন কম যায় কঁাসে, শয়তানিতে ষোল আনা চোস্ত!

মদন এসে একটা খারাপ খবর দেয়—চরণদাদু, ছবিটা যেটা প্রিন্ট করতে দিয়েছিলেন, সেটা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

চরণদাদু'র মাথায় হাত—এই ছবিগুলো আর মোবাইলটা ছিল ওর কাছে, মোক্ষম অস্ত্র, তা কিনা হাফিজ হয়ে গেছে মদনের কাছ থেকে, বলে বেড়াচ্ছে স্টুডিও থেকে মিসিং।

এই মদনের নামটাই বি.পি.এল. কার্ড থেকে বাদ পড়ায় সরকারি যোজনা প্রকল্পের সমস্ত সুবিধা থেকে বাদ পড়েছিল ও। ঘর বাবদ দশ হাজার টাকা, স্যানিটারি পায়খানা চরণদাদু তদবির করাতেই অনুমোদন পেয়েছিল। আর সেই কিনা ওর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে মজিদ খানদের কাছে বিকিয়ে গেল। অথচ এমন গদগদ ভাব করে বলেছিল—'চরণদাদু', আপনার কোন চিন্তা নেই, আপনার এত বড় বিপদে আমি বেইমানি করব, আমায় দিন, আমি এমনভাবে ছবি করে এনে দেব যে কাকপক্ষিতে টের পাবে না।' চরণদাদু এমন ভাবনাকে বিশ্বাস করেছিল—চোখের জলও কথা বলার সময় গড়িয়ে পড়েছিল, চরণদাদু'র জন্য প্রাণটাও সহজে বাজি রাখতে পারে, এমন প্রতিজ্ঞাও করেছিল। চরণদাদু এখন বুঝতে পারছে গোটাটাই ছিল চতুর অভিনয়, চরণদাদু'র কাছ থেকে যা পাওয়ার ওর পাওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন অন্য শিবিরের কাছ থেকে যতটা তেল মেরে আদায় করা যায় সেই চেষ্টাতেই এত নরম-সরম ভাব। কি জানি হয়ত সুবোধ চৌধুরী এন্ড কোং-কে বলেছিল, 'হুজুর, দাদাভাইরা এমন নচ্ছার লোক আমি ইহকালে দেখিনি, ওর দফারফা করে ছাড়ব আমি, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, এরা সমাজের কলঙ্ক।' কিচ্ছু বিশ্বাস নেই, এই মানুষগুলো বাঁচার অন্য কোন মাধ্যম জানে না যে। চরণদাদুর ধারণা ছিল শিক্ষিত মানুষগুলোই বেশির ভাগই পরের মাথায় কাঠাল ভেঙে যায়, সকল গরীব মূর্খ মানুষরাই অভাবের তাড়নায় বেঁচে থাকার লড়াইটুকু করে, কৃতজ্ঞতা বোধটা যেন ওদের রক্তে মিশে আছে। তবুও এখন বিশ্বাসটুকু নষ্ট হওয়ার ভয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

চরণদাদুর তাই মোহভঙ্গ হলেও নতুন করে জীবনের সমীকরণে ফিরে যেতে পারবে না। গণপতিকে ও ফেলে এসেছে অনেক দূরে। চরণদাদু'র মূল্যায়নটা পাল্টে যেতে থাকে।

লোকগুলো দেশের মহান পতাকাকে নিরাপত্তার খাতিরে ব্যবহার করে। মন্দির মসজিদ আর শহিদ বেদীর ধারণাটা ওদের কাছে সমান তালের, কোনটা পরকালের আর কোনটা ইহকালের। সেই লোকগুলো ঝাণ্ডা তুলে, তেরঙ্গা পতাকা পতপত করে উড়িয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। বিদ্রোহে শেষ আছে, হাসি আছে, রক্তের নেশা আছে। প্রবৃত্তির এমনতর অসহনীয় বেপরোয়া ভাব এনে, চাহিদা পূরণে ব্যবহার করার কৌশলে, সাধারণের ভিড়ে থাকা মানুষগুলো যে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছে, এ-ও যেন কুশিক্ষা,

অশিক্ষা'র আড়ালে এক চোরাস্রোত-অপমানের, উল্লম্ফনের, উদ্ভট চিন্তার, নচ্ছার ব্যবহারের, নষ্ট মানুষের বিষোদ্গারের। চরণদাদু পোস্টার দেখে চমকে উঠেছে— আজিজুল হত্যার বিচার চাই-এলাকার অধিবাসী বৃন্দ। চরণদাদুর ফাঁসি চাই।.......

এরকম ঘুরে যাওয়া আবহাওয়ায় যে কোন লোকেরাই বিষম খাওয়ার অবস্থা হয়। বনানী জনে জনে প্রশ্ন করে 'এত সহজে কেমন করে মানুষ পাল্টি খায়'! সময়টা হয়ত এত সহজে ঘুরে যাওয়ারই সময়।

কেউ হেসে হেসে জবাব দেয়—কিসমতের খেল বেটি। এরকম বেরহম কাজে মদত দিলে খোদার গজব তো লাগবেই, আদমি তো কোন ছাড়, পীরবাবা গাজি হাজিদের মতও পাল্টে যাবে।

আবার কেউ কেউ বলে—এই লোকটার উচিত সাজা হয়েছে, শেষে চরণদাদু ঠিক কাজটাই করেছে।

কোনটা ঠিক কাজ বাবা?

কেন লোকটাকে কোতল করে দেওয়া।

আপনি এতটা নিশ্চিত হলেন কেমন করে?

আরে মশাই পাড়ায় পাড়ায় গোপনে ভি.ডি.ও হলে দেখানো হচ্ছে।

বলেন কী!

রামনগর সাংস্কৃতিক সংঘ থেকে নজরুল স্মৃতি পাঠাগার, সব জায়গায় ভাসছে চরণদাদুর সঙ্গে আজিজুল এর মরা শরীরের ভয়াল দৃশ্য।

সবাই এতটা নিশ্চিত হলো কী করে যে চরণদাদুই.......।

এমনও তো সম্ভব কেউ চরণদাদুকে ফাঁসিয়ে দেবে বলে এরকম বেআক্কেলে ছবি তুলেছে।

তা-তো ভুল বলেন নি।

শুধু তাই নয়, উল্টোটাও তো হতে পারে।

কিন্তু মুশকিল হলো পাবলিক খেয়ে গেছে, এখন ওগড়ানো তো সহজ কাজ নয়।

সহজ হয়ে যাবে দাদা, শুধু একটা গোপন ডকুমেন্ট যদি হাতে আসে।

শুনেছেন বোধ হয়, সুবোধ চৌধুরী সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছেন। প্রিন্ট মিডিয়া এবং টি.ভি. সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যাবেন নাকি। ওরা গোটা ঘটনাটাকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করছে।

শুনেছি মজিদ খান, সুবোধ চৌধুরীরা এই ঘটনার প্রমাণের জন্য অন্য কথাও তুলে ধরেছেন।

তুলে ধরলে তো হবে না, মহামান্য আদালতে প্রমাণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

কিন্তু জনতার আদালত যে রায় দিয়ে দিয়েছে।

ব্যাপারটা যেভাবে সবাই গিলছে, শেষে অন্য দিকে না মোড় নেয়।

বনানী ভাবতেও পারে না সুবোধ চৌধুরী এন্ড কোং-এর মানুষজন খুব সূক্ষ্মভাবে মানুষের অন্দরমহলে ঢুকে পড়ল কেমন করে! এই ঘেরাটোপ থেকে বেরোবার রাস্তা নেই যে এমন নয়। আনিন্দিতা'র ইন্টারভিউ'র রেকর্ডিং-এর ক্যাসেট। কিন্তু সে মেয়ে তো এখন দেশের বাহিরে লস্ এ্যাঞ্জেলসে! কি তার মোবাইল নং, তাও তো জানা নেই। আচ্ছা, দেখাই যাক না, পুরনো নাম্বার ডায়াল করে। লক্ষ্মীপুর থেকে লস্ এ্যাঞ্জেলস্! লক্ষ লক্ষ মাইল দূর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরটা যেন পাশের বাড়ির জানালা থেকে হাঁক মেরে মন চাইলে কথা বলা কিংবা আরও সহজ।

কী কেমন আছিস তোরা?

বড্ড বিপদ দিদি। তুই যে একবার ইন্টারভিউ করতে এসেছিলি সুবোধ চৌধুরী আর তার চেলা-চামুন্ডাদের, সে সব কথা মনে আছে!

হ্যাঁ ঐ শয়তানটা তো! তা মনে থাকবে না কেন, তাড়াতাড়ি চলে এলাম, কেইসটা গুটিয়ে নিতে পারলাম না বলে এগোই নি। তোর কেসটা আবার কি হয়েছে! সমাধান হয় নি!

তোকে আর বলা তো হয় নি, নিজেই নিজের জ্বালায় পুড়ে মরছি অন্যাকে আর বিরক্ত করতে মন চায় না, সেই বাচ্চা আমি নষ্ট করি নি।

কেন? তুই রেপড হলি যে শুয়োরগুলোর দ্বারা, তাদের পরিচয় তুই বয়ে বেড়াবি আজীবন!

হ্যাঁ বয়ে বেড়াব।

এর মানে তো বুঝলাম না।

মানে অতি সহজ। এ-যন্ত্রণার ভার ওদেরও বয়ে বেড়াতে হবে। যতদিন ঐ বাচ্চাটা ওদের চোখের সামনে ঘুরে বেড়াবে। বাচ্চাটাকে নিয়েই আমি লড়াই চালাব।

এটা চান্স ফ্যাক্টর। কিন্তু বাচ্চাটারও ক্ষতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তোর সাহস আছে মাইরি, কিন্তু বড্ড বেশি ঝুঁকি হয়ে যাবে না!

ঝুঁকি তো সবাই নেয় দিদি।

তুই দেখছি এই বয়সেই অনেক কিছু বুঝে ফেলেছিস।

ঘটনার ধাক্কা মানুষকে এক ঘূর্ণিতে বড় করে দেয়।

আচ্ছা এবার ঘটনাটা বলতো দেখি।

কী আর বলব দিদি, মানুষগুলো কেমন বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

আজিজুল স্যার মার্ডার হয়ে গেছে।

বলিস কী রে!

শুধু কি এই, সেই খুনের দোষ চাপিয়েছে চরণদাদুর গায়ে।

এলাকার লোককে ওরা ক্ষেপিয়ে তুলেছে, অথচ প্রমাণ করার মতো আমাদের হাতে কোন কাগজপত্র নেই, যা হতে পারত তুরুপের তাস, তাও হাফিজ করে দিয়েছে, এখন তুই এ-ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারবি কিনা বল। আমার বিশ্বাস তোর ইন্টারভিউটা

এখানে মোক্ষম দাওয়াই হতে পারে।

কিন্তু সে—তো......!

বনানী'র আশার আলোটা যেন দপ করে নিভে গেল। যে চরণদাদু, ওর অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল, যে নাকি এলাকার চোখের মণি ছিল, আজকে তাকেই কিনা খুনের বদনাম নিয়ে মাথা নিচু করে চলতে হচ্ছে। এই যদি বিচারের মানদণ্ড হয়, তাহলে কেউ যে আর মানুষের হয়ে কাজ করার দুঃসাহস দেখাবে না। প্রতিষ্ঠান আর ব্যক্তির এইখানেই কি তফাত !

ছাব্বিশ

কত আর চলবে ফাঁকি

মজিদ খান সকাল না হতেই হন্তদন্ত হয়ে ওর লোকজন নিয়ে রাস্তার দু'পাশে জড় হয়েছিল কোন এক চক্রান্তের গন্ধ পেয়ে। বধির মন্ডল ছিল চক্রান্তের মূল নায়ক। সেই পুলিশের সঙ্গে মাখামাখি করে এত বড় কাণ্ডটা ঘটাল। এর আগে কখনও এমন দুঃসাহস কেউ দেখায় নি। রাস্তার দু'পাশে যে দোকানঘরগুলো, সেটা যে আইনিভাবেই ছিল, লোকজনের হাতে কিছু পয়সা গুঁজে দিয়ে এই ব্যবস্থা করেছিল মজিদ খান, যাদের নাটের গুরু বিষ্ণু সামন্ত। স্টুডিও, ব্যাকারি, সেলুন, বালি সিমেন্টের কারবারের পেছনে ঝাঁপ ফেলে চলছে সাট্টা জুয়া, মেয়েছেলের ব্যবসা রমরমা, কার ঘাড়ে কটা মাথা এর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, কেউও না দেখার ভাব করে, মুখ থেকে পিক করে পানের রস ফেলে উদাসীন চোখে রাস্তা পার করে চলে যায়, কি জানি কেন বিষ্ণু সামন্তদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করতে পারে না। দলে ভারি হয়, লম্বা হাত বলে ছড়ি ঘোরায়, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, নাকি মৃত্যুভয় মানুষকে ক্রমশ পিছু হটিয়ে দেয়, আরও সুখ, আরও ভোগের বাসনা জন্ম দেয় এমন এক অনিশ্চয়তা, যা পায়ের নিচের মাটিকে কাঁপিয়ে দেয়, স্থির হয়ে বিপদকে মোকাবিলা করার সাহসটাকে জীর্ণ করে দেয়। মানুষের স্বভাবই কি এই প্রতিবাদ আর প্রতিবাদহীনতার জন্য দায়ী ! নাকি চরণদাদুরা এমনি আসে যায়। সমাজের চাবুকের ঘায়ে ক্ষত হয়ে পুঁজ গলে বের হয়। একসময় প্রাণশক্তি ধারণ করার জন্য যাবতীয় ক্ষমতা নিঃশেষ হলে নতুন উদ্যমে কেউ লাফঝাঁপ করে। এভাবেই জেতা-হারার পালা। চরণদাদু চেয়েছিল জিতে যাওয়ার পর্দাটা নিয়ন বাতির আলোয় জ্বলজ্বল করুক। মানুষের চিন্তার পারদটা তার মনকে ছুঁয়ে ফেলুক, কাজ হোক ইচ্ছাশক্তিতে ভরপুর এক প্রতিবিম্ব।

জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া মানুষগুলো'র রকম-সকমকে ওরা আকার দিয়েছিল নিজেদের স্বার্থকে পূরণ করবে বলে। বিধি বাম! দুপক্ষেরই বোতলের ভূতকে গুঁতিয়ে, আছাড় মেরে বার করার জন্য সরকারী নির্দেশনামা আসে। মানুষের এই চিন্তার বৈষম্যকে হাতিয়ার করে বধির এসে জায়গা দখল নেয়।

দু'দল মানুষের কাঁড়াকাঁড়ি, হুটোপাটিতে কংক্রিটের রাস্তা জমজমাট হয়ে ওঠে।

মানুষের চেহারাগুলো স্পষ্ট হয়। মজিদ খান-এর লোকলস্কর আগেরবারই এরকম পুলিশ হামলায় মুচলেকা দিয়েছে বিষ্ণু সামন্ত কোন হুজ্জতি করবে না, কতকটা সেই কারণেই এবারের উত্তেজনার একটু আঁচ কম।

বিষ্ণু সামন্ত ঢেঁড়া পিটিয়ে বলে দিয়েছিল এবারের ভাঙার সময় যেন কোন খিস্তি খেউর না করা হয়। এতটা নিয়ন্ত্রণ নিজস্ব এলাকায়, সেটা যেন প্রশাসনকে হার মানায়।

চরণদাদু চুপ করে থাকতে পারে না, যতই তার বিরুদ্ধে এলাকার লোককে ক্ষেপিয়ে তোলা হোক না কেন, মানুষের উপর আস্থা রেখেই তাকে পথ খুঁজে নিতে হবে। মাঝখানের আলোটা দিনের বেলায়ও সমান তালে জ্বলছে, কেউ তো একটুখানি হাত লাগাচ্ছে না, সে-ওতো চরণদাদুর হাতের ছোঁয়া ছাড়া নিভবে না।

মজিদ খান তো লম্বা-চওড়া একটা লেকচার দিয়ে ফেলল, 'লোকটাকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না, এমন করে জাল পেতে রাখে, ধরা কাউকে না কাউকে দিতেই হবে, কেউ চালাকি করেছে কি মরেছে, কিন্তু লোকটাকে জব্দ না করতে পারলে তো প্রতি পদে পদে বিপদ। বিষ্ণুদা, অবির ভাই, সুবোধবাবু'র মতো লোকে থাকতে ওই ফতুয়া-পায়জামা-কাঠের স্যান্ডেল পরা লোকটা টুসকি মেরে বেরিয়ে যাচ্ছে, এটা কিছুতেই হতে দেওয়া চলবে না, যে কোন মূল্যেই রুখতে হবে, আরে বাবা, একজন লোক সবার উপর টেক্কা মারবে তা এসময়ে আর হয় নাকি।'

আবার এসে এবার নাক গলালো—লোকটাকে আচ্ছা করে একটা লেসন দিতে হবে, তবেই হবে সবার শান্তি, বড্ড বাড় বেড়েছে। লোকাল কমিটি আছে, ক্লাব আছে, মিউনিসিপ্যালিটি আছে, উনি কোথাকার লাটের বাট এসেছেন। ব্যাটাকে এবার চরকি নাচন দেখাব, বড্ড নাম কেনার সখ হয়েছে, ভারি সমাজ-সেবক হয়েছে। এমন ফাসান ফাঁসাব না, বাঁচাধন টেরটি পাবে।

কুড়ি ফুট রাস্তার জন্য এই চরণদাদুই লড়েছিল। এখন আমাদের পৌষ মাস! সব ব্যবসা চৌপাট।

ঠিক বলেছ, ওই তো মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি চিঠি দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটিকে কপি দিয়েছে, নিজে গিয়ে দেখা করে নালিশ জানিয়েছে, তাই তো চেয়ারম্যান সাহেবের এমন তুরন্ত ভিজিট।

অ্যাকশান গরম গরম। আমরাও গরম গরম কাজ সেরে ফেলব। চরণদাদুকে বাগে পেলে ওরা চিবিয়ে খাবে, এমনই ফোঁস ফোঁস করছে।

রাস্তা চওড়া করা চরণদাদুর আসল অভীপ্সা না হলেও ঐ সময়ের সাইনবোর্ডের আড়ালে যে সব দুষ্কর্ম চলছে, সেসব তাড়াতে না পারলে, শরীর মন দুই-ই মিলে চরণদাদুর যে অস্বস্তি হচ্ছে তার কী হবে! সামাজিক মানুষ হিসেবে তার কি কোন দায় নেই!

আজিজুল-এর হত্যা রহস্যের উন্মোচন যাতে না হয়, ওরা প্রতি পদে পদে ওকে বাঁধা দিচ্ছে, এক অদৃশ্য শিকল যেন কেউ এসে ওর পায়ে পরিয়ে দিয়েছে।

সুজাতা'র নজর এড়ায় না কিছুই—তোমার শরীর এখন এতো কাঁপে কেন! কোন কষ্ট হচ্ছে?

চরণদাদু'র ধোপা নাপিত দুটোই ওরা বন্ধ করেছে, ইলেকট্রিক-এর লাইন কেটে দিয়েছে।

দিক ওরা যত খুশি দিক। তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তো তোমার পাশে রয়েছি।

কেন যে হঠাৎ চরণদাদুর মাথার চারদিকটা এমন করে ওঠে। সব ভাবনার স্তরগুলো ওলটপালট খায়, সামনে যা কিছু পায়, তা যেন আঁকড়ে ধরে কোন অবলম্বন খুঁজে চিন্তাগুলো ছড়িয়ে দিতে চায়। শরীরের কাছে এমন মন না মানা আত্মসমর্পন কেউ কি মেনে নিতে পারে!

সুজাতা এসে হাতটা চেপে ধরে বলে, তুমি যে এভাবে হাতটা বাড়িয়ে দিচ্ছ, পড়ে যাবে যে, তোমার সামনে সবই যে ফাঁকা।

কিন্তু আমার যে মনে হল লম্বা থামের মতো কিছু দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো কি যেন চড়কির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে! জানালাটা খুলে দে সুজাতা, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। সব চেনা মুখগুলো উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে কেন! আমি নিজেকে ধরে রাখতে পাচ্ছি না সুজাতা, কোথাও যেন আমি তলিয়ে যাচ্ছি। শুয়ে পড় তুমি, খাটের দু'পাশটা জোরে চেপে ধরে রাখ। না, তুই বুঝছিস না, কি যেন এসে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তুমি ভয় করো না, আমি তোমাকে জড়িয়ে লেপ-মুড়িয়ে দিচ্ছি।

সুবোধ চৌধুরী আমাকে তাড়া করছে, লাল চোখ আর ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে আমাকে গিলে খাবে।

কী বলছ তুমি?

কোথায় সুবোধ চৌধুরী!

কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছ না তুমি। ঐ তো আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমায় শাসাচ্ছে। সুজাতা চরণদাদু'র মানসিক অবস্থার পরিবর্তনে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ে। তুমি কি আমাকে একটা লোহার খাঁচা বানিয়ে দিতে পার সুজাতা, না হয় ওরা আমার গলা টিপে মেরে ফেলবে।

ঘরের গুমোট আবহাওয়াটা কেটে যেতে জানালাগুলো খুলে যায়। তাতে লাভ কিছু হয় না। গরম হাওয়াটা ধপ করে ঘরের বাতাসের সঙ্গে মিলে আরও ভারি হয়ে ওঠে। এই সময় লাইনটা কেটে না দিলে পাখাটা বনবন করে ঘুরত, সেই শব্দের ঘূর্ণনে চরণদাদুর মস্তিষ্কের অন্দরের আন্দোলনটা সমান তালে চলত, চিন্তার পারদটা হয়ত ওর সায় মিলত নিয়মের শৃঙ্খলে। সুজাতার হৃদয়ের এক কোণ থেকে প্রার্থনার শব্দ ভেসে আসে—ঈশ্বর এ-যাত্রায় ওকে বাঁচিয়ে দাও, না হলে যে সবকিছু গোলমাল হয়ে যাবে। চরণদাদু হঠাৎই চিৎকার করে—কেউ বাঁচবে না সুজাতা।

সুজাতা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, কি করে অসম্ভব সম্ভব হলো!

চরণদাদু ওর মনের কথাটা জানতে পারল অবলীলায়। তাতে কি কোন ফাঁকফোকরে শীতল বাতাস ঢুকে গিয়ে উষ্ণতাকে মিইয়ে দিয়েছে, না-কি চরণদাদুর মস্তিষ্কের উষ্ণ প্রস্রবনের মতো ফুঁড়ে বের হওয়া ভাবনাগুলো আপনাতেই শীতল হয়ে গেছে। এইরকম নানা প্রশ্ন যখন সুজাতাকে এক ঘোর অন্ধকারের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, ঘরে এসে অনিন্দিতা ঢুকল। সদ্য ফিরেছে বিদেশ থেকে।

অনিন্দিতা এসে চরণদাদু'র হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, 'খুব খুশির খবর চরণদাদু, অবশেষে আপনার বনানীকে নিয়ে চিঠিগুলো রাষ্ট্রপতি'র সচিবালয়ে গিয়ে পৌঁছেছে। সুজাতা হুমড়ি খেয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে—কী করে জানলেন?

সুজাতা'র সন্দেহ হয় খবরটা চরণদাদুকে খুশি করার জন্য মোক্ষম সময় ছুঁড়ে দেয়নি তো অনিন্দিতা। চরণদাদু'র রোগের দাওয়াই ভেবে এমন করে আশ্বাসবাণী শোনানো। সুজাতা কি জানি কেন বারবার করে খুঁটিনাটি বিষয় জানতে চেয়ে অনিন্দিতাকে বিব্রত করতে চাইল না, হোক না মিথ্যেটা যদি সত্যি, চরণদাদুর মস্তিষ্কের ঘুমিয়ে থাকা কিংবা দুর্বল স্নায়ুগুলো যদি এতে জেগে ওঠে, সফলতার আনন্দে মনটা নেচে ওঠে, আত্মবিশ্বাসটা ফিরে পায়, সুজাতা এর চেয়ে কীই-বা খুশি হবে। কতভাবেই না চরণদাদুকে ও আগলে রেখেছে, চরণদাদুর স্ত্রী মারা যাবার পর থেকেই এমন একজন পাগল মানুষকে নিয়ে কত বদনাম মাথায় নিয়ে ঘর করেছে, আটকে তো রেখেছে! অনিন্দিতার সত্যি কথাটা যদি মিথ্যে হয় তাতেই-বা দোষের কী!

চরণদাদু বালিশ আঁকড়ে পড়ে থাকা হাতটা উপরে তুলে মুঠো করে বাঁকতে বাঁকতে ডান দিকে হেলে যায়, সোজা হয়ে দাঁড়াতে অনেকটা সময় নিয়ে নেয়। এরকম আচরণ চরণদাদু প্রথমবারই করে, চোখ দুটো ছোট করে ভ্রু কুঁচকে অনিন্দিতা'র টুকরো কথা শুনে নেয়, চোখের জল গড়িয়ে পড়তে থাকে টসটস করে, কেন এ-কান্না! অনুভূতিগুলোকে লুকিয়ে রাখার যন্ত্রণা যখন হৃদয়খানা মুচড়ে দেয়, ঘৃণা বিরক্তি তো এমন করেই চোখে মুখেই একজন স্বপ্ন দেখা মানুষের মতো আছড়ে পড়ে।

অনিন্দিতা এগিয়ে যায়। এখন কেমন আছে চরণদাদু? ধীরে ধীরে মনের ভাঁজগুলো খুলতে থাকে—আরে আমি হলেম গিয়ে চরণদাদু, আমাকে এত সহজে ঘৃণা করবে ওরা!

হাসিঠাট্টা কার যেন! কথার ফুলঝুরি ছড়াতে থাকলে পৃথিবী যেন মনে হয় কত সুন্দর, এখানেই সম্মান, এখানেই অপমানে জর্জরিত হয়ে মাথা খুঁড়ে মরা। চরণদাদু'র ভাবনাগুলো ছড়াতে থাকলে আবারও জয়ের গন্ধ পায়। কিন্তু শুধু ছড়ালে কী হবে, গুটিয়ে আনতে হবে বই কি!

অনিন্দিতা চরণদাদুর কাছে স্পষ্ট করে জানতে চায় কত কথা—চরণদাদুর মুণ্ডু চাই। এই পরিবর্তনের হাওয়াটা তার মাথায় কত বেশি গিজ গিজ করে, এটাই কিন্তু লাখ টাকার প্রশ্ন।

অনিন্দিতা সুজাতা'র কাছে চরণদাদুর শীঘ্রই সেরে ওঠার শুভকামনা জানিয়ে ওদের

বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোয়। রাস্তায় জড়িয়ে থাকা ছায়াগুলো কামড়ে পড়ে থাকতে চেয়েও পারে না, সকল ধুলোবালির মায়া ছেড়ে সরতে থাকে অনিন্দিতা'র চলার পথে। এমনি করেই ছায়াগুলো সঙ্গী হওয়ার উন্মাদনা প্রকাশ করে।

সবকিছু নতুন হয়ে অনিন্দিতা'র মন জয় করতে চায় যেন। কত কিছুই না গায়ে নামাবলি জড়িয়ে থাকার মতো করে পায়ে পায়ে চলতে থাকে। কত যে প্রশ্ন ভিড় করে। কীসের এত সম্বন্ধ, অটুট হয়ে জোড়া লেগে আছে। চরণদাদু এত করে ছাড়াতে গিয়েও পারছে না, অথচ আবির, মজিদ খানরা দিব্যি তো মাথায় চড়ে নাচছে;আলগা হতে গিয়ে একটুও সময় নেয় না।

চরণদাদু এসব মানুষগুলোর বিরুদ্ধে মানুষের ভাষারই যোগান দিতে চেয়েছে বলে কি তাকে হতে হবে এত বড় সংকটের মুখোমুখি! না, এক গাছা চুলও কেউ ছুঁতে পারে নি. মানুষের ক্রোধের তিলমাত্রও এসে রাস্তার দু'পাশের বে-আইনি কাজকর্মের উপরে ঘা মারতে পারে নি;সাদা পোশাক, ঘিয়ে পোশাক, কত পোশাকের লোকজনেরই না আনা-গোনা! ওরা উল্টো মেপে চলেছে অনিন্দিতা'র প্রতি পদক্ষেপ, যদি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয়, ওরাও তো পার পাবে না।

সুবোধ, মজিদরা এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে ওরা যা কিছু ক্ষতি চরণদাদুর করতে চেয়েছিল তার চেয়ে বেশি ক্ষতিই চরণদাদু নিজে থেকেই ধারণ করে নিয়েছে। অনিন্দিতা হাসে মানুষের কথায়—ভালো মানুষের জয় হবেই হবে।

এবার তো ওর আবারও প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে—ভালো লোকটা আসলে কে? যে লোকটি সত্যি কথা বলে, যে-লোকটি নিজের জীবনটা অন্যের জন্য ত্যাগ করতেই উসখুস করে!

অনিন্দিতা জানে না, পেশাগত অভিজ্ঞতার দৌলতে ও শুধুমাত্র জেনে নিয়েছে—লড়াই করার যন্ত্রণা নিয়ে অনেক এই ভালো লোকরাই মুখ থুবড়ে পড়েছে, চরণদাদু ব্যাতিক্রম হয় নি।

চরণদাদু হাতের কাছে সাজিয়ে রাখা কাগজ কলমটা নিয়ে লিখতে বসে যায়। কত যে হাবিজাবি কথা লিখে ফেলে। অনুমান করে নিতে চায়, কত শব্দ ও এতদিন নতুনভাবে সাজিয়েছে, কত বাক্যের পরতে পরতে প্রাণ দিতে চেয়েছে।

চরণদাদু শরীরটা মনের উপর চেপে বসে, আবার কুঁকড়ে যেতে থাকে। বড় একা লাগে তখন, শরীরটাকে ছিঁড়ে ফালা ফালা করতে চায়, চেয়ার ছেড়ে উঠে সোজাসুজি দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে যায়, মাথা ঠোকে, দেয়াল ঘষে ছিঁড়ে ফেলতে চায় সবটুকু।

সুজাতা হাত দুটো ধরে টেনে বসিয়ে দিতে গেলে বলে—একটু শান্ত হও চরণদাদু, ক্ষিধে পেয়েছে!

চরণদাদু গ্লাস ঢেলে নেওয়ার ভঙ্গিতে সোঁ সোঁ করে—ও, জল চাই।

সুজাতা এক গ্লাস জল গলায় ঢেলে দিলে তৃষ্ণার্ত কাঁকের মতো টেনে নেয়।

চরণদাদু ইশারায় আবার কাগজ কলম নিতে বলে—লিখে নেয় কত কথা—চরণদাদু রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে চায়। মানুষকে নিয়ে ওর নাকি অনেক কথা কথা বলার

আছে। মূল্যায়নের নতুন ভাবনা ও জানিয়ে দিতে চায়, শুধুমাত্র মানুষের শত্রুগুলোকেই খতম করলেই.......। চরণদাদু কথা আর বেশিদূর টানতে পারে না।

সুজাতা কলমটা এগিয়ে দেয়—লেখ, আবার লেখ।

চরণদাদুর মাথায় এসে কে যেন একটা পাথর চাপা দেয়, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে, মিশে যেতে চায় মাটির সঙ্গে।

সাতাশ

নারীর রোষে অঙ্গ পোড়ে

বনানী'র প্রসব বেদনা উঠেছিল, কিন্তু কেন যে এখনও ওর সন্তানের পৃথিবীর আলো দেখার সুযোগ আসে নি, জন্মের আগেই লম্বা সময়, আরও কিছুদিন অপেক্ষায় দিন গুনবে। বনানী দাঁত মুখ খিঁচে পড়ে থাকে, সন্তানের ঠোঁটে ও চুমু খাবেই।

আত্মীয় স্বজনরা তো কত কথা বলে।

এখনও সময় আছে, বনানী, ভেবে দেখ, জন্মাবার আগেই অনাথ আশ্রমে দেওয়ার বন্দোবস্ত করি গে, কোন আজত-কুজাতের ছেলে, কোথা থেকে কি বেরোয়-সাপ না ব্যাঙ, মনস্থির করে ফেল মা।

বনানী কোন কথা বলে না, শুধু ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে যদি কারও সম্মতি সূচক 'হ্যাঁ' কথাটা কানে আসে, ওর পক্ষে রায় দেয়, যদি নাই-বা দেয়, করার কি আছে, জন্ম যে ওকে দিতেই হবে। আচ্ছা, তোমরা বল দেখি, পৃথিবীতে বহু নারীই তো আগে পিতৃ পরিচয় ছাড়াই সন্তানের জন্ম দিয়েছে।

সমাজটা যে অন্যরকম ছিল মা!

এখনও তো আর এক রকমের সমাজ। সেও তো কাগজ কলমের বাহিরে মধ্য যুগের নামান্তর!

কী বলছিস মা!

ঠিকই তো বলছি। ধর্ষণ আর বলাৎকারকে আর কিইবা বলা যায়, আমার গোপন অঙ্গে রোলার চালিয়ে দেওয়ার সমান বর্বর কাজ, করেছে এখনকার সমাজ। তবুও তো আগে সরাসরি বিচারসভায় জবাবদিহি করার সামাজিক প্রথা ছিল, এখন দেশের আইন সাক্ষী ছাড়া শয়তানদের চিহ্নিত করতে পারবে না, যতই ধর্ষিতা দাবী করুক, যতদিন না ডি.এন.এ. টেষ্টে প্রমাণিত না হয়, বহাল তবিয়তে ঘুড়ে বেড়াবেন সাহেব-বাদশারা।....

মা, কার ঔরসে এই সন্তানের জন্ম হচ্ছে আমি জানি না, তবে এইটুকু জানি, আমি এই সন্তানের মা।

এই সংসারে মায়ের পরিচয়ে এখনও বাঁচা যায় না মা, যতই আধুনিক বলে আমরা গলা ফাটাই না কেন, এখনও তো পুরুষতান্ত্রিক সমাজ।

নিয়ম তো কাউকে না কাউকে একদিন ভাঙতেই হয়। সে দিনটার জন্যই আমার বসে থাকা। আজিজুল স্যার তো সমাজের মুখ চেয়ে আইনি পথই মাড়ালেন না।

সুযোগই বা পেল কোথায়, কিছু ভেবে ওঠার আগেই যে ওরা সরিয়ে দিল। এখন যদি আমি চেঁচিয়েও বলি, কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু প্রমাণ আমাকে করতে হবেই, নিজের জন্য না হোক, আজিজুল স্যারের পরিবারের জন্য অন্তত।

ওর পেটের ভেতর বেড়ে ওঠা সন্তানটা যখড় নড়েচড়ে ওঠে, শরীর ও মনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসে, চিন্তার আকাশে লাগে নানা রং, একে সঙ্গে না নিয়ে ও এখন আর এক-পাও চলতে পারে না, কিংবা পারা উচিতও নয়, এমন কল্পনায় তৃপ্তির ঢেকুর তোলে।

আবির এসে শাসানিটা জম্পেশ করেছিল, বনানীর শক্তপোক্ত মনটা তাতে বিন্দুমাত্র দমে যায় নি—কথাগুলো কিন্তু মনে রেখো বনানী দেবী, এই সন্তান যেন কোনভাবেই পৃথিবীর মুখ দেখতে না পায়। গোঁফের দু'পাশে তা দিয়ে মুখে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে, কথায় অনেক বিশ্রী ঝাঁঝালো শব্দ ব্যবহার করে পা নাচাতে নাচাতে চোখের আড়াল হয়ে যায়। বননীর শরীরটা জ্বালা জ্বালা করে ওঠে। ইচ্ছেটা বশে রেখেছিল বটে। না হয়, মুখে থুথু দিয়ে, দু'গালে দুই চড় কষিয়ে দিয়ে এই ধরনের জন্তুকে শিক্ষা দিতে পারত। মুশকিল হ'ল এরা একা পেয়েই যা খুশি তাই বলে যায়, পাঁচজনের সামনে এসে বলার সাহস করে না, পাশে মুখোশটা খুলে যায়। খুলে গেলেও এরা কারও তোয়াক্কা করে না, সাপের স্বভাব যেমন আঘাত পেলেই ছোবল মারা, এরাও এতটাই ভয়ঙ্কর, শরীরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা গোপন চেহারাটা দেখে ও চমকে ওঠে। আতঙ্কে চুপসে যায়। বনানী স্থির রাখে নিজেকে। ডাক্তার বলেছেও এই সময় শরীরে রিপুর কোন ব্যাধি পুষে রাখলে সন্তানের দেহমনে এর প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই তো ক্রোধের আগুন ছড়ানো থেকে নিজেকে বিরত রাখে।

আখতার এসে সুবোধ-এর হাতটা চেপে ধরে—দাদা, একদম মাঠে মারা যাব, এই মেয়ে যা বাঘিনী—যে কোন সময় মাংস খুবলে নিতে পারে। তুইও পারিস বটে। তোকে গেমটা খেলতে বলেছিলাম, গোল করতে তো বলিনি। আরে শূয়োর, আমাদের মতো জনপ্রিয় নেতাদের অনেক কিছুই বাঁচিয়ে চলতে হয়; মজিদকে বলেছিলাম, আজিজুলকে বুঝিয়ে তোদের কুকর্মের দায়টা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে, তোরা তা না করে ওকে ঠেসে দিলি, এখন চরণদাদুর উপরে আজিজুল হত্যার দায় চাপাতে, আমাকে ওদের তিনজনকে আড়াল করতে হচ্ছে, বললাম মালুটা ছাড়, তাতে লটকে যাওয়ার বদলে শ্রীঘরে কদ্দিন কাটালেই চলবে। ব্যাটার সাহস, বলে কিনা, আপনার জন্য এত করলাম, শেষে আপনিই টাকা চাইছেন! আরে তুই বল আখতার সরকারি পোষা লোকগুলো, যারা টপ টপ জায়গায় বসে আছে, ওদের পকেটে পুরতে গেলে টাকা লাগে কিনা। আমি হলেম জনগণের নেতা, সারাজীবনটা ওদের জন্যই দিলুম, শাকাহারি, আমি টাকা পাব কোথায়, বাঁচার একটাই রাস্তা অবস্থার বিপাকে দলটা পাল্টে ফেলতে পারি!

আপনার আদর্শ!

রাখ তো ঐ বুলি, দিনকাল পাল্টেছে, রং পাল্টানো শিখ, ত'বে গিয়ে গায়ে আঁচটি লাগবে না।

দাদা শুনলুম, সি.বি.আই. লেগেছে?

তুইও পারিস, এমনভাবে কেসটা ঘুরিয়ে দিচ্ছি না সি.বি. আই. এর বাপ এসেও চার্জশিট দিতে পারবে না। এরা আমার কাছে শিশু।

দাদা এইজন্যই আপনি জনগণের মহান নেতা, একটু পায়ের ধুলো দিন দাদা।

যা মেলা ফ্যাসফ্যাস করিস না, ঐ অনিন্দিতা মেয়েটাই যত ঘোঁট পাকাচ্ছে। ওর স্ক্রুটা একটু টাইট দিতে না পারলে আমি শান্তিতে ঘুমোতে পারব না, বড্ড ঘোড়েল মেয়ে, বাগে আনা মুশকিল। যা বলছি, এখন তাই কর, যদি বাঁচতে চাস, টাকাটা জোগাড় করে নিয়ে আয়, না হলে চরণদাদু'র হাত থেকে রেহাই পাবি না।

দাদা, চরণদাদুকে আপনি যা ফাঁসান ফাঁসিয়েছেন না, সেই ঘুঘু মালটা আর সেই পাতা ফাঁদ ছেড়ে বেরোতে পারবে না. যা একখানা ব্রেইন মাইরি আপনার, কোথাকার মাল কোথায় সাঁটিয়ে দিয়েছেন।

এখন যা, মেলা বকিস না, খালি দেখে যা, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

ঐ তো ঐ মেয়েটা আসছে। এখন তুই কেটে পড়।

আসুন, আসুন ম্যাডাম, আপনার অপেক্ষায় বসে আছি।

তাহলে কেসটা ঘুরিয়ে দিলেন, কিন্তু এতে কি আপনি পার পেয়ে যাবেন, আপনি কেসটা যত জটিল করছেন, যত মুখ তৈরি করছেন, আপনার ফেঁসে যাওয়ার রাস্তাটাও কিন্তু তত লম্বা হচ্ছে, সে কথা খেয়াল রেখেছেন, আপনি তো মনে মনে ভাবছেন, বিষয়টা গুলিয়ে দিয়ে আপনি ঘোলা জলে মাছ ধরবেন, ব্যাপারটা কিন্তু এত সহজ হবে না, কেউ তো আর চোখে ঠুলি পরে বসে নেই। শুনুন ম্যাডাম, আপনাকে কিন্তু আমি ভদ্রভাবে কথা বলছি, আপনি কিন্তু অনেকক্ষণ তড়পে যাচ্ছেন, শুনুন, আমার আসল রূপটা তো আপনি দেখেন নি, দেখলে আপনার এত গরম দেখানো বেরিয়ে যেত।

পথে আসুন, এটাই তো আমি চেয়েছিলাম, আপনার আসল রূপটা আমাদের একটু খুলে দেখান না।

সুবোধ চৌধুরী ভাবে. মেয়েটা তো কম চালাক নয়, শেষে আমাকে ধরেই ফেলল!

হ্যাঁ বলুন সুবোধবাবু, আপনার আসল ভাবটা বলুন।

সুবোধবাবু মনে মনে ঠিক করে নেয়, ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না। উল্টো চাল চালতে আরম্ভ করেন।

শুনুন, আপনি তো জানেন চরণদাদু'র ঐ দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী হয়েছে, আপনাদের মহাপুরুষের সমাজ পাল্টানোর লড়াই কিন্তু শেষ হয়ে যাবে। জেনে রাখুন, এই সমাজে এখন কোন ব্যক্তি কোন পরিবর্তনের লড়াই লড়লে আগেই তার মাজা ভেঙে দেওয়া

হবে, সেটা কেন জানেন, এখন দলই শেষ কথা, দলের সিদ্ধান্তই শেষ কথা, ব্যক্তি বেশি বাড়লেই ডানা ছেঁটে দেওয়া হবে, যত বড় মহান হোন না তিনি।

হুঁ, তাতে হয়েছে কি, কাজটা তো থেমে থাকবে না, আপনিও জেনে রাখুন, কোন ভালো কাজই কেউ দমিয়ে রাখতে পারে না, এটাই প্রকৃতির নিয়ম, এই নিয়ম সমাজ-রাজনীতির দোহাই দিয়ে কোনদিন আটকে রাখতে পারে নি, আর পারবেও না।

শুনুন, ব্যক্তির চেতনা যতই বড় হোক, কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের চাপে সেই চিন্তা-চেতনার অবদমন ঘটতে বাধ্য, যতক্ষণ পর্যন্ত না উনি নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠছেন, আর সেই সময়টা পার হতে গিয়ে আমরা নিজেদের ঘর গুছিয়ে নেব।

তো আপনি কি ভাবছেন এই ঘর গোছানোর যুক্তি দেখিয়ে আপনি খুব সহজে পার পেয়ে যাবেন।

আপনি কিছু করতে পারবেন না।

পারব কি পারব না, সময় হলেই টের পাবেন, আপনি যাতে করে কোন ছত্রছায়ায় আশ্রয় না পান, সেই ব্যবস্থাই আমি করব।

পারবেন না, এ-আমার চ্যালেঞ্জ। যেদিন করে দেখাবেন, তার পরেই আমার আপনার দেখা হবে।

তা কেন? এর মাঝেও আরও দু'একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। আপনাকে জালে জড়াতে গেলে যত অস্ত্র দরকার, তত অস্ত্র এখনও পর্যন্ত আমার হতে এসে পৌঁছয় নি।

তাহলে চেষ্টা করে যান, এখন বিদেয় হোন, আমার আরও দু'একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আছে।

আমি জানি সেটা কিসের মিটিং।

জেলা সভাধিপতির সঙ্গে তো আজ বেলা পাঁচটা বেজে দশ মিনিট-এ মিটিং ওনার বাংলোয়।

সুবোধ চৌধুরী চমকে ওঠে। ....মেয়েটার এলেম আছে, গোপন মিটিং এর খবর কী করে ওর কাছে পৌঁছে গেল, নিশ্চয় কোন চ্যানেল এ খবর সংগ্রহ করছে। যতটা সহজে ছাড় পাবে ভেবেছিল, অতটা সহজ হয়ত হবে না।..... কী করে যে মেয়েটাকে বাগে আনা যায়!

কোন কৌশলই এখানে চলবে না।

বনানী'র এই জেদ ধরার মধ্যেই কি রহস্যের গন্ধ আছে—এমনই ভাবতে শুরু করে সুবোধ চৌধুরী...... তাহলে কি আর একটা বলি চড়াতে হবে। প্রয়োজনে সেটা করতেও পিছপা হবে না। বেছে বেছে আখুতার, আবার এমন একটা মেয়েকে টার্গেট করেছে! একটা ছাপোষা মেয়েকে টার্গেট করে যদি আজিজুলকে ফাঁসিয়ে দিত, তাহলে এতদূর হাত গন্ধ করতে হতো না। আজিজুলটা টেঁটিয়া ছিল, ভালোয় ভালোয় যদি ওর কথা শুনত তাহলে আঙুলটা বেঁকা করতে হতো না। সুবোধবাবু মাথার চুল ছিঁড়ে মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকে। দু'দুটো কেসে যে এমন করে ফেঁসে যাবে সেটা ভেবেও দেখেনি।

দুর্ভাগ্য চরণদাদু'র মতো এমন একজন চালাক চতুর লোক ওর ওয়ার্ডেই পড়ে গেল! পাশের ওয়ার্ডে তো কোন ধরনের এরকম উটকো ঝামেলাই নেয়, দিব্যি যেমন মন চায়, তেমন করে রমরমিয়ে চালাচ্ছে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় এসেছি, এখন আমাদের কথায় কাজে কাঁচি চালাতে চাইছে, এ-আবার কেমন বেয়াদপি, কিছু না কিছু পথ খুঁজে বের করতেই হবে। ওদের ঘিলু খুলে নিতে হবে। বেতাল কথা যদি বন্ধ না করা যায়, তাহলে আমাদের জায়গাটা ধরে রাখা দায় হবে।

বনানী বেশ বুঝতে পেরেছে ওর পেছনে ফেউ লেগেছে, নিজেকে লুকিয়ে রাখতে ও কতরকম যে কৌশল খোঁজে। অনিন্দিতা আগের অবস্থান থেকে সরে এসে ওকে পই পই করে বলে দিয়েছে—যে কোন মূল্যেই তোর পেটের ছানাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, কারণ এই সূত্র ধরেই ওদের জালে আটকা পড়া চরণদাদুকে খুঁজে বার করা যাবে।

বনানী'র এখন ভয় ভয় লাগে, যত দিন এগোচ্ছে, প্রথম বেদনা'র ভাবখানা এলেও সেটা আদপে ঘটে নি। প্রথমবারের বোকামি থেকেই কত না বিপত্তি। বার বার করে হাত বুলিয়ে দেখে, শরীরটা তৈরি হয়ে গিয়ে, বাচ্চাটা যে খেলাধুলা শুরু করেছে, কি জানি দেখতে কার মতো হবে! ও বার বার করে ওর ঈশ্বরকে ডাকে, বাচ্চাটা যাতে ওর মতো হয়। অনিন্দিতা বলে বেড়ায়—ও কামনা করিস না বোন, তাহলে পুরো কেইসটাই গুবলেট হয়ে যাবে, বরঞ্চ ঐ কালপিটদের চেহারা হলেই অত টেস্ট-এর হাঙ্গামায় যেতে হবে না। বনানী কিছুতেই চাইছে না, বাচ্চাটা ওই কুত্তাটার মতো দেখতে হোক। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে ও ঐ লোকগুলোর মুখগুলো ভুলতে চাইছে। ঐ একটা মাত্র ঘটনা ওর বয়সটা এক ধাক্কায় অনেকটাই যেন বাড়িয়ে দিয়েছে, কথায় কাজে ও এখন অনেক হিসেবী। বাচ্চাটাকে ওকে দরদ দিয়ে বাস্তবের মাটিতে লড়াই করে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো! কিন্তু তার আগে ঐ দুষ্ট চক্রের জাল থেকে যেনতেন প্রকারে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। আখতার-এর মতোই দেখতে ঐ অমানুষটা রাস্তার ওপারে ওৎ পেতে বসে থাকে, ওই পথ দিয়ে বনানী কবে যাবে, ওর পিস্তলের গুঁতোয় দুটো পেটই এফোঁড় ওফোঁড় হবে। বনানী উল্টোদিকে হাঁটে, আখতার কবে ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়বে, বনানী পেটটা ঢেকে ঢুকে ঘোমটা টেনে পথটা পার হয়ে যাবে পা টিপে টিপে।

আঠাশ

এসো আমরা রঙ্গ করি

অনিন্দিতা পায়ের জুতোটা আলতো করে সরিয়ে কান পাতে দেয়ালে। ঠকাস ঠকাস শব্দ হয়, তাহল কি সব ঠিক আছে। চরণদাদুর এমন অবস্থাটা খুবই স্বাভাবিক এবং নির্দিষ্ট নিয়মের বন্ধনীতেই পড়ে। সব প্রশ্নোত্তরের সঠিকই জবাব দেয়। দেয়ালের ডান দিক থেকে বাঁ দিকে আসলেই পায়রার খোপে কপোত কপোতীর মধুর মিলন ডাক, গৃহকর্তার

সুখশান্তির প্রতীক কিনা, বুঝতে হলে একটু সময় চেয়ে নিতে হবে, এই তো সবে আলোর নীল বাক্সটা রং ছড়িয়ে বিন্দু বিন্দু কালো রেখাগুলোকে সরিয়ে দিল। তাতে সবটাই স্বাভাবিকভাবে মানিয়ে নিতে কত যে দমফাটা ভাব বিনিময়ের চেষ্টা চরণদাদুর, যে কেউ এক পলক দেখলেই অনুমান করে নিতে অসুবিধা হবে না। অনিন্দিতা সব কথাই নিজের মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে একপা-দুপা করে এগোয়। চরণদাদুর তখন নিরন্তর লড়াই চলে নিজের সঙ্গে নিজের। কাকে কোন প্রশ্ন করার আগেই সাতপাঁচ ভেবে নেয়, যদি সঠিক কথাটা বলতে গিয়েই অন্য অনেক কথা একই সঙ্গে গেঁথে ফেলে।

এই যে মেয়ে তুমি বড় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ যে, তোমার সব হিসেবপত্র ঠিক আছে তো, গুছিয়ে কাজকর্ম করছ তো! জবাবটা দেবার আগেই আর একটা প্রশ্ন এনে জুড়ে দেয়, 'দিনকাল ভালো না হে, যেমন করে চড়াও হচ্ছে সময় সুযোগ মেপে, মাল মশলা সাজিয়ে গুছিয়ে, তুমি তো কোন কিছু বলার আগে দম ফেলারই সময় পাবে না। তার চেয়ে বরঞ্চ সবগুলো একই পাত্রে মিশিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে একটু দই, একটু লেবু মিশিয়ে ঝাঁকিয়ে নাও।, তারপর প্রয়োজনমত ছেঁকে তোল, দেখবে মিলবে এমন অমৃত, ভাবতে বসবে এরকমটা তুমি চেয়েছিলে কিনা। এরকম একটা প্রস্তুতি নিয়েই তো তুমি এসেছ অনিন্দিতা, ঠিক ধরেছি কিনা বল!'

একটা মানুষের কথার আদলে এত স্বল্প সময়ে এমন ধাঁচের ভাবের উদয় হয়েছে, অনিন্দিতা এখন জবাব দেবে কেমন করে, আর একটা কথা বলাই যায়। জবাব মিলতে থাকলে তবে না। বনানীকে নিয়ে গল্পটা আর একটু বাড়িয়ে বলা যেত কিন্তু চরণদাদু যে একটু একটু করে জেনে বুঝে নিতেই পছন্দ করে। মেয়েটার অটল প্রতিজ্ঞা কম করে ওর শরীরের বেড়ে ওঠা ছানাটাকে যাতে দুয়ো না দেয়, মা-এর ভূমিকাটা তো ফেলনার নয়, প্রতিশোধ স্পৃহার কথা না হয় পরেই ভাবা যাবে, ঐ পশুদের মধ্যে কোন একটির শুক্রাণু ধারণ করে বাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ওর গর্ভে, একথা ভাবলেই যেন নিজের পেটে নিজেই কিল মেরে ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে আর যে ফুলছে ক্রমশ তাকে, একসঙ্গে নিয়ে যেতে চায় আপন দেশে। কত না আশা ভরসার যোগান দেবে বলে প্রস্তুতি নিয়েছিল, কেন যে এমন করে সব ঝাঁপ বন্ধ হতে চলেছে। এমন চাল, এমন পয়সায় কেনা আর কৌশলের সঙ্গে যোঝা কম কথা নয়, যখন ওদের ঘর বাড়ি টালির চাল আর মাটির দেয়াল ভেঙেচুরে পাকা ভিটে, রং করা পাকা ইটের দেয়ালে কলামের বাড়ি উঠছে, মাথা উঁচু করে ধাপ দেখিয়ে চলে যাওয়া হচ্ছে, ইচ্ছেখানা এমন, কাছে ঘেষতে চাও ভালো, কিন্তু বেশি করে যুঝতে যেয়ো না, তাহলে আখেরে ফলাফলটা তোমার বিরুদ্ধে যাবে।

অনিন্দিতা কুরনিশ করেই চরণদাদুর কাছে মজিদ খান আর আবিরদের মুরিব্বায়ানার সবিস্তার বিবরণ দেয়, যতটা বেঁটে হাত ভেবেছিল, তা কিন্তু নয়, বরঞ্চ অনেকটাই লম্বা, একটু এদিক ওদিক হলে ঘাড় মটকে দেবে, আশঙ্কাটা যে অমূলক নয়, দু-এক ঘা মস্তানি চাবুক খেয়েই অনিন্দিতা জালে ভেড়াবার চেষ্টাতেই বুঝেছিল, ঐ দিকটা এমনই শক্তপোক্ত টান টান।

বলেছিলাম চরণদাদু, অনেকবার করে বলেছিলাম, হুঁশিয়ারি দিয়েও গলানো যায় নি। কোথাকার চেইন যে কোথায় বাধা, এক অদ্ভুত গিমিক। এও বলেছিলাম প্রয়োজনে ডি. এন. এ. টেস্ট করিয়ে ছাড়ব, পলিগ্রাফ করার কথা কানেই তুলল না, এমনভাব করল বিজ্ঞানের সব টেস্টই ওরা পাশ করে বসে আছে, এ-এক তুচ্ছ ব্যাপার, প্রয়োজনে ওরা আরও পরিমাপক যন্ত্র নিজেরাই হাজির করে প্রমাণ দেবে ওরা কতটা পবিত্র, কতটা কৌমার্য ধরে রেখেছে। যদি পরীক্ষা প্রার্থনীয় নাও হয়, প্রমাণ করতে ছাড়বে না এই বয়সে একটু আধটু ওরকম মেয়েছেলের দোষ সব ছেলেরই কম বেশি থাকে। এই নিয়ে অত ভাববার কি আছে, পেট যদি বেঁধেও যায়, দেবে আর কি খসিয়ে, আইন ফাইন ওসব দেখাতে যাওয়া কেন আবার, আইন কি বুঝবে রিপুর তাড়না! জজসাহেবকে বোঝাবে তবে না, আর মেয়েটাকে কে বোঝাবে, সে-দায় তো অন্যদেরই নিতে হবে।

ওদের এইসব কাণ্ডকারখানা ওরা আগাম ফেঁদে রেখেই ঘটায়। অনিন্দিতা এবার তুমি একটুখানি থাম, ওরা এত বড় ফাঁদ পেতেছে, আমরা কেউই বুঝতে পারলাম না; অশুভ বুদ্ধির লোকগুলো জয় নিশ্চিত জেনেও আমরা শামুকের মতো গুটিয়ে গেলাম।

চরণদাদু, যতটা জোশ নিয়ে ভাবা গেছিল, বাস্তবের ছবিটা তার উল্টো। বিচারকের কথা বলছেন, সে আর কতটা সাহায্য করবে এই ছা-পোষা মানুষগুলোকে। বিচারকের এজলাসে মামলা ওঠার আগেই ঘরে বসে লেনদেন হয়, রফাসূত্র বেরিয়ে আসে। ওরা উকিল মারফত খবর পাঠিয়েছিল, জবাবি দাওয়াই বড় কড়া করে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা যখন আটঘাট বেধে আপনাকে ফাঁসালো, আমাদের প্রতিবাদের ধারটা গেল কমে। বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে-একথাটা চরম সত্যি চরণদাদু-এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় নেই।

চরণদাদু এমন একটা বিরূপ প্রতিচ্ছবি পেয়েই ঘাবড়েই গেল। সামনে এখন দুটো অবলম্বনই আছে। বধির মন্ডলকে কাজে লাগালে আখেরে ফলটা ভালো হবে না। কারণ ফোঁস করে কখন যে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই সেজে উল্টো শিবিরে নাম লেখাবে না তারই বা কি গ্যারান্টি আছে, সেটাই তো বড় কথা। চরণদাদু এবার গোটা ব্যাপারটা নিজের মতো করে ভাবতে চেষ্টা করে। এ-জীবনে ধাক্কা তো কম সামলায় নি। পচা খাল পরিষ্কার, মেয়েদের স্কুল বাড়ি তৈরি, জলের লাইন, বিদ্যুৎসংযোগ, এরকম ভুরি ভুরি কাজ নিয়ে চরণদাদু নিজেই ঠক ঠক আওয়াজ তুলে সিঁড়ি টপকে সঠিক দরজায় কড়া নেড়েছে, সবটাই যে ষোল আনা সফল হয়েছে তা কিন্তু হয় নি, কিন্তু মাথা নত করে নিজের মূল্যবোধকে আক্রান্ত করবে এমন কখনও হতে দেয় নি।

চরণদাদু আর যেন এক পাও এগোতে পারে না। মা অনিন্দিতা, আমাকে এবার একটু নিজেকে গুছিয়ে নিতে দাও।

কি গুছাবেন চরণদাদু!

অনেককিছু।

চরণদাদু'র চোয়ালাটা পাল্টে যেতে থাকে। ঘরে গুমোট আবহাওয়াটা দোল খেয়ে

জানালার ফাঁক পেয়ে বেরোতে চায়, পারে না, চোখে মুখে কানে বিষম জ্বালা ধরিয়ে দেয়, চরণদাদু বলতে থাকে—ছেলেটার কেন যে মোবাইলটা হারিয়ে গেল! লড়াইটা এখন একটা বুদ্ধির মিশেলও বটে।

মনে পড়ে দিদির কথা, নিজেকে নিংড়ে দিয়ে মেয়েটি সংসারের জন্য উজাড় করে দিয়েছিল। কোন অবস্থাতেই নিজেকে সংসারের আর চার পাঁচজনের মতো অংকের হিসেবের সংগে জড়িয়ে ফেলে নি। এমন উদারতার মাশুল ওকে কম দিতে হয় নি। কিন্তু তাই বলে বিশেষ মর্যাদার আসন দখল করে বসেছিল কিংবা পরিবারের সদস্যরা তাঁকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেছিল এমন হয় নি কখনও, বরঞ্চ তিরস্কৃত হয়েছিল এমন ভালোমানুষির জন্য। বর জোটেনি কপালে, বিয়ে করবে কি এমন বেঢপ খ্যাংলাকাঠিকে কেই-বা সাধ করে ঘরের বউ করবে! কিন্তু একবারও ভেবে দেখেনি ওর মনের চাওয়া পাওয়ার কথা, অন্যের ঘরণী সেজে নিজের সংসারে মজে যাওয়ার চেয়ে মা-মরা সংসারটাকে আগলে রাখাটাকেই ঐ মুহূর্তে জীবনের ব্রত করেছিল, কাউকে একেবারে কোন আলাদা করে নম্বর দেওয়ার দরকার মনে করে নি। চরণদাদু এই গুণটাই ধার করে নিয়েছিল হয়ত, কোন দিকেই ভাববার অবকাশ ছিল না, মানুষকে খুঁজে খুজে মানুষকে সমাজের সূত্রের সঙ্গে গেঁথে দেওয়াই মনে করেছিল বেঁচে থাকার আসল কাজ।

দিদি বলেছিল, 'গণপতি, তোর যা মতিগতি দেখছি, নিজেকে নিয়ে মেতে থাকা তোর ধাতে সইবে না।' চরণদাদু দিদির কথার ঝাঁঝটা টের পায়, বুঝতে পারে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে ঐ কথাগুলো উচ্চারণ করেছিল। বেদবাক্য ছাড়া আর কি! চরণদাদু পথের ধুলো গায়ে মাখে আর দিদির কঠিন কোমল চেহারাটা যেন ফুল হয়ে ঝরে পড়ে।

চরণদাদু একবার সামনের দিকে ঝুঁকে গিয়ে খড়মটা হাতে নিয়ে নেয়, লাঠিটা বগলে নিয়ে খটাস খটাস আওয়াজ করে। একদল ছেলে চরণদাদু'র পিছু নেয়। ওদের কাছে এই লোকটি মোটামুটি একটা মিথ হয়ে গেছে, ওকে টেনেটুনে হাতের মুঠোয় নিয়ে নেওয়াতেই ওদের আনন্দ! অনিন্দিতা আগলে রাখে, যারা চরণদাদু'র বিরুদ্ধে কেচ্ছা ছড়াবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, ছেলেদের চিৎকার চেঁচামেচিতে ওরা পিছু হটল।

চরণদাদুর ইচ্ছেটা একবার বনানী'র গর্ভে বেড়ে ওঠা সন্তানকে আশীর্বাদ করে আসে। নবজাতকের জন্মের আনন্দে ও যেন পুরোপুরি মাতৃত্বের স্বাদ পেতে পারে।

চরণদাদু'র যাত্রাপথে কত মানুষই-না এখন মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কেউ গলা ফাটিয়ে থুথু ছুঁড়ে দেয়—ঐ দেখ মাষ্টারের খুনি যাচ্ছে, ওকে মার। নিশ্চয়ই মজিদ খান এর লোকেরা লেলিয়ে দিয়েছে। কতদিন বাদে যে চরণদাদু ঘরের বের হয়েছে অনিন্দিতা'র ভরসায়। কাঁধে হাত রেখে যেন ঢলে পড়ে যায়।

চরণদাদু নীলকণ্ঠ সাজে, গিলে নেয় সব নিন্দে তিরস্কার।

বিকেলের আলোটা একটু একটু করে কমতে শুরু করেছে। আলোছায়ার দোলায় অল্প অল্প ধুলোগুলো ওড়ে। দু'চারটা অটো ভোঁ ভোঁ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে যায়। ভ্যানরিক্সার একটা লোক মুখ বাড়িয়ে বলে—ঐ খুনিটা না! লোকটা শেষকালে এমন

অপকর্ম করল।

মানুষের কাছে ছোট হয়ে যাওয়াটা মেনে নিতে পারছে না চরণদাদু, মানুষের এ পরিবর্তনের হাওয়াটা এতকাল কেন ওর চোখে পড়ে নি। আপশোস হয়, কোথায় গেলে তবে এদের ভুল ভাঙিয়ে দেওয়া যাবে!

অনিন্দিতা চরণদাদুর মনের অবস্থাটা টের পায়। ওর ঝিমোনো দশাটা যে ভাঙা মনের সঙ্গে কত মিল!

চরণদাদু আবার ফুঁড়ে বের হতে থাকে। একবার হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে ধরে। লাঠিটা আস্তে আস্তে উপরে তুলে ধরে মানুষগুলোকে কি নতুন বার্তা দিতে চায়, ও নিজেও জানে না। এইমাত্র এক দল লোক বাস থেকে হুই হুই করে নামল। ওরা ওকে দেখেও যেন উপেক্ষা করে চলে যায়। এদের মেয়েরা এই স্কুলে পড়াশোনা করে। চরণদাদু কাকে যেন ইশারা করে ডাকতে চায়। লোকটা ভয়ে কেঁপে কেঁপে হাড্ডিসার শরীরে চরণদাদু'র কাছে আসার আগে দেখে নেয় ওকে কেউ দেখছে কিনা—এরই মেয়েকে প্রায় অপবাদ দিয়ে পাড়া ছাড়া করতে চেয়েছিল আবিরের দলবল। বিধবা মেয়ে হয়ে অন্য ছেলের সঙ্গে নাকি ঢলাঢলি করেছিল। কম বয়সে স্বামী মারা যাওয়ার বিপন্নতা ও একাকিত্ব নিয়ে ওরা ঠাট্টা মস্করা করেছিল। মেয়েটাকে শারীরিক হেনস্থা করতেও গিয়েছিল। চরণদাদু'র অকাট্য যুক্তি আর ঐ লাঠির শক্তির সামনে দাঁড়াতে পারে নি। কিন্তু, ঐ আবিরের দলের ডানা গজিয়েছে, ওরা অন্যের চিলেকোঠায় আস্তানা গেঁড়েছে। কে আর ওদের ধরে। চরণদাদুকে অপমান করার এই সুযোগ ওরা ছাড়বে কেন! ঐ মেয়ের বাবাকে বাধ্য করেছিল ওর বিরুদ্ধে বদনাম রটাতে। চরণদাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর ঐ ভাঙা চেহারায় নিজেকে সামলাতে পারে নি! কীরে চৌধুরী! কোথায় গেছিলি। আয়, আয়, কোন ভয় নেই, মরাকে এত ভয় পাস কেন? ওদের লাল চোখে কত বিষ আছে যার জ্বালায় সব লোক মারা পড়বে!

লোকটা মুহূর্তে যেন কেমন হয়ে গেল। চরণদাদু ওরা যে আমাকে যা নয়, তাই বলল, আপনার চরিত্র নিয়ে সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে বুঝিয়ে এল।

আর তোরা সব বিশ্বাস করলি!

পৃথিবীর আদি শত্রুকে চিনতে পারলি না।

কী সেই শত্রু!

ভয়!

কীসের ভয়!

মৃত্যুভয়।

আয়, আমার সঙ্গে আয়, সমান তালে পায়ে পা ফেলে চল দেখবি সব দুষ্ট গ্রহগুলো মুখ লুকোবে।

চরণদাদুর কথায় ও বিশ্বাস রাখতে পারল না। দৌড়ে পালিয়ে গেল, চোঁ চোঁ করে এমন দৌড় লাগাল যেন চরণদাদুর ছায়াও ওকে ছুঁতে না পারে।

চরণদাদু কী মনে করে হাসতে শুরু করে হো হো করে। দেখলি মানুষগুলোর কম্ম, ভাবখানা এমন আমার নিঃশ্বাসেও বিষ।

চরণদাদুর রোমকূপগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। সাদা চামড়া লাল হয়, চশমাটা খুলে পড়ে যেতে চাইলে জাপটে ধরে। এমন একটা করুণ দিন যে আসবে কোনদিন ভাবে নি চরণদাদু, তবে সেই দিনটা এসেছে। দিনের ঘ্রাণ, টান, শক্তি সব নিঃশেষে চুরি করে এমন ঢঙে সেজেছে আর কিছু বল'র থাকে না অনিন্দিতা'র।

অনিন্দিতা ভাবে পৃথিবীর রংটা এত কালো, এতটা কণ্টকময় কেন! কে কাকে দেবে অভয়। কার ঘ্রাণে হবে কে পুষ্ট, এমন পুতিগন্ধে শরীর মোড়াবে কেমন করে। অনিন্দিতা চলার পথটাকে হিসেবের জোড়াতালি দিয়ে দেখে।

চরণদাদু'র এই বন্দী জীবনের সুযোগে মানুষ যে নিজেকে এমন করে পাল্টে নেবে, এটা তো এমন না হলে টের পেত না।

বুঝলে অনিন্দিতা, একটু পা চালিয়ে চল, মসজিদ-এর চুড়োটা আড়াল হয়ে যাচ্ছে, সামনের ঘরগুলো রাক্ষুসি'র মতো হাঁ করে চেয়ে আছে, একটু হলেও আক্রমণ শানাবে, এ-আমার দৃঢ় বিশ্বাস। একটু দাঁড়াও, আমার শরীরের ডান দিকটাকে সোজা করে দিই, একটু পরেই কী যেন ভূতের মতো আমাকে মন্ত্রবলে ভেতর থেকে টেনে ছিঁড়ে নেবে, তখন তুমি আমাকে আগলে রাখতে পারবে না।

একটা বাস হর্ন মেরে বাঁ দিক ঘেষে বেরিয়ে গেল। হুড়মুড় করে একটু আগেই আটপৌরে শাড়ি পরা বোরখায় ঢাকা মোসলমানের বউঝিরা ছেলেকোলে বাঁ হাতে মেয়েকে মুঠো করে ধরে ডান হাতে পুটলি নিয়ে বাসের সিট দখল করে ছিল, ওরা চকমীর যাবে। একতলা বাড়িটা দোতলা হওয়ার সময় কার্নিশটা আরও ঝুলে গেছে, একটু হলেই বাসটাকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল আর কি! একদল লোক লম্বা টুল নিয়ে ড্রেনের উপরেই বসে দিব্যি মশার কামড় খেয়ে খোশ গল্পে মেতেছে।

সাঙ্ঘাতিক এ পৃথিবী! অথচ এই ক'মাস আগেই কেন যেন চরণদাদুকে দেখলেই নমস্কার, সেলাম ঠুকত। প্রয়োজন মিটে গেলে মানুষ কেমন করে আড়ালে চলে যায়, এই অভিজ্ঞতা চরণদাদুকে মোটেই বিব্রত করল না। বারবার করে মনে আসে একই জিজ্ঞাসা।

তবুও মানুষ এগিয়ে যাবে চরণদাদু। এইভাবেই মানুষ এগোবে; কারও কোন কথা তাকে আর এখন ছুঁয়ে যাবে না, সেই না ছোঁয়াটা কতটা সাঙ্ঘাতিক সেই কথা কেইবা বলবে!

ঐ যে দু'চারটে গরু দেখেছ, খড়ের কলের কাছে কেমন অসহায় মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের মুখে টোপা পরিয়ে দিয়েছে, খড়গুলো যেমন খুশি টেনে না খেতে পারে, মানুষগুলো এখন তাই, তুমি কি নিজেকে একটু অন্যরকম ভাব অনিন্দিতা।

ভাবলেই বা, ফলটা পাকছে তো না, বরঞ্চ পচেই যাচ্ছে।

চরণদাদু'র চুলগুলো মুখের উপর এসে যায়, দু'হাত আটকা থাকায় সরাতে পারে না। অনিন্দিতাই চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে চোখটাকে খোলা রাখে।

আর কতদূর, অনিন্দিতা?

আরও অনেকটা যে।

আমার শরীর যে কাঁপছে, আমার স্নায়ুগুলো অগোছালো কথা বলছে, নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছি।

আর কিছুক্ষণ নিজেকে ঠিক রাখুন, চরণদাদু।

ধীরে ধীরে নেমে আসা অন্ধকারটা আরো কালো হয়ে আসলে দু'একটা বাতি জ্বলে, আলোর রেখা ছিটকে এসে মুখের উপর পড়ে, আবার অন্ধকার হয়ে যায়। সামনে আড়াআড়ি হয়ে কি পড়ে আছে, কি জানি! বড়ই ঝাপসা, ফ্যাকাসে মনে হতে থাকে। বনানীর চোখ দুটো চরণদাদুর মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্র থেকে ফট করে সরে চলে যায়।

উনত্রিশ

আলোর রেখা গুমড়ে মরে

বনানী চরণদাদুর আশায় আশায় ঘরের চৌকাঠে পা ছড়িয়ে বসে থাকে। বছর দশেক বয়স ছিল, লাল নীল সব আঁকিবুকি. স্বপ্নের আনাগোনা। ফেরার কোন উপায় ছিল না, কত চিন্তার ভিড়ে এ-স্বপ্নগুলো গুটিয়ে যায়। তবু মাকে নানা জিজ্ঞাসায় বিরক্ত করা— চরণদাদু কোথায় থাকে মা!

তাতে তোমার কি দরকার!

ভালো লাগে তাই।

শুনতে পাও না কেমন ঠকঠক আওয়াজ করতে করতে চলে।

ও বাড়ি, সে-বাড়ি, চলার ছোঁয়া লাগে।

লোকটা কেমন অদ্ভুত, না।

গুরুজনকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে শেখো।

কেন, কি খারাপ কথা বললাম!

ঐ যে বললে লোকটা।

সরি মা, এমনটি আর বলব না, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে, আমি সেভাবে কিছু মিন করিনি। কত সময় আমাদের কত স্বাদের লজেন্স দেয়।

আজকালকার ছেলেমেয়েদের আমি বুঝতে পারি না, এই ভালো তো এই মন্দ, এই সম্মান তো এই অসম্মান, তুমিও লজেন্স নাও নাকি! বনানী আমতা আমতা করে।

লজেন্স দেওয়া নেওয়ার মধ্যে অপরাধ কোথায়, বনানী বুঝতে পারে না আজও। তবে সেই অল্প পরিচিত গল্পের ছলে কথা বলা মানুষটির প্রতি কেন যে এত আকর্ষণ, এটা এই বয়সে এসেও সবটা বোঝা যায় না। আজকের চরণদাদু'র কাছে যে বিরাট প্রত্যাশা, বিশ্বাস—সব অদ্ভুত ক্ষমতায় সমাধান করে দেবে!

বনানী'র চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে গেছে, নিউমোনিয়া, রক্তশূন্যতায় এরকমটা হয়। অনিন্দিতাকে দিয়ে একসময় বলে পাঠিয়েছিল চরণদাদু 'এ লড়াইয়ে জিততে হবে'। সেই থেকে তো পেটের ছানাটিকে পালনের মমতা শুরু। রোজ বারান্দায় আসে, মুঠো মুঠো আলো নিয়ে মাখিয়ে দেয় গর্ভকুসুমে নড়াচড়া করা ছানাটিকে।

ডাক্তার বলে দিয়েছে—বাচ্চা আপনার সম্পূর্ণ, প্রায় এবার অপেক্ষা শুধু মায়ের গর্ভ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা, পৃথিবীর আলো দেখা।

বনানী বুঝে ফেলেছে, জন্মকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করাই সৃষ্টিকর্তার এক খেলা খেলা মনোভাব, বনানীর মনে হয় ও ঐ অদৃশ্য শক্তির চেয়েও অনেক বড়, সে এখন হবু জননী।

সুবোধ চৌধুরীর লোকেরা দিনে রাতে শাঁসায়. অসীম বিশ্বাসে সে দিন গোনে, চুপটি করে কুমারী মা খেলে চলে। চরণদাদু পরাজয় মেনে নেবে না, বনানী যেন বুঝেই ফেলছে কিন্তু অনিবার্য মিথ্যার কাছেও নতজানু হতে কেউ বাধ্য করে যদি তাকে কি বলা যায়—বাস্তুঘুঘু! দুর্বৃত্ত! তবে আর কি!

ওরা দরজায় এসে ধাক্কা মারে। ও চেলাকাঠ নিয়ে তেড়ে যায়।

দিন চলে যায়, আলো এসে ঢলে পড়ে, ওকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে, ও বুঝতে পারে, প্রকৃতিও ওকে ছেড়ে কথা বলছে না।

মা এসে ডাক দিয়ে যায়, 'শুতে যা বনানী', যা দিচ্ছিস যাকে তার কথা একটু ভাব।

বনানী শুধু কি ভাবছে, ভয়ে কাঁপছে, ওদের শাঁসালো বার্তা মুহূর্মুহু ওর কাছে এসে পৌঁছে যাচ্ছে, কান্নার কথা, মৃত্যুর কথা, যন্ত্রণার কথা, আলোর কথা, অন্ধকারের কথা, সবকিছু যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। বনানী'র ডাক শুনে এ-অসময়ে কেই-বা আসবে, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, অপবাদের চাদর চাপিয়ে দিয়ে দিব্যি হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে।

বনানী ভাবে, কারা ঠিক, কেন ঠিক!

এই সময়ই নিজের মতো করেই আজিজুল মাস্টারকে একবার শেষ দেখা দেখবে ভেবেছিল। বনানী জানে ওর স্বীকারোক্তি আজিজুলের পরিবারকে এ-বদনাম থেকে রেহাই দিতে পারে। কারণ গোটা ঘটনাটাই ধোঁয়াসা থাকায় বনানী পরিচালনা করতে চেয়েছিল বলেই ঐ মেয়ে দুটো বাবাকে মর্যাদার আসন থেকে নামিয়ে এনেছিল। আজিজুল-এর জন্য বনানী'র এ স্বেচ্ছায় মাথায় পেতে নেওয়া বদনাম দৃশ্যও ভাববার মতো।

কেমন লাগছে!

বনানী লাজুক স্বরে জবাব দেয়, ঈশ্বরের বাগান থেকে ফুল চুরি করেছি যে, ছিনিয়ে নেওয়ার আনন্দ বোঝেন, তাই বলে আমি ছিঁচকে চোর নই, আসলি চোর, জানি শাস্তি হবেই, তবুও সাজ সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়া।

আরে তোমরা কিছু বোঝ না—চরণদাদু ঠিক আসবে, আমাকে কত বার বলেছে, বেসামাল লোকদের সামাল দেওয়ার লোক সময় হলে চুপটি করে বসে থাকে!

দু'জন আত্মীয়া ওর গায়ের গয়না ধার করতে এসেছিল। এই বনানীর অদ্ভুত এক সখ—ঝিনুকের তৈরি গয়না দিয়ে নিজেকে সাজিয়ে রাখবে।

মেয়ের আশাকে ফোঁটা ফোঁটা সমর্থন জানিয়ে পরিণতি'র দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে মা।

মনটা এখন প্রায়ই ভালো থাকতে চায় না, বড় মাঠটার বুকে ফর্ম হারানো খেলোয়াড়ের কদর কম হবে না, সেইজন্য জনা পঞ্চাশেক লোক হাজির হয়ে মজা লোটে।

মাঠের এক কোণে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখলে থুথু ছিটাতে ইচ্ছে করে, কেমন বেহায়ার মতো চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে পড়ে।

লোকটার কি জানি কোন কাজ নেই, দিনরাত একই জায়গায় এভাবে, ভুল দেখছে না তো! কুৎসিত দৃষ্টিতে গভীরতার রকমফের কেবল ওই জানে। ভেতরটা গোলাতে থাকে। চোখ দুটো কচলাতে কচলাতে ঘরে ঢুকে যায়, ভাবতে ইচ্ছে করে ও ছাড়া অন্য কেউ ঐ অসভ্য, বদমাশ লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে না তো!

না-রে বাবা না, ওখানে কেউ নেই, তোর মনের ভুল।

তবে কি কোনায় বৃত্তাকারে জড়ানো তারের ভেতরে চারাগাছটার ছায়াটা উল্টেপাল্টে গিয়ে এমন করছে। চোখটা আবারও কচলে নেয়, ছায়াটা এক থেকে জোড়া হতে শুরু করে। সেইখানেই যত ভয়। ঐ জোড়া ফলার বদ আক্রমণ সইতে পারলে হয়। মনের ভেতর তার আর একটা ভাব খেলা করে। ওদের অঙ্গভঙ্গির মধ্যে নানা যৌন আবেদন ছিল, না-হলে শরীরটা এরকম কেঁপে উঠবে কেন!

দিন যায়, রাত যায়, ওই ছায়া দুটো যেন চোখের সামনে ভাসতে থাকে। এই সময় চরণদাদুই মাথায় হাত রেখে বলত 'মা, তুই ঘরে যা, দেখছি, আমি কি করতে পারি।' হলেও নাকি কোন চমৎকার হতে পারত, এমনই ভাব চরণদাদুর হাঁটাচলায়।

বনানী সেদিন সকালে উঠেই পেটের নিচে হাত দিয়ে টের পায় ছানাটা যেন নড়েও না, চড়েও না, ঘাবড়ে যেতে থাকে।

বৃষ্টিটা ঠিক সময়ই এসেছিল, ঠান্ডা পেয়ে জুবুথুবু হয়ে বসে আছে হয়তবা, যাক ঘুমোক সে, আর জাগাবে না। বৃষ্টি থামল। ঠাণ্ডার শিরশিরানিও কমে গেল, সে কিন্তু এখনও নড়ে চড়ে না, বড্ড দুষ্টু হয়ে গেছে। এখনই এই, মায়ের পেট ফুঁড়ে বের হলে কি হবে কি জানি! হবে না! কার রক্ত! বদরক্ত! ছিঃ ছিঃ ও কি যা-তা ভাবছে। নিজেকে সামলে নেয়....... না, সবটাই ওর রক্তেই তৈরি।

আর কথাটা ফেলতে পারে না। ওকে বার বার করে নানা কথা মনে করিয়ে দেয়, সে কি কখনও হয় মা!

চরণদাদু যে বলেছিল, এমনটা হলেও হতে পারে, হলেই-বা ক্ষতি কোথায়!

মা, এদিকে একবার এসো তো! কান পেতে একবার শোন তো, কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছ! বনানী'র মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়, কোন কথা সরে না।

মা, তুমি কথা বলছ না কেন?

কোন কথা বলা যায় না, তাই তো থেমে থাকি।

চরণদাদুর আসার অপেক্ষায় বসে থাকে, যদি কিছু সুলুক সন্ধান দেয়।

মাঠের কোনায় লোকদুটো হোঃ হোঃ করে হাসতে থাকে।

কেমন জব্দ করলাম, আমাদের সঙ্গে লড়ার মজাখানা টের পেলি, নষ্ট মেয়েছেলের আবার মা হওয়ার সখ!

বনানী'র চোখের সামনে সব আলোগুলো জলে ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে বেরিয়ে যায়। অন্ধকার আকাশটা ফিরে ফিরে চলে আসে।

কীরে মা, এত সকাল সকাল ছাদে বসে কী করছিস!

বনানী'র শরীরে তখন এক গাছাও সুতো নেই, লোক দুটো ঘরের পাইপ বেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে, সে শুধু ঘুরে বেড়াতেই থাকে ডান বাঁ, বাঁ, ডান, ভোঁ ভোঁ করে ঘুরতেই থাকে।

মা অনেক চেষ্টা করেও বনানীকে বাগে আনতে পারে না।

ত্রিশ

বলার কথা অনেক ছিল

চরণদাদু'র চিন্তার রেখাগুলো আরও দ্রুত চলাফেরা করে। মাথায় কোথাও যেন বিপ্ বিপ্ শব্দ হয়, চরণদাদু তখন বালিশটা জাপটে ধরে মাথাটা এপাশ ওপাশ ঝাপটায়। কেন এমন হচ্ছে, কোন এক অজানা আতঙ্ক থেকে এ-রোগের উৎপত্তি! চরণদাদু নিজেও কি জানে! টের পাচ্ছিল না এমন নয়। এত সমস্যাকীর্ণ জীবনকে নিয়ে ওর তাড়না কম ছিল না। কোথা থেকে শুরু কোথায় গিয়ে পৌছবে, যদি পৌছেও যায়, তাহলেও বাঁচার স্বার্থকতা খুঁজে পাবে মানুষ! বস্তুর ঘেরাটোপে আটকে যাওয়া জীবনটার চেহারাটিই-বা কি হবে, চরণদাদু সেই অর্থ যেমন করে বোঝে, সেটা আদপেও কি সত্য না কি আরও কোন বৃহৎ প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে মানুষের সুখ আর মানুষের যন্ত্রণা আটকা পড়ে যাচ্ছে! হায় রে অর্থ, সারাদিন শুধু এ-অর্থ নিয়ে বিড়বিড় করা, এর তীব্র আকাঙ্খাই যেন তেন প্রকারেণ এপাশ ওপাশ করে। মানুষকে কোন মোড়কে মোড়ালেই ও আহরণ করে নেবে সর্বাপেক্ষা সুখ, চরণদাদু এসব চিন্তাকে হয়ত সাময়িক দূরেই সরিয়ে রেখে যদি সমস্যার উৎসমুখে দৃষ্টি ঘোরাতে চেয়েছিল। তাইতে কি এত বিপত্তি, সমস্যা লেজ ধরে টান না মেরে, সমস্যার স্তূপেই সমস্যার শবের সমাধি রচনা করেছে।

সুবোধ চৌধুরীরা এখানেই মারাত্মক ভাবে জিতে গেছে, শুধুই চোখ ধাঁধানো, লোক দেখানো সমস্যার উপর রং চড়িয়ে যায়। সেই রং-এর ঝাঁঝে চোখ দিয়ে জল গড়ালে লোকজন বলে বেড়াবে—সাধু সাধু, সুবোধ চৌধুরী, জিন্দাবাদ, চরণদাদু মুর্দাবাদ। উল্টোপাল্টা বকে লোকটা, একটা আস্ত গদর্ভ, এতকাল ঐ লোকটাকে মদত দিয়ে কি

ভুলই না করেছিলাম। ভাইসকল, তোমারেদ চৈতন্য হোক, মজিদ খান এ-সত্যই প্রচার করেছিল আমজনতার ঘরে ঘরে। বধির মন্ডল শুধুই ফোঁস করে উঠেছিল—তোমরা লোকের চোখে ধুলো দিচ্ছ, এ শর্মা এ-মোহ ভুলছে না। আমি তোমাদের চালাকি ধরে ফেলেছি। আমাকে পুরো শেয়ার না দাও, আধাআধি ভাগ তো দিতেই হবে, না হয় আমিও কাল থেকে লোক ক্ষেপানোর কর্তাগিরি শুরু করলাম, এই জেনে রাখো। চরণদাদু জানে এরা কেউই ঠিক কথা বলছে না। রাস্তাটা বড়ই নোংরা, প্রতি পদে পদে কাঁটা, এ-উপড়াতেই হবে। কিন্তু.........।

চরণদাদু ফতুয়াটা টান মেরে ছিঁড়েই ফেলে, উদোম গায়ে বুকের লোম ছিঁড়ে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়। কে যেন বলে ওঠে গণপতি ছিলে তো ভালোই, কেন জীবনটাকে এমন করে পাল্টাতে গেলে! ছা-পোষা জীবনের মজাই আলাদা, নো টেনশান, নো প্রমোশান।

চরণদাদু চেষ্টা করে দেখে ও গণপতি'র মতো ভাবতে পারে কি না, না সে ভাবনা তার আর আসে না, মন্দ-ভালো বোঝার উপায়ই-বা কি! চরণদাদু আবার কি নিজেকে পাল্টানোর খেলা খেলতে চাইছে। না এবারের খেলাটা বোধ হয় আর নিজের বশে নেই, আপনা আপনিই কেমন একটা রূপ নিয়ে চলেছে, তা ও নিজেও জানে না। তবুও সময়ের একটা রূপ ওর বুকে এসে খেলা করে, সে রূপ আদিমও নয়, আধুনিকও নয়, সব কিছু মিলে মিশে একাকার ছুয়ে যাওয়া এক অসামান্য রূপ, যা এসে অনন্ত সময়কে মিলিয়ে দিতে চায়। মানুষ এসে সেখানে মানুষকে নিয়ে খেলা করে, মানুষের গায়ের গন্ধে মাথার স্নায়ুরেখা আন্দোলিত হয়, কে কাকে জড়িয়ে ধরে শোনাবে সে সংবাদ, সবাই যে সবাইতে হবে বিলীন।

চরণদাদুর এমন কল্পনাও স্থায়ী হয় না বেশিক্ষণ, আবার পাল্টে পাল্টে অন্য সীমানায় হাঁটতে শুরু করে।

ঠিক এই সময়ই সোঁ সোঁ করে, চিৎকার করে ওঠে, সুজাতাকে ডাকে। কেমন কেমন লাগে বুঝি। ভালো লাগছে না তোর।

চরণদাদু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে, সে চাহনিতে কত যে বোঝাপড়া। সুজাতা বুঝেও না বোঝার ভান করে।

তুমি একটু স্থির হয়ে ঘুমোও, আমি তোমার ঔষধপত্রগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে নিই।

সুজাতা আমি আর ঔষধ খাব না, এসব খেয়ে আর কি হবে!

চরণদাদু শুনতে পায় মেয়েটা বুক চাপড়ে কাঁদছে। এতগুলো লোক মিলে ওর শরীর খাবলালো, বীজ ফেলে দিল জঠরে, ওদের কত বড় আস্ফালন, মেয়েটির দুঃসাহসকে বাহবা দিয়ে চরণদাদু ঘট ঘট শব্দ করে ঘরময় পায়চারি করে। চরণদাদু এখন এমনই এক ঘেরাটোপে বন্দী না তারা নিজেরাই বন্দী হয়ে চরণদাদুকে মুক্ত করে দিয়েছে এ হিসেব করবে কে।

মেয়েটির দেখা তো মেলে না, চরণদাদু উদ্‌গ্রীব হয়ে ছুটে যেতে চায়।

কে এলি, সুজাতা?

পুলিশ।

পুলিশ কেন? অনিন্দিতা'র সকল চেষ্টা বিফলে গেল!

অনিন্দিতা'র কাছে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের অভাবে অনেক চেষ্টার পরেও কোর্টে ওদের অভিযোগের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সম্ভব হয় নি। চরণদাদুকে এবার সত্যি সত্যি কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে! যতক্ষণ উচ্চ আদালতে ফের প্রমাণ না করা যাচ্ছে সবটাই ওদের কারসাজি, এ-এক সামাজিক চক্রান্ত, হাসপাতালে কড়াশাসনে রক্তচক্ষুর আড়ালে নড়েচড়েই থাকতে হবে, এই হ'ল ফরমান। সুজাতার চোখের চাহনি টপকে জল এসে যায়।

চরণদাদুকে সুজাতা জড়িয়ে নেয়। পুলিশ হতচকিত হয়ে যায়।

চরণদাদু'র স্ত্রী তো বেঁচে নেই! সন্দেহের তালিকা দীর্ঘতর হতেই ঘোমটা মাথায় বেরিয়ে আসে সুজাতা। তারপরই ঘোমটাটা সরিয়ে চোখে চোখ রেখে ওদের সন্দেহের জবাব দিয়ে দেয়।

চরণদাদুর জীবনের আঁতিপাতি এ মেয়েটি ছাড়া কেই বা জানে!

চরণদাদুর মস্তিষ্কে সেই যন্ত্রণাটা চড়া মাত্রায় এসে ধরা দেয়।

পুলিশের লোক যাচাই করতে চায় চরণদাদুর স্মৃতি মুহূর্তে কতটা তলানিতে ঠেকে।

আপনি জানেন কেন আপনাকে শমন ধরানো হয়েছে?

কেমন করে জানব, বিচারক-এর ভালমন্দ বিচার কজনের ক্ষেত্রেই বা মিলে যায়।

আপনার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

কী রকম!

সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে জড়িয়ে আপনি কুৎসা রটিয়েছেন, ধর্ষনের অভিযোগ এনেছেন এলাকার এক সম্মানীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যিনি মানহানির মামলা করেছেন, কারণ এখনও কোন উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ দিতে পারেন নি। আজিজুল খুনের অভিযোগ নিয়েও মামলা করা হয়েছে এতো আপনি জানেন।

আরও লম্বা করে দিন না অভিযোগের লিষ্টটা, সুজাতা তীর্যক সুরে জবাব দেয়।

সাংবাদিকরা খবরের গন্ধ পেয়ে চরণদাদুকে ঘিরে ফেলে।

আপনার এই অভিযোগগুলোর বিরুদ্ধে কিছু বলার আছে?

চরণদাদু মাথা নাড়ে।

আপনার অপরাধ কী আপনি স্বীকার করেন?

আমার কাছে 'আমি' কথাটার মানে একটু অন্যরকম, আমাকে দোষী ভাবা মানেই আপনারা অনেকের ঘাড়েই দোষ চাপাচ্ছেন।

এ-মুহূর্তে আপনার কি ভাবতে ভালো লাগছে?

বনানীর সন্তানের ওঁয়া ওঁয়া শব্দ শোনার অপেক্ষা আমার ভাবনাকে উসকে দিচ্ছে।

কিন্তু সে-তো.......।

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার নতুন কোন প্রতিফলন?

ভবিষ্যৎ ভাগ্য বলার আমি কোন হরিদাস পাল! তাছাড়া 'ভবিষ্যৎ' শব্দটা এত সহজ

কথা নয়, যে কোন মুহূর্তে শেষ হয়ে যেতে পারে অনেক কিছু। এই শেষ হওয়া তো ঘটনা কিংবা মুহূর্তের উপর নির্ভর করে না, অনেক না বলা কথা, অনেক না ঘটা ঘটনার যোগফল।

....

যা করবেন, তাড়াতাড়ি করুন, এক্ষুনি এক ঝটকা এসে সব ওলটপালট করে দিতে পারে।

জীবনের এতগুলো মুহূর্ত এ-ভাবে জয় করা, এ-পরিণতির জন্য কোন অনুশোচনা? না, যখন যা ভালো জেনেছি, বুঝেছি, করেছি। কোন কাজের জন্য কাউকে কোন কৈফিয়ৎ দিই নি আর মিথ্যা ফানুসের উপর দাঁড়িয়ে কোন কাজ করি নি, হোক না তার শত শত মুখ।

বিশ্বাস করা মহাপাপ, না পূণ্য?

পাপ পুণ্য বুঝি না, বিশ্বাস করেই যে কাজ করে যেতে হয়।

দেশের এই অনিয়মে, মানুষের ভালো থাকা কতটা সম্ভব?

দয়া করে, আপনারা নিজেদের একবার জিজ্ঞেস করুন না।

বুদ্ধিদীপ্ত ভারতবর্ষ, না আবেগময় ভারতবর্ষ, আপনি কীভাবে এ-দেশকে দেখতে চাইবেন?

প্রশ্নটাই গোলমেলে, আবেগই তো বুদ্ধি কে নিয়ন্ত্রণ করে। আবেগই মানুষের জীবনের মূল স্তম্ভ, সম্পর্কের সূত্রধর।

কে বা কারা, আমাদের সঠিক পথ দেখাবে বলে বিশ্বাস?

প্রথমত, দেশের মানুষ, দ্বিতীয়ত দেশের মানুষ, তৃতীয়ত দেশের মানুষ।

সুজাতা এদের এরকম দুঃখের সময় কথা আদায়ের প্রক্রিয়াকে ধীক্কার দেয়—এবার আমি আপনাদের একটা প্রশ্ন করি?

এসব প্রশ্নোত্তর-এর আদৌ কোন মূল্য আছে, না নিছকই জনগণের খাবার আর আপনাদের কাঁচামাল! লোকটা একটু বাদেই আস্তে আস্তে যন্ত্রণার জগতে চলে যাবে। সেই যন্ত্রণা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনারা দেখতে পছন্দ করবেন, না ওকে প্রশ্নজালে জড়িয়ে কাঁচামাল বের করে নেবেন, সেটা আপনারাই ঠিক করুন।

আচ্ছা, এ আমাদের শেষ প্রশ্ন।

আপনার জীবনের এই 'শুরু থেকে শেষ' এমন কোন অনুভূতির কথা যদি বলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার মুহূর্তে চরণদাদু'র মাথার স্নায়ুগুলো গোলমাল শুরু করে, দলাই মালাই হয়, বিদ্যুতের শক খাওয়ার মতো চিন্তাগুলো পরস্পর ঝগড়াঝাঁটিতে মাতে, এ-এক অদ্ভুত ঘরোয়া কোন্দল। মাথাটা ঝুঁকতে থাকে, একবার ডান দিকে চিন্তার প্রবাহটা ঘুরে গেলে ডান দিকের দেয়ালে ধাক্কা খায়। চরণদাদু মাথাটা নাড়াতে দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা হজম করার পদ্ধতিটা খুঁজতে থাকে।

সাংবাদিকরা এ অবস্থার দৃশ্যত হতভম্ভ হয়ে যায়। নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করে থেমে যায়।

এবার সত্যিই শেষ প্রশ্ন।

সুজাতা চুলের খোঁপাটা বেঁধে নিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে চরণদাদুকে আড়াল করে।

এতক্ষণ তাহলে আপনারা অসত্য বলেছেন। এতটা অমানুষিক আচরণ আপনারা করতে পারেন না। মানুষটা ভেঙ্চুরে শেষ হয়ে যাচ্ছে, আপনারা কিনা......।

ম্যাডাম, প্লিজ একটুখানি, আর একটু অ্যালাউ করুন, তাহলে আমাদের কাজটা আমরা গুটিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

শুনুন, তাহলে আপনাদের এই আচরণের সঙ্গে সাধারণ, অশিক্ষিত, মূর্খ মানুষ, য'রা পূর্বাপর না ভেবে কাজকর্ম করে, তাদের তফাৎ কোথায়! আপনারা তো আরও বিপদ্দজনক। মানুষের যন্ত্রণাকে তুলে ধরার জন্য যে পদ্ধতি আপনারা ব্যবহার করছেন, সেটাকে জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য আর একটা মাধ্যম বের করা উচিত।

ম্যাডাম. রাগ করবেন না, একটু প্লিজ।

এটাই আপনাদের ট্রেনিং বুঝি। তাহলে আমি আপনাদের প্রশ্ন করছি। কবে আপনারা ঐ ট্রেনিং স্কুল গুলো বন্ধ করার জন্য সরকারের কাছে দরবার করবেন? সেটা জানার জন্য আমিই কাল থেকে সাংবাদিকতা শুরু করব।

ম্যাডাম, বুঝতে পারছি আপনাদের অসুবিধাটা। কিন্তু জনগণের সামনে তুলে না ধরতে পারলে আমাদের চ্যানেলগুলো মার খাবে, তার খেসারত দেবে কে!

আপনাদের যেমন আপনাদের চ্যানেল আর জনগণের প্রতি দায়িত্ব আছে আমারও আমার প্রিয় মানুষটির প্রতি দায়িত্ব আছে।

ম্যাডাম, ব্যক্তির চেয়েও সমষ্টির গুরুত্বই সমাজে বেশি।

তাই আপনারা এই ব্যক্তিকেই নিয়েই কাটাছেঁড়া করছেন।

ম্যাডাম, এটা আমাদের কাজ, এটা না হলে আমাদের সব কাজ থেমে যাবে।

আপনারা কি মনে করেন; চরণদাদুরা আপনাদের চ্যানেলগুলোর জন্য বার বার করে জন্মাবে খবর হবে বলে।

এসব মানুষরা খবর হতে চেয়ে, অর্থাৎ আপনার ভাষায় আমাদের প্রোডাক্ট হতে চেয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে চলে দিনরাত।

কিন্তু অনেক মানুষই এখনও ডায়াল ঘোরায় না, আপনারা এখন আসুন।

ম্যাডাম, আমাদের কাজ শেষ হলেই আমরা চলে যাব, আমাদের এভাবে তাড়িয়ে দেওয়ার আপনার কোন রাইট নেই। তাহলে ওনার হয়ে আপনিই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিন।

বলুন।

রাষ্ট্রপতির জন্য আপনাদের কোন আবেদন?

শব্দটা যেন সুজাতার ঠোঁটের কাছ থেকে লুফে নিয়ে চরণদাদু খেলাতে আরম্ভ করে।

মাননীয় রাষ্ট্রপতি........ আপনার একটু যদি সময় হয়, আমার এতকালের আবেদন নিবেদনের........ রাষ্ট্রপতি.......... রাষ্ট্রপতি.......... রাষ্ট্রপতি......... ঐ শিশুটির আত্মহত্যা, ...মেয়েটির গণধর্ষণ এর কথা.............. দেশের আরও যুবকের আত্মহত্যা আর মেয়েদের গণধর্ষণ নিয়ে আমার বক্তব্য আপনি একটু সময়............

চরণদাদু উদাস চাহনি'র অন্দরে না-বলা কথাগুলো অস্পষ্ট হয়ে যায়, শরীরটা বেঁকেচুরে যেতে চাইলেও সামনের শূন্য বাতাসে অবলম্বন খুঁজতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। কঁকিয়ে ওঠে। চরণদাদুর যন্ত্রণাটা উপস্থিত দর্শকদের ছুঁয়ে যেতে থাকে। সোজা হয়ে দাঁড়াবার বৃথা চেষ্টা করে। এই সময় মালগাড়ির ঝিকুর ঝিকুর শব্দ আরও বেশি করে সামনের গাছপালা, বাজারের দোকানপাঠ, খাল-বিলের জলে একটু একটু তরঙ্গ তুলে, বসতবাড়ির ভিত কাঁপিয়ে চরণদাদুর মস্তিষ্কে এসে ধাক্কা মারে। ওর শরীরে চাবুক পেটা করতে থাকে কে যেন!

চরণদাদু বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে গোঙাতে থাকে, মুখটা এনে দেয়ালে, লোকগুলো টেনেটুনে কোথায় যেন নিয়ে যেতে চায়। চরণদাদু গোঁ গোঁ করে দাঁত দুটো বের করে জিব উল্টিয়ে বলার চেষ্টা করতে থাকে—ও....... রা........ আ........ মা........ কে....... বা........ ড়........ তে....... দি........ ল........ না........ রা........ ষ্ট্র........ প........ তি....... ই........ ই........ ই........ ই........ ই........ ই........ ই........ ।
